সামাজিক সচলতায় অন্ত্যজরা : শুচি-অশুচির বর্তমান রূপ

নিবেদনে : ইকরাম নেওয়াজ ফরাজী
পিএইচ.ডি. গবেষক
নিবন্ধন নং : ১৯
সেশন : ২০১৪-১৫
নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

(এ গবেষণাকর্মটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর শর্তপূরণের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে)

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়নে : _____

অধ্যাপক শাহীন আহমেদ
নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

‘সামাজিক সচলতায় অন্ত্যজরা : শুচি-অশুচির বর্তমান রূপ’ শিরোনামের পিএইচ.ডি. গবেষণা আমার জীবনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ গবেষণা সম্পাদনে আমি প্রথমেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শাহীন আহমেদের প্রতি যিনি আমার পিএইচ.ডি. গবেষণার তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা না পেলে এ গবেষণা আমার পক্ষে করা কখনোই সম্ভব হত না।

আমি আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি নৃবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভাগীয় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি যারা আমাকে বিভিন্ন সময়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইন্সটিটিউটের প্রাক্তন পরিচালক অধ্যাপক ড. খুরশীদ জাহানের প্রতি যার শুভকামনা, স্নেহ ও মমতা সবসময়ই আমার সঙ্গে রয়েছে।

আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার গবেষিত এলাকার সুবল চন্দ্র দাস ও রাজিব রবিদাস এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি যারা আমাকে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন। পরিশেষে আমি আমার গবেষিত এলাকার সব মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যাদের সহযোগিতার কারণে আমি বলতে পারি, অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের শঙ্খনীল কারাগার দেখে এসেছি।

তারিখ : ৩০/১১/২০১৭ ইং

কৃতজ্ঞতায়,

ইকরাম নেওয়াজ ফরাজী
পিএইচ.ডি. গবেষক
নিবন্ধন নং : ১৯
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫
নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সারসংক্ষেপ

সামাজিক অসমতা সর্বত্রই বিদ্যমান। ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক গতিধারায় উদ্বৃত্ত উৎপাদন এবং তৎসংশ্লিষ্ট শ্রম বিভাজন উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ অনুযায়ী কেবলমাত্র চতুবর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ বিভাজন জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। সর্বাপেক্ষা নিচুস্তরের কাজ বা শাসক শ্রেণীর দৃষ্টিতে হেয়তম কাজ যাদের উপর ন্যস্ত করা হলো তৎকালীন (বৈদিকোত্তর যুগ) সামাজিক আইন প্রণেতারা তাদের অন্ত্যজ বা অস্পৃশ্য বলে আখ্যা দিলেন। হিন্দু বর্ণবিভাগ যেহেতু বংশগত তাই অন্ত্যজরাও হলেন বংশগত।

বংশ পরম্পরায় পেশাজীবী অন্ত্যজরা সময়ের ধারাবাহিকতায় ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে স্থানান্তরিত হন। কিছু অংশকে নিয়ে আসা হয় পূর্ববাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশে)। বলা বাহুল্য এদেশেও তারা অধিকার বঞ্চিত, অবহেলিত এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষ। 'সামাজিক সচলতায় অন্ত্যজরা : শুচি-অশুচির বর্তমান রূপ' শিরোনামের এ গবেষণা মূলত প্রান্তিক এ জনগোষ্ঠীর উপরই করা হয়েছে। আমার গবেষণায় সামাজিক সচলতা প্রত্যয়টি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্ত্যজদের সামাজিক বিচ্ছিন্নতা থেকে সরে এসে বর্তমান প্রেক্ষাপটে তারা কতটুকু সচল তা দেখার তাগিদ অনুভব করেছি। এ তাগিদ থেকেই এ গবেষণা করার প্রয়াস নিয়েছি।

আমার গবেষণাপত্রে উঠে এসেছে মূলত গবেষণার বিষয় নির্বাচনের যৌক্তিকতা, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষিত এলাকা, মাঠকর্মের অভিজ্ঞতা, গবেষণার সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি বিষয়। পরে তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট এবং সাহিত্য পর্যালোচনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমার গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণের মূল ভিত্তি তৈরিতে সহায়ক হয়েছেন কার্ল মার্ক্স, এমিল ডুর্খেইম ও ম্যাক্স ওয়েবার। তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই ষাট-সত্তর দশকের ধারাগুলো তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণে ব্যবহার করেছি। এ ধারায় আন্তোনিও গ্রামসি, বারনার্ড কোহন, লুই দুমোঁ, মিশেল ফুকো, মেরী ডগলাস, ভিক্টর টার্নার প্রমুখের তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট আলোচনার পরে গবেষণার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। সাহিত্য পর্যালোচনায় অর্ন্তভুক্ত বইগুলো কিভাবে গবেষণার সঙ্গে সংযুক্ত তাও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তারপর গবেষণার পদ্ধতিসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণায় কিছু মিশ্র গবেষণা পদ্ধতি উঠে এসেছে। এখানে যেমন অনানুষ্ঠানিক কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে তেমনি ভাবে ধ্রুপদি অংশগ্রহণমূলক গবেষণা পদ্ধতির ধারা থেকে সরে এসে ক্রিয়াবাদ এবং তার

পরবর্তী ধারাবাহিকতায় সমালোচনামূলক বিতর্কটি মাথায় রেখে বর্তমান নৃবৈজ্ঞানিক ধারাগুলো আমার সুবিধা অনুযায়ী ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণাপত্রে সামাজিক সচলতায় অন্ত্যজ শ্রেণী এবং শুচি-অশুচির বর্তমান রূপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরে অন্ত্যজদের মধ্যে নারী ও পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার রূপ, সম্পর্ক, লিঙ্গ, বৈষম্য, Rites of Passage বা অবস্থান্তরের আচার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়গুলোতে প্রয়োজন অনুযায়ী কেসস্টাডি যুক্ত করা হয়েছে। গবেষণাপত্রের শেষে প্রশ্নমালা, সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি, গবেষিত এলাকার বিভিন্ন ছবি সংযুক্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এ প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিয়ে গবেষণা হয়েছে খুব সীমিত। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থাকলেও তাদের কাজের প্রকৃত মূল্যায়ন কোনদিন হয়নি। কোন সরকারই তাদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেননি। স্বাধীনতার ৪৭ বছর পরও তারা আগের তুলনায় অনেক বেশি অধিকার বঞ্চিত। গবেষণার মাধ্যমে যদি তাদের জীবনের প্রকৃত চিত্র ফুটে ওঠে তাহলে আমার গবেষণা সার্থক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

Dhaka University Institutional Repository

mwPcÎ

c_g Aa¨vq : fwgKv cô bs : 1-12

১.১ ভূমিকা

১.২ গবেষণার বিষয় নির্বাচনের যৌক্তিকতা

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

১.৪ গবেষিত এলাকা

১.৫ মাঠকর্মের অভিজ্ঞতা

১.৬ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

wØZxq Aa¨vq : ZwËK †c ÿ vcU Ges mwnZ¨ chv‡ j vPbv cô bs : 13-50

২.১ তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

২.২ সাহিত্য পর্যালোচনা

ZZxq Aa¨vq : M‡elYv c×wZ cô bs : 51-64

৩.১ গণকটুলীকে গবেষণাক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেয়ার কারণ

৩.২ গবেষণাক্ষেত্রে প্রবেশ এবং বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন

৩.৩ তথ্য সংগ্রহের উপকরণ

৩.৪ প্রত্যয়সমূহের বিশ্লেষণ

৩.৫ গবেষণার নৈতিকতা

PZ_ Aa¨vq : mvgwRK mPj Zvq AšÍ¨R †kYx cô bs : 65-82

৪.১ অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর দক্ষিণ এশীয় প্রেক্ষাপট

৪.২ পুরোহিত সম্প্রদায় সৃষ্ট পুরাণে বর্ণিত কাহিনী এবং মনুর বিধান

৪.৩ শ্রমণ সংস্কৃতি এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি

৪.৪ অন্ত্যজদের পেশার ইতিহাস

৪.৫ সামাজিক সচলতায় অন্ত্যজরা

cÂg Aa¨vq : ïwP-AïwPi eZgvb i|c côv bs : 83-111

৫.১ ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় শুচি-অশুচির গভীরতা

৫.২ সমাজে অস্পৃশ্য অন্ত্যজরা

৫.৩ ঘিঞ্জি পরিবেশে মানবেতর জীবন-যাপন

৫.৪ মাদক ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ছেন অন্ত্যজরা

৫.৫ Rites of Passage ev অবস্থান্তরের আচার এবং অন্ত্যজ সমাজ

৫.৬ কেসস্টাডি : ভাগ্যলক্ষী রাণী

lô Aa¨vq : wj½ ˆelg¨ I AšÍ¨R bvix côv bs : 112-129

৬.১ নারীদের মজুরিগত বৈষম্য

৬.২ অবহেলিত প্রজননস্বাস্থ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ মাতৃত্ব

৬.৩ মাতৃত্বকালীন ছুটির অস্বীকৃতি

৬.৪ অন্ত্যজ নারীর নিরাপত্তাহীনতা

৬.৫ কেস স্টাডি : রত্না রাণী

৬.৬ কেস স্টাডি : শাহজাদী

mßg Aa¨vq : AšÍ¨R‡'i Rxeb I RxweKv côv bs : 130-140

৭.১ পৈত্রিক পেশায় অনিশ্চয়তা

৭.২ অন্ত্যজদের বিকল্প পেশার সন্ধান

৭.৩ অন্ত্যজদের আয় রোজগার ও ব্যয়

৭.৪ কেসস্টাডি : বরুণ দাস

Dhaka University Institutional Repository

Aóg Aa¨vq : AšÍ¨R‡‘i †ÿ‡Î †gŠwjK gvbewaKv‡ii cKwZ cô v bs : 141-150

৮.১ অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার মানুষদের শিক্ষাহীনতা

৮.২ অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার মানুষদের চিকিৎসা সমস্যা

৮.৩ অন্ত্যজদের ভাষার অবলুপ্তি

৮.৪ কলোনিতে মহাজনদের দৌরাত্ম

৮.৫ কেস স্টাডি : সুবল চন্দ্র দাস

beg Aa¨vq : evsjv‡‘k nwiRb HK¨ cwil‘ MVb cô v bs : 151-155

৯.১ বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ গঠনের ইতিহাস

৯.২ বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের গঠনতন্ত্র

৯.৩ বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের দাবীনামা

‘kg Aa¨vq : Dcmsnvi I mvigg cô v bs : 156-181

সংযোজনী – ১ প্রশ্নমালা

সংযোজনী – ২ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

সংযোজনী – ৩ প্রাপ্ত ছবি

Dhaka University Institutional Repository

c_g Aa¨vq

fwgKv

1.1 fwgKv : সামাজিক অসমতা সর্বত্রই বিদ্যমান। ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক গতিধারায় উদ্বৃত্ত উৎপাদন এবং তৎসংশ্লিষ্ট শ্রম বিভাজন উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ অনুযায়ী কেবলমাত্র চতুবর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ বিভাজন জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। সর্বাপেক্ষা নিচুস্তরের কাজ বা শাসক শ্রেণীর দৃষ্টিতে হেয়তম কাজ যাদের উপর ন্যস্ত করা হলো তৎকালীন (বৈদিকোত্তর যুগ) সামাজিক আইন প্রণেতারা তাদের অন্ত্যজ বা অস্পৃশ্য বলে আখ্যা দিলেন। হিন্দু বর্ণবিভাগ যেহেতু বংশগত তাই অন্ত্যজরাও হলেন বংশগত।

বংশ পরম্পরায় পেশাজীবী অন্ত্যজরা সময়ের ধারাবাহিকতায় ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে স্থানান্তরিত হন। কিছু অংশকে নিয়ে আসা হয় পূর্ববাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশে)। বলা বাহুল্য এদেশেও তারা অধিকার বঞ্চিত, অবহেলিত এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষ। 'সামাজিক সচলতায় অন্ত্যজরা : শুচি-অশুচির বর্তমান রূপ' শিরোনামের এ গবেষণা মূলত প্রান্তিক এ জনগোষ্ঠীর উপরই করা হয়েছে। আমার গবেষণায় সামাজিক সচলতা প্রত্যয়টি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্ত্যজদের সামাজিক বিচ্ছিন্নতা থেকে সরে এসে বর্তমান প্রেক্ষাপটে তারা কতটুকু সচল তা দেখার তাগিদ অনুভব করেছি। এ তাগিদ থেকেই গবেষণা করার প্রয়াস নিয়েছি।

অন্ত্যজদের নিয়ে গবেষণায় এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট গুরুত্বপূর্ণ। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবে আখ্যায়িত অন্ত্যজদের দলিত বা হরিজন নামেও ডাকা হয়। বর্তমানে দলিত ও হরিজন শব্দ দুটোর ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে। বর্ণগতভাবে দলিতরাই হরিজন। তবে দলিত শব্দের সমার্থ হরিজন নয়। ১৯৩৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী হরিজন নামের একটি পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে তাদের প্রকৃত পরিচয়কে আড়াল করার চেষ্টা করেন। হরিজন শব্দের অর্থ ঈশ্বরের সন্তান। এখন প্রশ্ন হলো, অন্যরা তা হলে কী? ধর্মীয় দৃষ্টিতে ঈশ্বরের কোনো সন্তান নেই। খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের কথা যদি বলা হয় তবে, তারা ঈশ্বরের পুত্র বলেন কুমারী মাতা মেরীর গর্ভে জন্ম নেয়া যীশুকে।

পতিতালয়ে জন্ম নেয়া পিতৃপরিচয়হীন শিশুসন্তানকে বলা হয় ঈশ্বরের পুত্র বা চিলড্রেন অব হেভেন। বাস্তব কথা হল, গান্ধী দেখলেন যে ভারতে বিরাট জনসংখ্য হলো দলিত। ড. ভিমরাও আম্মেদকার দলিতদের সংগঠিত করার চেষ্টা করছিলেন। যদিও তিনি দলিতদের নিয়ে আলাদা কোনো রাজনৈতিক দল দাঁড় করাতে পারেননি। কিন্তু তিনি দলিতদের নিয়ে সামাজিক সংগঠন দাঁড় করান এবং ভারতীয় সংবিধান সভায় দলিতদের কতগুলো দাবি আদায় করতে সমর্থ হন। তাঁর এ ধারাবাহিক লড়াইয়ের ফলে ওই দশকেই সরকার দলিতদের জন্য আলাদা নির্বাচনী ব্যবস্থা চালু করতে যাচ্ছিল। ঠিক তখনই গান্ধী কিছুসংখ্যক সংস্কারমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে দলিতদের হরিজন আখ্যায়িত করে আমরণ অনশন শুরু করেন। এটা ছিল গান্ধীর চাতুর্যপূর্ণ কাজ। বর্তমানে ভারতে কোনো দলিত তাদের হরিজন পরিচয়টি তেমন ব্যবহার করেন না, কিন্তু বাংলাদেশে দলিতদের একটা অংশ হরিজন নাম ব্যবহার করে চলেছেন। এর মূল কারণ বর্ণগত দ্বন্দ্ব এবং এ দ্বন্দ্বের কারণ হলো গান্ধী ও আম্মেদকার সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা। তাছাড়া যারা হরিজন নাম পরিচয় ব্যবহার করেন, তারা কোনো না কোনোভাবে এনজিওগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত (তথ্যসূত্র-মেথর! কেমন আছেন তারা?-আবদুস সাত্তার; সাম্প্রতিক দেশকাল; ১২ অক্টোবর, ২০১৭)।

উল্লেখ্য, অন্ত্যজদের মধ্যে রয়েছে বিচিত্র গোত্রের জনগোষ্ঠী। যেমন : বাঁশফোড়, হাঁড়ি, হেলা, বাল্মীকি, ডোম ইত্যাদি। বাংলাদেশে প্রায় ৭০ লাখেরও বেশি অন্ত্যজ বসবাস করেন (তথ্যসূত্র-ঈশ্বরের সন্তানেরা অধিকার বঞ্চিত; বিডি মর্নিং; ১২ জানুয়ারি, ২০১৬) যারা বংশ পরম্পরায় মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন।

বিচ্ছিন্ন এ জনগোষ্ঠীর উপর গবেষণা করতে গিয়ে সামাজিক সচলতার ক্রম ধারাবাহিকতায় তাদের যে বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হলো শুচি-অশুচি। এক্ষেত্রে লুই দুমোঁর Homohierarchicus (1970) গ্রন্থের কথা উল্লেখযোগ্য যেখানে তিনি বলেন, শুচি-অশুচির ধর্মীয় চেতনাই ভারতীয় সমাজের গঠনকে নির্ধারণ করে। ...শুচি-অশুচির মানদন্ডে প্রতিটি জাতির পদমর্যাদা নির্দিষ্ট হয়। এক সর্বজনীন ধর্মের শক্তি জাতিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে সমগ্র সমাজটিকে একত্রে ধরে রাখে (বন্দোপাধ্যায়, দাশগুপ্ত; ১৯৯৮)।

যেমন : আমার গবেষণার প্রেক্ষাপটে দেখেছি, অন্ত্যজদের একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বা সীমানার মধ্যে কলোনি করে বসবাস করতে হচ্ছে। নামে কলোনি হলেও আশেপাশের বাসিন্দারা বলেন মেথরপট্টি। মেথর একটি ফার্সি শব্দ। শব্দটি আরোপিত। সম্মানসূচক শব্দটি বলা হয়। এর অর্থ সর্দার। যদিও শব্দটি নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সামাজিক সচলতার ক্রম ধারাবাহিকতায় অনেক পরিবর্তন আসলেও অস্পৃশ্য/অশুচি শব্দগুলো অন্ত্যজদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়।

দুঁমো আরও বলেন, জাতিভেদ প্রথাকে কেন্দ্র করে যে মূল্যবোধ ভারতীয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা এমনই এক আদর্শ প্রচার করতে সক্ষম হয়েছিল যে, সেখানে উচ্চ-নীচের বৈষম্য ক্ষমতার বৈষম্য নয়। সামগ্রিক সমাজের প্রয়োজনেই উচ্চনীচের প্রভেদটা জরুরি, কারণ নিম্নজাতি যেমন উচ্চের সাহায্য ছাড়া বাচঁতে পারবে না, উচ্চও তেমনি নীচ জাতির সাহায্য ছাড়া বাঁচতে পারে না। পৃথক পৃথক জনগোষ্ঠীর মধ্যে উচ্চনীচের সম্পর্ক নির্দিষ্ট করেই ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথা সবাইকে এক করেছে। প্রত্যেকেরই এখানে নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। কাউকে বাদ দিয়ে অন্যেরা চলতে পারেন না। মূলত দুঁমোর এ বক্তব্য অন্ত্যজ সমাজ গবেষণায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমি অন্যান্য অধ্যায়গুলোতে করেছি।

দুমোঁ দাবি করেন, জাতি ব্যবস্থার সার বস্তু হল ক্রমোচ্চতা। দুমোঁ যার মধ্যে আপেক্ষিক শুচিতার ভিত্তিতে সমস্ত জাতিগুলোকে শ্রেণীবদ্ধ করেন। এ বক্তব্য বিশেষ ভাবে সমালোচনা করেন দীপঙ্কর গুপ্ত (১৯৯১)। তাঁর যুক্তি হল, পৃথক ও বিযুক্ত সমকূলে বিবাহ করা জাতিগুলোর মধ্যে বিভাজনেই আছে জাতিব্যবস্থার সারবস্তু। ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিন্যাস জাতিব্যবস্থার ভিত্তি নয়, এমনকি যেখানে এ বিন্যাস দেখতে পাওয়া যায় সেখানেও শুচি/অশুচির মানদন্ডে তা নির্ধারিত হয় না।

যদিও দুমোঁর বক্তব্য সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। সাম্প্রতিককালে দুমোঁর কাজের তীব্র সমালোচনা করেন দীপঙ্কর গুপ্ত, নিকোলাস ডার্কস্, রনাল্ডইন্ডেন ও অর্জুন আপ্পাদুরাই।

ডার্কস (১৯৮৭) সম্প্রতি দেখিয়েছেন যে প্রাক ঔপনিবেশিক দক্ষিণ ভারতে জাতিগুলোর পদমর্যাদা শুচি/অশুচির ধর্মীয় মানদন্ডে নির্ধারিত হত না-এ মর্যাদা নির্ভর করত রাজপদ থেকে তাদের দূরত্বের

উপর। ডার্কস ঔপনিবেশিকবাদ, ইতিহাস, রাজনীতি ইত্যাদির উপর জোর দিয়েছেন যা দুমোঁ হতে ভিন্ন।

ইন্ডেন ও আপ্পাদুরাইয়ের (২০১৩) বক্তব্য হচ্ছে, দুমোঁর বক্তব্য সমাজবৈজ্ঞানিক কিংবা নৃবৈজ্ঞানিক হওয়ার চাইতে অনেক বেশি ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সের ঐতিহ্যের ফলশ্রুতি।

দুমোঁর কাজের সমালোচনাগুলো আমার গবেষণায় কাজে লেগেছে। আমি দেখেছি অন্ত্যজদের মধ্যে বর্তমানে শুচি-অশুচির ধরণ যেমন কিছুটা ভিন্ন তেমনি যাদের সঙ্গে অন্ত্যজরা কাজ করছেন তাদের মনের মধ্যেও অন্ত্যজদের সম্পর্কে শুচি-অশুচির ধারণার রূপটার পরিবর্তন এসেছে। অনেক অন্ত্যজ ঝাড়ুদারি পেশার সঙ্গেই জড়িত না। তারা সমাজে বিভিন্ন পেশা অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করছে। তাদের সম্পর্কে আমাদের মনে তেমন অশুচিবোধ কাজ করে না। অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিই ভোটের আশায় অন্ত্যজদের কলোনিতে যাচ্ছেন, তাদের কাছে টানছেন। অন্ত্যজদের অনেকেই রাজপদের সঙ্গে একটা যোগাযোগ রক্ষা করতে পারছেন। আমি দেখেছি তখন শুচি-অশুচির ধারণাটা অনেকটা পাল্টে যায়।

1.2 M‡elYvi welq wbevP‡bi th©w³KZv : ভারতীয় উপমহাদেশে তথা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অন্ত্যজরা একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষ। গবেষণার বিষয় হিসেবে অন্ত্যজদের বেছে নেয়ার অন্যতম কারণ এটি। মূলত তাদের না বলা কথা নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজের কাছে তুলে ধরা এবং ব্যাখ্যা করাই আমার গবেষণার মূল বিষয়। বংশ পরম্পরায় পেশাজীবী অন্ত্যজরা কিভাবে এ পেশায় টিকে রয়েছেন, কিভাবে পেশা হারাচ্ছেন, পেশা পরিবর্তনের সুযোগ কতটা পাচ্ছেন, তাদের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, জীবনযাত্রা, বঞ্চণা ইত্যাদি বিষয়গুলো আমার কাছে অত্যন্ত সময়পোযোগী ও যুক্তিপূর্ণ মনে হয়েছে যা নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক যুক্তিযুক্ত। তার সঙ্গে আরও যুক্ত হয়েছে সামাজিক সচলতায় শুচি-অশুচির বর্তমান প্রেক্ষাপট। যেহেতু নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা একটি গভীর পর্যবেক্ষণের বিষয় তাই এ বিষয়গুলো অন্ত্যজদের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরতে ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি। সমাজের নীতি-নির্ধারকরা আমার গবেষণার মাধ্যমে অন্ত্যজ সমাজের উন্নয়নে আরও ভূমিকা রাখতে

পারবেন বলেও আমি মনে করি। সুবিধাবঞ্চিত অন্ত্যজদের জীবনযাত্রা তুলে ধরতে আমার গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তালাল আসাদ (১৯৭৩) ও এডওয়ার্ড সাঈদ (১৯৭৮) পড়ে আমার মনে হয়েছে পশ্চিমা সমাজ যেমন অপশ্চিমা সমাজকে 'অন্য' হিসেবে বিবেচনা করে বন্য, বর্বর, অসভ্য ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করেছে ঠিক তেমনি সমাজ ও সমাজের কঠোর বিধি বিধানগুলো অন্ত্যজদের মানুষ নয়, মেথর হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

1.3 M‡elYvi D‡Ïk¨ : অন্ত্যজরা সমাজের সেবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। তাদের জীবনের এক পাশে যেমন রয়েছে বেদনা ও বঞ্চনার ইতিহাস তেমনি অন্যপাশে রয়েছে আধুনিক জীবনের হাতছানি। প্রান্তিক এ জনগোষ্ঠীর ওপর কাজ করতে গিয়ে আমার কয়েকটি উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন :

ক. অন্ত্যজরা কিভাবে দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে তা দেখা।
খ. বলা হয়ে থাকে অন্ত্যজরা অস্পৃশ্য। এটা একটা মিথ কিনা অন্ত্যজদের সাংস্কৃতিক অনুধাবনে তা দেখার চেষ্টা করা।
গ. অন্ত্যজদের নিজেদের জীবনে শুচি-অশুচির ধারণা কিভাবে কাজ করছে তা দেখা।
ঘ. যাদের সঙ্গে অন্ত্যজরা মিশছেন তাদের মধ্যে শুচি-অশুচির ধারণা কিভাবে কাজ করছে তা দেখার চেষ্টা করা।
ঙ. শুচি-অশুচির বিষয়টি কিভাবে তাদের জীবনকে প্রভাবিত করছে বা সামাজিক সচলতায় কি ভূমিকা রাখছে তা দেখা।
চ. অন্ত্যজদের মধ্যে লিঙ্গীয় সম্পর্কের ধরণটি কেমন তা দেখা।
ছ. দলিত শ্রেণী হিসেবে অন্ত্যজরা কিভাবে মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত কিংবা আদৌ বঞ্চিত কিনা তা দেখার চেষ্টা করা।
জ. আদি হরিজন এবং মুসলমান পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের মধ্যে ক্ষমতায়নের দ্বন্দ্ব এবং একই ঘেরাটোপে তাদের যৌথ বসবাসের বিষয়টি নৃবৈজ্ঞনিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করা।

ঝ. বর্তমান প্রেক্ষাপটে অন্ত্যজরা আদৌ সামাজিক সচলতায় পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা।

1.4 M‡ewIZ GjvKv : আমার গবেষিত এলাকা হাজারীবাগের গণকটুলী। এটি রাজধানী ঢাকার একটি পুরনো এলাকা। গণকটুলী হরিজন কলোনিগুলো এ এলাকায় অবস্থিত। পাকিস্তান আমলে এখানে ৫টি কলোনি তৈরি করা হয়। এ ভবনগুলোর প্রত্যেকটিতে ৪টি করে তলা রয়েছে। এ ৫টি কলোনিতেই অন্ত্যজরা বসবাস করেন। তার আগে কয়েক দশক ধরে অন্ত্যজরা ইডেন কলেজের সামনে মাঠের মধ্যে বসবাস করতেন। তাছাড়া আরেকটি অংশ বসবাস করতেন পলাশীতে। পরে এসব অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার মানুষ গনকটুলীতে স্থানান্তরিত হন। গণকটুলী হরিজন কলোনিতে ঢোকার বামপাশে যে কলোনিটি সেটিতে মুসলমান পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বসবাস। আবাসন সঙ্কট প্রবল হওয়ায় সরকার নতুনভাবে ৪টি কলোনি তৈরি করে। এর মধ্যে ১টি কলোনি অন্ত্যজদের বরাদ্দ দেয়া হয় যেটি পূজা মন্ডপের পশ্চিমে অবস্থিত। বাকি ৩টি কলোনি মুসলমান পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বসবাসের জন্য তৈরি করা হয়। বর্তমানে আরও ৩টি নতুন কলোনি তৈরি হয়েছে। যা মুসলমান পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য বরাদ্দকৃত। অতি সম্প্রতি পাকিস্তান আমলে নির্মিত ৫টি কলোনি ভেঙ্গে ফেলে নতুন করে তৈরি করা হবে বলে স্থির করা হয়েছে। এ কলোনিগুলোতে অন্ত্যজরা বসবাস করেন। ফলে তাদের মনে সন্দেহ তৈরি হয়েছে, এ ৫টি কলোনি নতুন করে তৈরির পর হয়তো মুসলমান পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের দেয়া হবে। ফলে অন্ত্যজদের মধ্যে নতুন করে বাসস্থান হারাবার অস্তিত্ব সঙ্কট তৈরি হয়েছে। এ অনিশ্চয়তার কারণে তারা কলোনিগুলো ছাড়তে চাচ্ছেন না।

গণকটুলী হরিজন কলোনিগুলোতে জায়গা না পেয়ে সীমানার ভেতর অনেক অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার মানুষ টিনের চালা নির্মাণ করে কলোনিগুলোর আশেপাশে বসবাস করছেন। প্রয়োজন অনুসারে তাদেরও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ টিনের চালাগুলো নির্মাণের পর কলোনির ঘেরাটোপের মধ্যে অসংখ্য অলিগলি তৈরি হয়েছে। কয়েকটি টিনের চালা আবার কয়েকতলা বিশিষ্ট। এগুলোর ভেতরই অন্ত্যজরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। উল্লেখ্য, কলোনিগুলোতে ঘর বরাদ্দ পাবার পরও অনেক অন্ত্যজ ইচ্ছাকৃত ভাবে টিনের চালায় বাস করেন। তারা কলোনির ভেতর বরাদ্দকৃত ঘরগুলো বাড়তি আয়ের আশায় ভাড়া দিয়ে দেন। তার মধ্যে অন্ত্যজ ও মুসলমান পরিচ্ছন্নতাকর্মী উভয়ই আছেন।

আমি আমার গবেষণা অন্ত্যজদের মধ্যে সম্পন্ন করেছি। অন্ত্যজ শ্রেণীর অনেকে তাতিঁবাজারে অলঙ্কার ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। গবেষণা করতে গিয়ে আমি নিজেও সেখানে গিয়েছি এবং হাতে পড়ার জন্য একটি ব্রেসলেট বানিয়েছি। এতে অন্ত্যজদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তৈরি সহজতর হয়। গণকটুলীর উত্তরে রায়েরবাজার, ধানমন্ডি, পূর্বদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণে হাজারীবাগ রোড, পরে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং পশ্চিমে বুড়িগঙ্গা নদী অবস্থিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের কাছাকাছি হওয়ায় আমার গবেষিত এলাকায় যাওয়া খুব সুবিধা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি এ এলাকাতেই অবস্থিত। তাছাড়া বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের ১ ও ৫ নম্বর গেট অন্ত্যজদের কলোনির খুব কাছে অবস্থিত। কলোনিগুলোতে যাওয়ার পথে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সিনেমা হল এবং ন্যায্যমূল্যের দোকান চোখে পড়ে। ইডেন কলেজ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, ভিকারুননিসা নূন কলেজের আজিমপুর শাখা, আজিমপুর করবস্থান ইত্যাদি এর কাছাকাছি হওয়ায় এ এলাকার গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে।

গণকটুলীর হরিজন কলোনিতে ধর্মের ভিত্তিতে জনসংখ্যা :

ধর্ম	পরিবার	জনসংখ্যা
অন্ত্যজ	৪৫৬	২৭৩৬
মুসলমান	৮৩২	৪৯৯২
অন্যান্য	০	০
মোট	১২৮৮	৭৭২৮

(মাঠকর্মের তথ্য)

গণকটুলীর হরিজন কলোনিতে পেশার ভিত্তিতে জনসংখ্যা :

পেশা	পরিবারের সংখ্যা
পরিচ্ছন্নতাকর্মী	১১২০
অন্যান্য	১৬৮
মোট	১২৮৮

(মাঠকর্মের তথ্য)

গণকটুলীর হরিজন কলোনিতে বসবাসরত জনসংখ্যার বৈবাহিক অবস্থা :

বৈবাহিক অবস্থা	ব্যক্তির সংখ্যা
বিবাহিত	২১৪১
অবিবাহিত	১৭৯১
বিধবা	৭৬
মোট	৪০০৮

(মাঠকর্মের তথ্য)

গণকটুলীর হরিজন কলোনিতে বসবাসরত জনসংখ্যার শিক্ষা সারণী:

ডিগ্রী	অন্ত্যজ	মুসলমান
স্নাতকত্তোর	১৯	১২
স্নাতক	২৭	১৭
এইচ.এস.সি.	৪০	৪২
এস. এস.সি.	১১৮	৫৩

(মাঠকর্মের তথ্য)

নিচে গণকটুলী হরিজন কলোনিগুলোর অবস্থান মানচিত্র দ্বারা দেখানো হল :

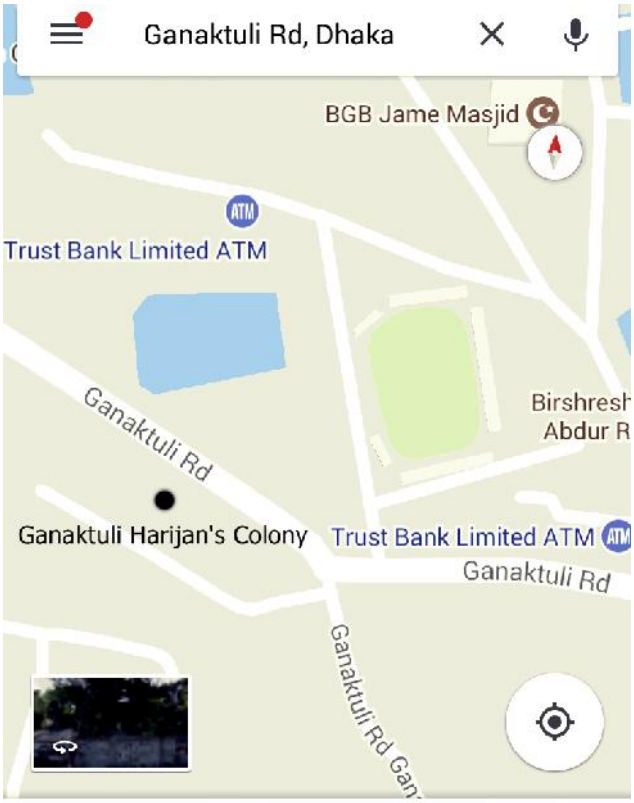

Ganaktuli Rd

1.4 gvVK‡gi AwfÁZv : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র হিসেবে আমাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে কার্ল মার্ক্স, ম্যাক্স ওয়েবার ও আন্তোনিও গ্রামসি। তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ষাট-সত্তর দশকের ধারাগুলো আমাকে অন্ত্যজদের মাঝে সামাজিক সচলতা দেখতে গভীর ভাবে নাড়া দেয় এবং আমি মাঠকর্ম সম্পাদন করি।

গবেষণা চলাকালে অন্ত্যজ কলোনিগুলোতে আমি নিয়মিত যাতায়াত করেছি। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের অংশ হিসেবে কলোনির বাসিন্দাদের আনন্দ-বেদনা অনুভব করার চেষ্টা করেছি। তাদের এ আনন্দ-বেদনার ভাগীদার হতে গিয়ে আমার নিজস্ব কিছু মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা সংগৃহীত হয়েছে। যেগুলো আমি আমার ক্ষেত্র গবেষণার আনন্দ-বেদনা হিসেবে ধরে নিয়েছি। নিম্নে কয়েকটি ঘটনা আলোচনা করা হল।

অন্ত্যজ কলোনিগুলোতে কাজ করার সময় আমার একজন সহকারী ছিলেন। তার নাম রাজিব রবিদাস। অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার মানুষের বসবাসের জন্য তৈরি কলোনিতে জন্মগ্রহণ করেও রাজিব পড়াশোনায় অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। কবি নজরুল সরকারি কলেজে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজিব অন্ত্যজ শ্রেণীপেশায় নিয়োজিত মানুষদের উন্নয়নে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতেন। বহুদিন কলোনির ১০ বর্গফুটের ঘরগুলো এবং আশেপাশের ঝুপড়ি ঘরগুলোতে ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহের পর আমি রাজিবের বাড়ি গিয়েছি, তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে একত্রে বসে খাওয়া-দাওয়া করেছি, মিলেমিশে তাদের পরিবারের একজন হতে চেষ্টা করেছি। উলেখ্য, আমি অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার পরিবারগুলোর কাছে গবেষক নয় বরং বন্ধু হতে চেয়েছি। অন্ত্যজ কলোনির বাসিন্দা রাজিব রবিদাসকে বন্ধু হিসেবে পাওয়াও আমার জীবনের একটি বড় প্রাপ্তি।

মাঠকর্মে অবস্থানকালে আমার সঙ্গে কিছু জিনিসপত্র থাকত। যেমন : ডায়েরি, কলম, টেপ রেকর্ডার, ক্যামেরা ইত্যাদি। আমি আমার প্রয়োজন অনুসারে এগুলো ব্যবহার করতাম।

আমার শ্বশুরবাড়ি হাজারীবাগ হওয়ায় আমার বেশ কিছু সুবিধা হয়েছে। গবেষণার ক্ষেত্র কাছাকাছি হওয়ায় তারা বিভিন্নভাবে আমাকে সহায়তা করেছেন। তারা হাজারীবাগের স্থায়ী বাসিন্দা বলে প্রত্যক্ষ ভাবে আমাকে অনেক তথ্য সরবরাহ করেছেন যা একজন বহিরাগত হিসেবে আমার জানার কথা ছিল না।

অন্ত্যজদের কলোনিগুলো মূলত সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। তাদের বসবাসের এলাকাগুলো রাজনৈতিক ভাবেও প্রভাবিত। ভোটের জন্য বিভিন্ন দলের নেতাকর্মীরা অন্ত্যজদের কাছে যান। তার ফলে কলোনিতে অনেক ভাড়াটে মাস্তানের জন্ম হয় যারা কলোনি ছাড়া কলোনির বাইরেও বর্তমানে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। এখানে অনেকগুলো দল ও উপদল রয়েছে। এদের মধ্যে প্রায়শই কোন্দল দেখা যায়। ফলে ঝগড়া বিবাদ থেকে হত্যাকান্ড পর্যন্ত সংগঠিত হয়ে থাকে। কলোনিগুলোর সবগুলো কক্ষ অন্ত্যজদের অধিকারেও নেই। মুসলমান পরিচ্ছন্নতাকর্মীরাও কলোনিতে বসবাস করছেন। তারাও কলোনির ঘেরাটোপে প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিবাদে লিপ্ত হয়।

মাঠকর্মের একদিনের ঘটনা আমার খুব মনে পড়ছে। সেদিন আমার সঙ্গে রাজিব ছিলেন না। একা একা ছবি তোলার ফাঁকে কলোনির কিছু ছেলে আমাকে ঘিরে ফেলেন। আমি আমার গবেষণার একটি জায়গায় উল্লেখ করেছি, অন্ত্যজ কলোনিগুলোতে মাদক ব্যবসার সঙ্গে বেশিরভাগ বয়স্ক মহিলা জড়িত। সে উদ্দেশ্যে তাদের ছবি তোলার সময় আমার উপর চড়াও হয় ছেলেগুলো। হতে পারে ছেলেগুলো বয়স্ক মহিলাগুলোর মাদক ব্যবসার সহকারী যারা ক্রেতার কাছে মালামাল হস্তান্তর করেন। চড়াও হওয়ার পর তারা আমাকে তাড়া করেন এবং কলোনির ভেতর আটকে রাখেন। পরে আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন খবর পেয়ে আমাকে উদ্ধার করেন।

মূলত এভাবেই আমার দীর্ঘ গবেষণা শেষ হয়। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বাদ দিলে সামগ্রীকভাবে অন্ত্যজদের কলোনিগুলোতে আমার অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে আনন্দের, বৈচিত্রের ও অভিজ্ঞতায় ভরপুর। যে ভালবাসা আমি তাদের কাছে পেয়েছি তা সারাজীবন মনে রাখার মতন। আমি মনে প্রাণে এ অধিকার বঞ্চিত মানুষগুলোর উন্নয়ন কামনা করছি।

1.5 M‡elYvi mxgve×Zv : প্রতিটি কাজের পেছনে কোন না কোন সীমাবদ্ধতা থাকে। আমিও আমার এ গবেষণায় নানা ধরনের সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হয়েছি। আমার গবেষণার সীমাবদ্ধতাগুলো হল :

১) দারিদ্রতার কারণে বেশিরভাগ উত্তরদাতা সাহায্য প্রাপ্তির আশা নেই বলে উৎসাহ বোধ করেননি।

২) গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত সাক্ষাৎকারের পরিবেশ অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিকূল ছিল। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও জড়িত।

৩) আবার গবেষিত জনগোষ্ঠীর অনেকে আমাকে দেখেছেন সন্দেহের চোখে। অন্ত্যজদের সঙ্গে তাদের মত আচরণ করে মেশার যোগ্যতা অনেকক্ষেত্রে হয়তো আমারও ছিল না। এটি আমার ব্যক্তিগত ত্রুটি বলে মেনে নিচ্ছি।

Dhaka University Institutional Repository

wØZxq Aa¨vq

ZwËK †c ÿ vcU Ges mvwnZ¨ chv‡ j vPbv

2.1 ZwËK †c ÿ vcU : গবেষণার তত্ত্বীয় কাঠামো নির্মাণে বেশ কিছু তাত্ত্বিকের তত্ত্ব গ্রহণ করা হয়েছে। এ তত্ত্বগুলোই 'সামাজিক সচলতায় অন্ত্যজরা : শুচি-অশুচির বর্তমান রূপ' শিরোনামের গবেষণায় মূল কাঠামো হিসেবে কাজ করেছে।

আমার গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণের মূল ভিত্তি তৈরিতে সহায়ক হয়েছেন কার্ল মার্ক্স, এমিল ডুর্খেইম ও ম্যাক্স ওয়েবার। তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই ষাট-সত্তর দশকের ধারাগুলো আমার গবেষণায় তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণে ব্যবহার করেছি।

গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণে প্রথমেই মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী শ্রেণী ও ধর্ম নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা হয়েছে। অন্ত্যজদের নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে শ্রেণী বিষয়ক মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্ত্যজদের মধ্যে ঐতিহাসিক বিকাশ কিভাবে ধারাবাহিক ভাবে সংঘটিত হয়েছে, সেখানে কিরূপে সামাজিক সচলতা এসেছে, হিন্দু বর্ণ ব্যবস্থার বিধিনিষেধের মধ্যে কিভাবে অন্ত্যজরা তাদের সচলতাকে টিকিয়ে রেখেছেন, নির্দিষ্ট কাজের গণ্ডিতে সে সচলতাই বা কতটুকু এ বিষয়গুলো দেখতে যেয়ে কার্ল মার্ক্স প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

অন্ত্যজদের নিয়ে মাঠকর্ম করতে যেয়ে মার্ক্সের ধর্ম সর্ম্পকিত আলোচনাটিও প্রভাব বিস্তার করেছে। ধর্ম সম্পর্কে মার্ক্সের কালজয়ী কথা হচ্ছে, ধর্ম হচ্ছে মায়া মমতাহীন জগতে নিপীড়িত জনগণের আফিম কিংবা যন্ত্রণা-নিবারক। ক্রিটিক অব হেগেল'স ফিলসফি অফ রাইট-এ (১৮৪৩) মার্ক্স ব্যাখ্যা করেন, ধর্ম একই সঙ্গে শাসক শ্রেণীর আধিপত্যকে বৈধতা দান করে এবং মেনে নেয়ার আহবান জানায়। সেই সঙ্গে নির্যাতিত মানুষজনের প্রতিবাদী হওয়ার সম্ভাবনা নষ্ট করে। মৃত্যুর পর মুক্তির পাওয়ার আশা-ভরসা প্রদানের মাধ্যমে ধর্ম বর্তমান কালের নিপীড়ন বা কষ্টকে মেনে নেয়ার কথা বলে। আমার গবেষণায় অন্ত্যজদের বিদ্যমান ধর্মীয় আচার দেখতে গিয়ে মার্ক্সের শাসক শ্রেণীর

মতাদর্শের উৎপাদ ভাবনাটি কাজ করেছে। অন্ত্যজদের যুগ যুগ ধরে পেশা টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে কিভাবে তাদের বৈপ্লবিক সম্ভাবনার মৃত্যু হয়েছে, কিভাবে তারা সমাজের যাবতীয় নিপীড়ন মেনে নিয়েছেন সে বিষয়টি দেখতে যেয়েও মার্ক্স প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। অন্ত্যজদের ব্রিটিশ শাসকরা ঝাড়ুদারি পেশায় নিয়ে এসেছিলেন। ঝাড়ুদারি পেশায় আগমনের করুণ ইতিহাস গবেষণার অন্য অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিত্তি হিসেবে এমিল ডুর্খেইমের কর্ম আমাকে অনুপ্রানিত করেছে। ডুর্খেইম ধর্মের জ্ঞানতত্ত্বীয় বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। ধর্ম অন্ত্যজদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্ত্যজদের সামাজিক সংহতি প্রকাশে ধর্ম কিভাবে ভূমিকা রাখছে তা জানার জন্য ডুর্খেইমের তত্ত্ব প্রাসঙ্গিক। ডুর্খেইমের একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ছিল, ধর্মীয় বিশ্বাস হচ্ছে এক অর্থে সমাজেরই রূপক। অন্ত্যজদের সামাজিক সচলতায় কিভাবে রূপক ভূমিকা রাখছে, অন্ত্যজদের জীবনে ধর্ম কিভাবে একই চাহিদায় সাড়া দেয়, একই ভূমিকা পালন করে, সেগুলোর পেছনে কি কারণ রয়েছে ইত্যাদি আলোচনায় ডুর্খেইমের তত্ত্ব প্রাধান্য পেয়েছে। তাছাড়া ডুর্খেইমের-পবিত্রতা হচ্ছে সামাজিক বাস্তবতার প্রতীকী বহিঃপ্রকাশ তত্ত্বটিও অন্ত্যজদের শুচি-অশুচির বর্তমান রূপ দেখায় ভূমিকা রেখেছে।

পরবর্তীতে ম্যাক্স ওয়েবারের তত্ত্বও আমার গবেষণায় ভিত্তিস্বরূপ কাজ করেছে। ধর্ম, শ্রেণী ও মর্যাদা নিয়ে ওয়েবারের অনুসন্ধান, স্তর বিন্যস্ততা সম্পর্কিত তত্ত্ব এবং পদ্ধতিমালা বিষয়ে তাঁর অবদান আমার গবেষণায় অন্ত্যজদের জীবনে ধর্মের প্রভাব দেখতে ভূমিকা রেখেছে। শ্রেণীর বিচারে অন্ত্যজদের মর্যাদাগত অবস্থান কেমন, আমরা কিভাবে তাদের মূল্যায়ন করছি, বিশেষ পরিস্থিতিতে অন্ত্যজদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনয়নে তাদের বিশ্বাসব্যবস্থা কি নির্ধারণী ভূমিকা পালন করতে পারে ইত্যাদি বিবেচনার জন্য গবেষণায় ম্যাক্স ওয়েবার অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

মূলত কার্ল মার্ক্স, এমিল ডুর্খেইম ও ম্যাক্স ওয়েবার আমার নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামোর মূল ভিত্তি তৈরিতে সহায়ক হয়েছে। তবে, ষাট-সত্তর দশকের ধারাগুলো আমি আমার গবেষণায় তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণে অনুসরণ করেছি। এ ধারাগুলো দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই আমি উত্তর

আধুনিকতাবাদ এবং Interpretative Anthropology অর্থাৎ ব্যাখ্যামূলক নৃবিজ্ঞানের আলোকে তত্ত্বীয় কাঠামো নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছি।

গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণে আন্তোনিও গ্রামসির তত্ত্ব দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালিতে মার্ক্সীয় ভাবনার নতুন ধরণ তৈরিতে গ্রামসির কাজ কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। গ্রামসির সমগ্র জীবন কেটেছে দেশটির নিম্নবর্গের মানুষের মুক্তি অর্জনের জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম করতে করতে। গ্রামসিকে কেন্দ্র করে মুসোলিনি খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। মুসোলিনি ঘোষণা দেন, এ মস্তিষ্কটা যেন আগামী বিশ বছর দেশের জনগণের পক্ষে কাজ করতে না পারে। ১৯২৬ সালে মুসোলিনি গ্রামসিকে বন্দি করেছিলেন। গ্রামসি বাকি জীবন জেলেই কাটান। জেলখানায় বসেই গ্রামসি দেশের সমাজ, রাজনীতি, শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন প্রসঙ্গে ডায়েরিতে লিখতে থাকেন। জেলখানায় তাঁর লেখালেখির একাংশ ইংরেজিতে Selections from the Prison Notebooks (1971) নামে বের হয়। জেলখানার সেন্সরশীপের কঠোর বাধার সম্মুখীন হয়ে এ লেখাগুলো গ্রামসিকে লিখতে হয়েছিল।

রবার্ট বোকক আন্তোনিও গ্রামসির হেজেমনির ধারণা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন তাঁর গ্রন্থে (Bocock, 1986). তাঁর মতে, বর্তমানকালের সামাজিক বিজ্ঞানে হেজেমনির ধারণা নতুন জ্ঞানের ভান্ডার খুলে দিয়েছে। উনিশ শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকে এ ভাবনার জন্ম হয়। কিভাবে অতীতে ও বর্তমানে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ সংগঠিত হয়েছিল অথবা সংগঠিত হবার পথে শামিল হয়েছিল তা বর্ণনা ও বিশ্লেষণের লক্ষ্যে গ্রামসি হেজেমনির ধারণা ব্যবহার করেন। নীতিনৈতিক ও দার্শনিক নেতৃত্ব বোঝাতেই হেজেমনি শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সমাজের বৃহৎ গোষ্ঠীর সক্রিয় সম্মতির মধ্য দিয়ে এ নেতৃত্ব অর্জিত হয় (আহমেদ; চৌধুরী, ২০০৩)।

আমি আমার গবেষণায় দেখেছি অন্ত্যজরা কিভাবে বৃহৎ গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ধরে রাখে। আদি হরিজন ও মুসলমানদের মধ্যে দার্শনিক নেতৃত্ব কিভাবে বিরাজ করে তা বুঝতে আমাকে সহায়তা করেছে আন্তোনিও গ্রামসি।

গ্রামসির ভাবনায় হেজেমনির ধারণা একটি প্রধান বিষয় যা একেবারেই মৌলিক। সে সমালোচনার মধ্যে ছিল : মার্ক্সবাদ কৃত্রিমভাবে সংস্কৃতি ও রাজনীতি থেকে বিযুক্ত করে অর্থনৈতিক ভিত্তিকে।

বুর্জোয়ারা হেজেমনিক ভাবেও শাসন করে বলে গ্রামসি যুক্তি দেন। এ কথাটি অন্ত্যজদের নিদারুণ কষ্টের জীবনযাত্রা দেখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর ব্যাখ্যায় গ্রামসি বলপ্রয়োগ ও হেজেমনিকে বিশিষ্ট করেন। গ্রামসি যুক্তি তুলে ধরেন, একটি সমাজের বলপ্রয়োগকারী ক্ষমতার উৎস হল রাষ্ট্র এবং হেজেমনিক নেতৃত্বের পরিসরের জায়গা হচ্ছে সিভিল সমাজ। গ্রামসির প্রিজন নোটবুকে তিনটি আলাদা বৈশিষ্ট্যের মডেল রয়েছে বলে পেরী অ্যান্ডরসন লিখিত ১৯৭৭ সালের একটা প্রবন্ধ থেকে বোকক যুক্তি উদ্ধৃত করেন।

প্রথম মডেলে সিভিল সমাজ কর্তৃক অনুশীলিত হিসেবে হেজেমনিকে দেখা হয়, সাংস্কৃতিক ও নীতি নৈতিক নেতৃত্ব আকারে। রাষ্ট্র এখানে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে বলপ্রয়োগকারী ক্ষমতার স্থান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

দ্বিতীয় মডেলে হেজেমনিকে দেখানো হয় রাষ্ট্র ও সিভিল সমাজ দ্বারা অনুশীলিত হিসেবে। এখানে গ্রামসি হেজেমনি চর্চার ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আইনী প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপক গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। বিশ শতকে প্রাথমিক ভাবে ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলে হেজেমনি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ববহ ছিল বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা এবং পুলিশি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। রাষ্ট্রের কার্যক্রম ক্রমবর্ধমান ছিল, সিভিল সমাজের নয়।

গ্রামসির হেজেমনির ধারণার তৃতীয় মডেলে রাষ্ট্র ও সিভিল সমাজের বিশিষ্টতা হারায়। (Bocock, 1986).

গ্রামসি এখানে এসে রাষ্ট্র ও সিভিল সমাজের ফারাক বাতিল করেন বলে অ্যান্ডারসন মত দেন। কট্টর মার্ক্সবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে একটা মোড় প্রদানের মধ্যে গ্রামসীয় হেজেমনির ধারণার মৌলিকত্ব

রয়েছে। কট্টর মার্ক্সবাদী অবস্থানে মার্ক্সবাদকে দেখা হয় অর্থনৈতিক ভাবে নির্ধারিত শ্রেণী এবং তাদের কর্মকাণ্ড বিষয়ক তত্ত্ব হিসেবে (আহমেদ; চৌধুরী, ২০০৩)।

উল্লেখ্য, গ্রামসির দর্শনে যে সাবলটার্ন ইতিহাসের সূত্রপাত সেটি নিঃসন্দেহে আমার গবেষণাধীন জনগোষ্ঠী অন্ত্যজদের বিবর্তনশীল সামাজিক বিন্যাস এবং সামাজিক সম্পর্কের জটিল ও বহুস্তর বিশিষ্ট বাস্তবতাটিকে সত্যের অনেক কাছাকাছি এনে ব্যাখ্যা করে।

মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সাবলটার্ন শব্দটির প্রথম প্রয়োগ পাওয়া যায় গ্রামসির রচনাতেই। কখনও প্রলেতারিয়েত, কখনও বা আরও ব্যাপক সাধারণ অর্থেও শব্দটি ব্যবহার করেছেন তিনি (চট্টোপাধ্যায়, ২০১২)। ভারতীয় উপমহাদেশের মত কৃষিপ্রধান দেশে, যেখানে বুর্জোয়া বিপ্লব এবং ধনতন্ত্রের বিকাশ সুষমভাবে ঘটেনি, সেখানে অবশ্যই রয়ে গেছে শ্রেণীবৈষম্যের আরও জটিল স্তরভেদ এবং এ স্তরভেদ দেখতে আমার কাছে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে আন্তোনিও গ্রামসি। তাছাড়া গ্রামসির উক্তি, 'বুর্জোয়ারা হেজেমনিক ভাবেও শাসন করে'-একথাটি অন্ত্যজদের জীবনযাত্রা দেখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতে জাতি ব্যবস্থার উপর প্রথম আলোচনা শুরু করেন ঔপনিবেশিক যুগের পশ্চিমী পর্যবেক্ষকরা। মূলত ধর্মগ্রন্থের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় সমাজকে তারা বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে শুধুমাত্র ধর্মের শক্তিই জাতিগুলোকে পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ করে এক বিরাট বৃত্তের মধ্যে ধরে রাখে বলে তারা ধারণা করেছিলেন। পরবর্তীকালে যখন অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি চালু হল, তখনও কিন্তু এ পুঁথিগত জ্ঞানকে বাস্তব অবস্থার উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা হল। খোলা মন নিয়ে বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস দেখা গেল না। ফলে শুধু ধর্মীয় বিভাজনের রূপরেখাগুলোই দেখা গেল। নৃতাত্ত্বিক বারনার্ড কোহন (১৯৮৬) যাকে সমালোচনা করে বলেন পৃথকীকরণ তত্ত্ব। কোহন তাঁর India: The Social Anthropology of a Civilization (1971) বইটিতে ভারতের জাতিবর্ণ নিয়ে প্রথাগত ধারার বাইরে আলোচনা করেন। তিনি মূলত ভারতের সমাজকাঠামো ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জাতিবর্ণকে প্রোথিত করে দেখেন। ফলে জাতিবর্ণে অর্থ তৈরি হয়েছে জ্ঞাতিসম্পর্কীয় ব্যবস্থা হিসেবে, সাংস্কৃতিক ও পেশাগত বর্গ হিসেবে, রাজনৈতিক ও পেশাগত সংঘ হিসেবে।

কোহনের মতে, জাতিবর্ণ ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় একটা স্মারক বিশেষ। জাতিবর্ণ ব্যবস্থা কি সেটার সাধারণ কোন একক সংজ্ঞা নেই। জাতিবর্ণ ব্যবস্থা কতগুলো জন্ম নির্ধারিত গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত। কোন এক গোষ্ঠীতে সদস্যপদ বেশ কিছু আচরণ, আকাঙ্খা, দ্বায়িত্ব নির্ধারণ করে এবং নির্দিষ্ট কিছু মর্যাদাপ্রাপ্তি এবং সামাজিক ক্রিয়াকর্মও নির্ধারণ করে। এ ব্যবস্থায় মর্যাদা আরোপিত ও অপরিবর্তনীয়। পুরো ব্যবস্থাটি স্তরবিন্যস্ত, একটার সঙ্গে আরেকটার উচ্চ-নীচ ভেদ আছে। গোষ্ঠীগুলো অন্তঃবৈবাহিক। অর্থ্যাৎ বিয়ে হয় নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে। জাতিবর্ণের সঙ্গে শুচি-অশুচির মূল্যবোধ সম্পর্কিত ধারণা সম্পর্কিত।

একাধিক জাতিবর্ণের সদস্যরা পরস্পর সমান জাত বলে পরিচিত- এ প্রেক্ষিতে কোহন জাতিবর্ণকে সাংস্কৃতিক বর্গ বলেছেন।

অন্ত্যজদের উপর গবেষণা করার সময় পৃথকীকরণ তত্ত্ব আমাকে প্রভাবিত করে। বর্তমানে ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটের তুলনায় বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট আলাদা। এ দেশের সমাজব্যবস্থা এখন অনেকটাই বর্ণভিত্তিকের তুলনায় শ্রেণীভিত্তিক। শ্রেণীভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আমরা কেমন করে অন্ত্যজদের কলোনির ঘেরাটোপে আলাদা করে রেখেছি, সামাজিক ভাবে একরকম বয়কট করে যুগের পর যুগ মূল ধারা থেকে পৃথক করে অশুচির তকমা লাগিয়ে রেখেছি তা বুঝতে আমাকে পৃথকীকরণ তত্ত্ব সহায়তা করেছে।

গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে লুই দুমোঁ। দুমোঁ জাতিবর্ণ হচ্ছে ভারতীয় সমাজের একত্রকারী প্রতিষ্ঠান বলে অত্যন্ত জোরালো তত্ত্ব দান করেন।

লুই দুমোঁ তাঁর বিতর্কিত Homo Hierarchicus (1980) গ্রন্থে বলেন, ভারতীয় সমাজের ধর্মীয় গঠনকে নির্ধারণ করা হয়েছে শুচি/অশুচির ধর্মীয় চেতনায়। ক্রমোচ্চ বিন্যাস এ সমাজ কাঠামোর মূল বৈশিষ্ট্য, যেখানে শুচি/অশুচির মানদন্ডে প্রতিটি জাতির পদমর্যাদা নির্দিষ্ট হয়। এক সার্বজনীন ধর্মের শক্তি জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে সমগ্র সমাজটিকে একত্রে ধরে রাখে।

যাবতীয় ঐহিক ক্ষমতা এখানে পরাভূত হয় ধর্মের ভাবগত শক্তির কাছে (আহমেদ; চৌধুরী, ২০০৩)।

দুমোঁর বক্তব্য হচ্ছে, প্রতিটি আধুনিক সমাজে বাস্তবে রয়েছে ধনসম্পদ, ক্ষমতা ও মর্যাদার অসমতা, কিন্তু এটি ভারতীয় সমাজ হতে ভিন্ন যেহেতু সেখানকার মূল নীতি হচ্ছে স্তরবিন্যস্ততা। দুমোঁ বলেন, শুচি ও অশুচি বোঝানো হয় পরস্পর হতে সর্বোচ্চ দূরে অবস্থানকারী দুইটি বর্গের সাহায্যে। যথা : ব্রাহ্মণ ও নমঃশূদ্র।

উল্লেখ্য, নৃবিজ্ঞানে দুমোঁর Homo Hierarchicus (1970) ভারতের গ্রাম অধ্যায়ন যুগের (১৯৫০-১৯৭০) উপর রচিত। দুমোঁ ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থার একটি কাঠামোবাদী বিশ্লেষণ দাঁড় করান এ বইয়ে। দুমোঁর মতে, ভারতের কাঠামোবাদী সমাজবিজ্ঞানের বাস্তব লক্ষ্য হচ্ছে সামগ্রিক অর্থে ভারত। প্রথাগত শুচি/অশুচি হচ্ছে একটি মৌলিক বিপরীত জোড় যেটি ভারতের স্তরবিন্যস্ততা, সমাজ এবং ক্ষমতা কাঠামোকে সংগঠিত করে। দুমোঁর মতে, স্তরবিন্যস্ততার ধর্মীয় নীতির ভিত্তি হচ্ছে শুচি ও অশুচির বিরোধিতা এবং ধর্মীয় মর্যাদা থেকে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে আলাদা করা। এ অর্থে প্রাচীন হিন্দু মূল্যবোধ ব্যবস্থার একটি মূর্ত রূপ হচ্ছে জাতিবর্ণ ব্যবস্থা।

যেহেতু ব্রাহ্মণরা পুরোহিত শ্রেণী তাই তারা অন্য সব জাতিবর্ণের চেয়ে সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। অচ্ছুতরা গ্রাম হতে দূরে আলাদা পাড়া কিংবা বসতবাটিতে বাস করেন। দুমোঁ বলেন, অশুচিতার প্রেক্ষিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কথা মাঝে মাঝে উল্লেখ করা হয়। যদিও অশুচিতার সঙ্গে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ধারণা যুক্ত তারপরেও এটি বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে না, যেহেতু অচ্ছুততা একটি ধর্মীয় ধারণা। অচ্ছুতের ধারণার উৎপত্তি অস্থায়ী অশুচিতার মধ্যে রয়েছে। অশুচি কাজে নিয়োজিত হওয়ার কারণে কিছু বর্ণের মানুষজন চরম অশুচি কিংবা স্থায়ী ভাবে অশুচি বলে বিবেচিত হন। দুমোঁর আলোচনার প্রেক্ষিতে বর্তমানে উদাহরণ হিসেবে দেখানো যায়-আমার গবেষিত জনগোষ্ঠী অন্ত্যজদের।

এদিকে অচ্ছুতের অশুচিতা এবং ব্রাহ্মণের শুচিতা প্রত্যয়গত ভাবে জড়িত। দুমোঁর মতে, এ দুটো ধারণা পরস্পরকে শক্তি যোগায়। দুমোঁর যুক্তি হচ্ছে, পুরোহিত ও রাজপদ- এ দুই বর্গের মর্যাদা ও ক্ষমতা এবং আধ্যাতিক ও কালগত কর্তৃত্ব আলাদা। এ সম্পর্কটি পুরনো এবং এখনও সমাজে আছে। ব্রাহ্মণ ও রাজা কিংবা ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সম্পর্ক প্রাচীনকাল থেকেই নির্দিষ্ট ও অনড়।

Homo Hierarchicus (1970) এর মূল যুক্তি হল, ভারত হচ্ছে একটি অনৈতিহাসিক, পূর্ণাঙ্গ, স্তরায়িত ও ধর্মীয় সমাজ। ভারতীয় সমাজব্যবস্থা Homo Hierarchicus কে প্রতিনিধিত্ব করে।

দুমোঁ জাতিব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেন শুচি/অশুচির দ্বন্দ্বের দ্বারা বর্ণিত ধর্মীয় ভূমির উপর এবং দাবি করেন যে ধর্মের শক্তি নির্দিষ্ট অংশগুলোকে (পৃথক জাতিগুলোকে) এক পূর্ণতার মধ্যে সংহত করে।

দুঁমো বলেন, জাতিপ্রথাকে কেন্দ্র করে যে মূল্যবোধ ভারতীয় সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সেখানে উচ্চ-নীচের বৈষম্য ক্ষমতার বৈষম্য নয়। সমগ্র সমাজের প্রয়োজনেই উচ্চনীচের প্রভেদটা জরুরি, কারণ নিম্নজাতি যেমন উচ্চের সাহায্য ছাড়া বাচঁতে পারবে না, উচ্চও তেমনি নীচ জাতির সাহায্য ছাড়া বাঁচতে পারবে না। আলাদা আলাদা জনগোষ্ঠীর মধ্যে উচ্চনীচের সম্পর্ক নির্দিষ্ট করেই ভারতে জাতিভেদ প্রথা সবাইকে এক করেছে। প্রত্যেকেরই এখানে নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। কাউকে বাদ দিয়ে অন্যেরা চলতে পারেন না। মূলত দুঁমোর এ বক্তব্য অন্ত্যজ সমাজ গবেষণায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

দুঁমো পড়তে গিয়ে অধ্যাপক হাসান আল শাফীর লেখা Caste in Comparative Context: Muslim Rank and Hierarchy in Bangladesh (2017; South Asian Affairs; Volume-12) প্রবন্ধটা পড়েছি। এ প্রবন্ধের On Homo Hierarchicus: Hindu and Non Hindu Caste অংশটিও আমাকে প্রভাবিত করেছে।

উল্লেখ্য, দুমোঁর কাজের সমালোচনা করেন মেককিম ম্যারিয়ট (১৯৫১)। তিনি বলেন, হিন্দু সমাজব্যবস্থা শুচি-অশুচির মতাদর্শিক বিরোধের ভিত্তিতে তৈরি হয়নি। এখানে সেগুলোর চিহ্নসমূহের

আদান-প্রদান ঘটে। এ চিহ্নসমূহ বিপরীতধর্মী নয়। ম্যারিয়েটের মতে এগুলো গঠনকারী সারমর্ম, যেমন : রক্ত, খাবার, জীবদেহ নিঃসৃত রস ইত্যাদিকে যুক্ত করে হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের গরম ও ঠান্ডা মানুষ, গোষ্ঠী/সম্প্রদায়, পরিবেশের অন্তর্নিহিত ধারণার সঙ্গে। এখানে Hot Food ও Cool Food এর ধারণাও যুক্ত হয়।

আরও সাম্প্রতিককালে দুমোঁর কাজের তীব্র সমালোচনা করেন দীপঙ্কর গুপ্ত (১৯৯১), নিকোলাস ডার্কস্ (২০০১), রনাল্ড ইন্ডেন (১৯৭৫) এবং অর্জুন আপ্পাদুরাই (২০১৩)।

দুমোঁ দাবি করেন জাতি ব্যবস্থার মূল বিষয় হল ক্রমোচ্চতা, দুমোঁ যেখানে আপেক্ষিক শুচিতার ইপর ভিত্তি করে সমস্ত জাতিগুলোকে শ্রেণীবদ্ধ করেন। এ বক্তব্য বিশেষ ভাবে সমালোচনা করেন দীপঙ্কর গুপ্ত। গুপ্তের যুক্তি হল, আলাদা ও বিযুক্ত সমকূলে বিয়ে করা জাতিগুলোর মধ্যে বিভাজনেই আছে জাতিব্যবস্থার সারবস্তু। ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিন্যাস জাতিব্যবস্থার ভিত্তি নয়, এমনকি যেখানে এ বিন্যাস দেখতে পাওয়া যায় সেখানেও শুচি/অশুচির মানদন্ডে তা নির্ধারিত হয় না।

ডার্কস দেখান যে জাতিগুলোর পদমর্যাদা প্রাক ঔপনিবেশিক দক্ষিণ ভারতে শুচি/অশুচির ধর্মীয় মানদন্ডে নির্ধারিত হত না-এ মর্যাদা নির্ভর করত রাজপদ থেকে তাদের দূরত্বের উপর। ডার্কস ঔপনিবেশিকবাদ, ইতিহাস, রাজনীতি ইত্যাদির উপর জোর দিয়েছেন যা দুমোঁ হতে ভিন্ন।

অন্য আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে গেইল ওমভেট (১৯৯৪) (জাতি, বর্ণ ও বাঙালী সমাজ, ১৯৯৮) দেখানোর চেষ্টা করেন, ভারতে জাতিভিত্তিক সামন্তব্যবস্থা টিকে ছিল ব্রাহ্মণদের সঙ্গে রাষ্ট্রক্ষমতার সহযোগিতার ফলে। ঔপনিবেশিক সরকার এ কাঠামোটিকে গ্রহণ করে, পরিবর্তন করে এবং অনেকাংশে শক্তিশালী করে নিজেদের কাজে লাগায়। ডার্কসের কাছ থেকে কয়েকটি শব্দ ধার করে আমরা জাতিব্যবস্থাকে বর্ণনা করতে পারি, ক্ষমতার সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি বলে। ডার্কসের মতে ঔপনিবেশিক ইতিহাস উপেক্ষা করার কারণে রাজনীতি ও ধর্মের আলাদাকরণ খোদ ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপের কারণে কিনা, সেটি দুমোঁ বুঝতে পারেননি।

ইন্ডেন ও আপ্পাদুরাইয়ের বক্তব্য হচ্ছে, দুমোঁর বক্তব্য সমাজবৈজ্ঞানিক কিংবা নৃবৈজ্ঞানিক হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সের ঐতিহ্যের ফলশ্রুতি। এ ডিসকোর্স ভারতকে সেকেলে পরিসর হিসেবে উপস্থাপন করে।

আমার গবেষণায় অন্ত্যজ শ্রেণী সম্পর্কিত গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণে সবচেয়ে শক্তিশালী তত্ত্বটি প্রদান করেন মিশেল ফুকো। বর্তমানে সাংস্কৃতিক অধ্যায়নের প্রধান প্রত্যয় হচ্ছে ডিসকোর্স যা আমাকে প্রভাবিত করেছে। সহজভাবে ডিসকোর্স বলতে বোঝায় কোন বক্তব্য কিংবা ভাষার কোন নির্দিষ্ট টুকরো যা মানুষের মননে প্রতিস্থাপিত হয়। এটি জ্ঞানের জগতে দুটি ভিন্নরকম কিন্তু জড়িত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এ দুটো ক্ষেত্র হল, ভাষাবিদ্যাগত ডিসকোর্স বিশ্লেষণ এবং উত্তর-কাঠামোবাদী ডিসকোর্স তত্ত্ব।

ভাষাবিদ্যাগত ডিসকোর্স বিশ্লেষণ হচ্ছে সেই শাখা যেটি ব্যাখ্যা অধ্যায়ন করে। এক্ষেত্রে ডিসকোর্স বলতে ভাষার ব্যবহারকে বোঝায়, যা-ভাষা হচ্ছে একটি বিমূর্ত ব্যবস্থা–ধারণাটির বিপরীত। ফুকোর ডিসকোর্স বলতে বুঝিয়েছেন এক রাজি বক্তব্য যা কথা বলার একটি ধরন–প্রদান করে। মূলত, ফুকোর আগ্রহের বিষয় ছিল সেই নিয়মাবলী ও অনুশীলন যেগুলো বিভিন্ন ঐতিহাসিক সময়ে অর্থবহ বক্তব্য উৎপাদন করে ডিসকোর্স নিয়ন্ত্রণ করে। ফুকোর ব্যাখ্যা করেন, একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক মুহূর্তে ডিসকোর্স গঠিত হয়, একটি নির্দিষ্ট টপিককে কেন্দ্র করে। মূলত ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান উৎপাদনই ডিসকোর্স। ফুকো আরও বলেন, সব অনুশীলনেরই রয়েছে ডিসকার্সিভ দিক। কারণ অর্থ সব সামাজিক অনুশীলনের অবিচ্ছেদ্যাংশ, অর্থ আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করে।

ডিসকোর্স একই সঙ্গে কোনো বিশেষ বিষয় নিয়ে কথা বলার ধরণ, গ্রহণযোগ্য ও বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন উপায়ে কথা বলা, লেখা কিংবা চলাফেরা করাকে বিধিভুক্ত (Rules In) করে; এটি আবার একই সঙ্গে সে বিষয় কিংবা সে সম্বন্ধে জ্ঞান উৎপাদন সাপেক্ষে কথা বলার এবং চাল চলনের ধরণ সীমাবদ্ধ ও সংকুচিত অর্থ্যাৎ বিধি বহির্ভূত (Rules Out) করে। অর্থ ও অর্থবহ অনুশীলন নির্মিত ডিসকোর্সের ভিতর। ফুকো ডিসকোর্সের মাধ্যমে জ্ঞান ও অর্থের উৎপাদনের উপর জোরারোপ করেন। পাগলত্ব, শাস্তি, যৌনত্ব এ ধরনের বিষয় কেবলমাত্র ডিসকোর্সের ভিতরেই অর্থ লাভ করে। এ বিষয়গুলো

অন্ত্যজদের মধ্যে কিভাবে কাজ করে তা আমি ফুকোর ডিসকোর্সের মধ্য দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি (আহমেদ; চৌধুরী, ২০০৩)।

এদিকে ফুকো সামগ্রীকভাবে ক্ষমতাকেও ব্যাখ্যা করেন। এক্ষেত্রে তাঁর ব্যাখ্যায় ক্ষমতার তিনটি পৃথক মাত্রা বেরিয়ে আসে। যথা : সার্বভৌমত্ব, অনুশাসন ও গর্ভনমেন্টালিটি। সার্বভৌমত্ব হল সনাতন রাষ্ট্রক্ষমতা, যার এক বা একাধিক নির্দিষ্ট কেন্দ্র থাকে, যার প্রতিভূ রাজা অথবা আইনানুগভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন রাষ্ট্রপ্রধান। এ সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করা হয় কোনও নির্দিষ্ট ভূখন্ডের ওপর অথবা কোনও নির্দিষ্ট প্রজামন্ডলীর ওপর। ফুকোর এ বিষয়টি পড়ে আমি সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি এবং সার্বভৌমত্বের বিষযটি কেমন করে অন্ত্যজদের বসবাসের কলোনির ঘেরাটোপের উপর প্রভাব ফেলে তাও অনুধাবনের চেষ্টা করেছি।

অনুশাসনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনায় ফুকো আধুনিক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত করেন হাসপাতাল, কারাগার, স্কুল, কারখানা-এসব প্রতিষ্ঠানকে, যেখানে মানুষকে রাখা হয় নজরবন্দী অবস্থায়। অসুস্থ মানুষের শারীরিক ক্রিয়াকর্ম কেমন চলছে তা পরীক্ষার জন্য তাকে নজরবন্দী রাখা হয় হাসপাতালে, আইনভঙ্গকারীকে নজরাধীন রাখা হয় কারাগারে, ছাত্রকে স্কুলে, শ্রমিককে কারখানায়, অন্ত্যজদের নির্দিষ্ট ঘেরাটোপে। অর্থ্যাৎ কলোনিতে। নজরবন্দী করতে পারলে তবেই তাকে অনুশাসনবদ্ধ করা যায়। এ শাসন শারীরিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে না, তা কাজ করে মানুষের চেতনায়।

ক্ষমতার তৃতীয় একটি মাত্রা রয়েছে ফুকো যার নাম দিয়েছেন গর্ভনমেন্টালিটি। ফুকো শব্দটি তৈরি করেন গর্ভনমেন্ট শব্দের অর্থ থেকে এটিকে পৃথক করতে। আমরা তাই তাকে শুধু প্রশাসন না বলে বলতে পারি প্রশাসনিকতা। এর মূল কথা হল, ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে জনগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য। কোনও সাধারণ অর্থে কল্যাণ নয়, বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর বিশেষ বিশেষ কল্যাণের জন্য (চট্টোপাধ্যায়, ২০১২)। যেমন : জনগোষ্ঠীর কোন বিশেষ অংশের রোজগার বাড়ানো প্রয়োজন, অন্য কোন অংশের কর্মসংস্থান দরকার ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, এ গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণে মিশেল ফুকোর তত্ত্ব অত্যন্ত শক্তিশালী। ফুকো যখন প্রতাপের ছায়ায় বন্দীশালা, চিকিৎসালয়, যৌনতা, নৈতিকতা ও সাহিত্যিক পাঠকৃতিকে লালিত হতে দেখেন–তখন আমরাও নতুন ভাবে আমাদের পৃথিবীটাকে দেখতে শিখি। মূলত, সবকিছুর উপরে ফুকো দেখান, তত্ত্ব-সন্ধান কেবলমাত্র জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া নয়, অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসার সঙ্গেও তা নিবিড় ভাবে সমন্বিত। যেমন : আমি আমার গবেষণার প্রেক্ষাপটে বলতে পারি, অন্ত্যজদের মধ্যে আমি দেখেছি, ক্ষমতাহীনদের মধ্যেও ক্ষমতা আছে। যদিও বর্তমান সময়কালে বাংলাদেশে অন্ত্যজরা একটি অধিকার বঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। দেশে বসবাসকারী অন্যান্য বাংলাদেশীদের তুলনায় অন্ত্যজরা সমাজে মারাত্মকভাবে বঞ্চিত ও অবহেলিত। ফলে তারা ধরেই নিয়েছেন যে, তারা ক্ষমতাহীন, অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় তারা দুর্বল। তাই নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের এ মানসিকতা একদিনে তৈরি হয়নি বরং বছরের পর বছর প্রতাপের ছায়ায় থাকতে থাকতে অন্ত্যজদের এ বিশ্বাস তৈরি হয়েছে। আধুনিক সমাজের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধাকে তারা সন্দেহের চোখে দেখেন। সবকিছুই Fake বা ভুয়া মনে করেন।

ফুকো যখন বারবার বলেন 'Everything is Fake' তখন গবেষক হিসেবে অন্ত্যজদের পরিবর্তনশীল সত্যকে তুলে ধরা আমার জন্য সহজ হয়। চ্যালেঞ্জ করতে ইচ্ছা করে গবেষিত জনগোষ্ঠীর বিরাজমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সমস্যা, মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়, বঞ্চনা, প্রেম, যৌনতা ইত্যাদি সব কিছুকে।

একই কথা চা বাগানের শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আসামের গোয়ালপাড়িয়া অঞ্চলের চা শ্রমিকদের একটা গান আছে। সাধারণত পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম এসব শুষ্ক অঞ্চলের লোকজন তাদের জীবিকার জন্য চা বাগানে যেতেন। সেখানে গিয়ে তাদের জীবনের একটা গল্প তৈরি হয়েছিল। তাদের গানে রয়েছে, বাবু বলে কাম কাম, সাহেব বলে ধরি আন, সর্দার বলে নিব পিঠের চাম ...ও যদুরাম...ফাঁকি দিয়া চালাইলি আসাম। এখানে প্রাসঙ্গিক ফুকো।

তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণে প্রতিবর্তকবাদ (Reflexivism) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর-আধুনিকতাবাদীদের সন্দেহ রয়েছে সামাজিক উন্নয়ন বা সমাজ পরিবর্তনের নামে পশ্চিমা তত্ত্বের প্রয়োগের ওপর। এ

কারণে বর্তমান যুগে গবেষণার কৌশল হিসেবে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহারের ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানীগণ গবেষিত সমাজের মানুষের কাছাকাছি এসে আন্তঃক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ার ওপর বিশেষ জোর আরোপ করেন। যেকোন সমাজের নিজস্ব পরিস্থিতিতে নৃবিজ্ঞানীর নিজের অবস্থান গ্রহণ একটি প্রতিষ্ঠিত ধারণা ছিল। কিন্তু উত্তরাধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে নৃবিজ্ঞানীর নিজের অবস্থান গ্রহণ বিশ্লেষণাত্মক অর্ন্তদৃষ্টি গ্রহণের পথে বাঁধার সৃষ্টি করে বলে বিবেচিত হয়। এ ধরনের অবস্থান গ্রহণ করলে অনেক ক্ষেত্রে সার্বিক মূল্যবোধ নিরপেক্ষতা রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ ধরনের মূল্যবোধ আরোপিত চেতনা অন্য সমাজে ঘটার সম্ভাবনাই বেশি। বস্তুত নৃবৈজ্ঞানিক কৌশল অবলম্বনে Inter subjectivity প্রবণতাকে পরিহার করা কঠিন একটি ব্যাপার। কেবলমাত্র পশ্চিমা গবেষকরাই মূল্যবোধ নিরপেক্ষতা রক্ষায় বিশেষভাবে পারদর্শী তাই এমন মনে করার কোন কারণ নেই (চৌধুরী, ২০০৩)।

অনেক সময় দেখা যায়, নৃবিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণার পার্থক্যের কারণে প্রতিবর্তকবাদ ও অতীতমুখীতা এ উভয়টিকে সচেতনভাবে অর্থবহ জ্ঞানের কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেন। তারা কোন গবেষণা করার সময়ে যেকোন বিষয় বিশ্লেষণে একদিকে নিজের আগের অভিজ্ঞতার ভাবনা প্রাধান্য দেন অন্যদিকে তার উপস্থিতি গবেষিত মানুষের ভাবনাকে কিভাবে প্রভাবিত করে তাও জানার চেষ্টা চালান। এক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানী যাদের নিয়ে গবেষণা করেন তারা নিজেরাও ঐ সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে Social Drama এর নায়করূপে আন্তঃসাংস্কৃতিক আবহে যুক্ত হয়। উল্লেখ্য, Social Drama প্রত্যয়টি ভিক্টর টার্নার বর্ণিত। এ প্রত্যয়টি আমার গবেষণায় টার্নারের আলোকে পরবর্তীতে আলোচিত হয়েছে।

গবেষণার গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগের সময় নিবিড় বর্ণনার বিষয়টি সবসময় মাথায় রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছি। আমি চেষ্টা করেছি অন্ত্যজদের কোন কিছুর চূড়ান্ত ব্যাখ্যা না দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে। তাই বারবার প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে ক্লিফোর্ড গিয়াটর্জ এর তত্ত্ব। প্রতীকবাদের প্রেক্ষাপটে নৃবিজ্ঞানী গিয়াটর্জ এথনোগ্রাফী রচনায় Thick Description বা নিবিড় বর্ণনার উল্লেখ করে বলেন, একটি সমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার মধ্য দিয়ে ঐ সমাজের বৈশিষ্ট্য নিখুঁতভাবে ধরে রাখা সম্ভব যা পরবর্তীকালে অন্য গবেষকের লিখনীতেও পুনঃযাচাই করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। অনেক আগে ম্যালিনস্কি ট্রবিয়ান্ডবাসীদের যে জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করেছিলেন তা সময়ের ধারাবাহিকতায়

পরিবর্তিত হয়। কাজেই এথনোগ্রাফীকে উপন্যাস বা উপাখ্যান হিসেবে পড়ারও প্রয়োজন আছে। এবং ঐ উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়েই পাঠক পরিবর্তিত সমাজটির পরিবর্তনশীলতাকে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারে।

গিয়ার্টস বলেন, নৃবিজ্ঞানী কোন কিছুর চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে পারেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেয়ার প্রয়োজন হয় বিশেষ কোন সমাজের সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্যে। এ কাজটি করতে হবে Native Point of View থেকে। উল্লেখ্য নৃবিজ্ঞানে প্রচলিত এটিক ও এমিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে গিয়ার্টস এমিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী ছিলেন। গিয়ার্টস ব্যাখ্যা দেন, কোন সমাজে গিয়ে গবেষক সব বুঝে ফেলবেন এটা না ভেবে গবেষণাধীন সমাজের সংস্কৃতিকে উপস্থাপনের চেষ্টা করা উচিৎ। বিষয়টি হবে ব্যাখ্যামূলক। Native Point of View বলতে বোঝায়, যে সমাজের ওপর গবেষক কাজ করেন সে সমাজের নিজস্ব যে মূল্যায়ন, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি রয়েছে সেগুলোকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতেই তুলে ধরা। গবেষণাধীন সমাজের দৃষ্টিতে বা তাদের মতো করেই তাদের সংস্কৃতিকে অনুধাবন করতে হবে বলে মত প্রকাশ করেন গিয়ার্টজ। নতুবা ব্যাখ্যামূলক নৃবিজ্ঞানের চরিত্রহানী ঘটবে বলেও সতর্ক করেন তিনি (চৌধুরী, ২০০৩)।

শুচি-অশুচির বিষয়টি নিয়ে কাজ করার সময় মেরী ডগলাসের (১৯৬৬) তত্ত্বটি ভাবনা চিন্তায় ছিল। কাঠামোবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে প্রত্যয়গত অবস্থান থেকে তিনি সবকিছু ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। কারণ মেরী ডগলাসের কেন্দ্রিয় বিষয় ছিল নোংরা, ময়লা বা অশুচি। মেরী ডগলাসের দূষণবোধ ও নৈতিকতা থেকে সৃষ্ট নৈতিক ভুবনবোধের ব্যাখ্যায় বেরিয়ে এসেছে আদিম ও আধুনিক সমাজের বাস্তবতা। আধুনিক সমাজের বাস্তবতায় শুচি-অশুচির আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শুচি-অশুচির বর্তমান রূপ।

মেরী ডগলাস পড়েই আমি জানতে পারি, নোংরাবোধটি একটি সার্বজনীন অর্থবহন করে। নোংরা বলে একটি বস্তুকে বা বিষয়কে নির্দেশ করা হয় তখনই যখন ঐ বিষয়ের স্থান-চ্যুতি ঘটে। আদিম সমাজে নোংরাবোধের মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে নৈতিকতা, নৈতিকতা থেকে তৈরি হচ্ছে নৈতিক ভুবন। এ নৈতিক ভুবন গড়ে উঠার মধ্য দিয়ে একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হচ্ছে। নোংরা হলে পরম বা ঈশ্বরকে পাওয়া

যাবে না। এ কারণে নোংরাকে শুদ্ধির মাধ্যমে ফিরিয়ে আনতে হবে। আদিম সমাজে নোংরা বোধের বিপরীতে পরম বা ঈশ্বরের বোধ তৈরি হচ্ছে। এজন্য নোংরা হল ম্যাজিক, শামান এসবের মাধ্যমে সর্বজনীন একটি আচারের দ্বারা শুদ্ধকরণের প্রক্রিয়া যা ঐ সমাজে বিদ্যমান থাকে। এক্ষেত্রে নোংরা বোধের সঙ্গে জড়িত হচ্ছে বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি।

আবার দূষণবোধ আধুনিক সমাজে বসবাসরত মানুষের স্বাস্থ্যগতবোধ। দূষণ আজকের পৃথিবীতে একটি বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও তা সার্বজনীন নয়। কারণ দূষণবোধের অবস্থান মতাদর্শ। মতাদর্শগত কারণে দূষণ নোংরাবোধের ন্যায় কোন একক এবং সংহত প্রতীক নির্মাণে ব্যর্থ হচ্ছে। এর ফলাফলে মতাদর্শগত সমাজে বোধের ভিন্নতা বিদ্যমান। এ বোধগুলোর মাধ্যমে এক ধরনের শ্রেণীকরণ করা হয় এবং এ শ্রেণীকরণের মাধ্যমে মানুষের মূল্যবোধগুলো তৈরি হয়। এ বোধগুলো সব সমাজে একই অর্থ বহন করে না। এ বোধগুলো যখন প্রতীক তৈরি করে দেয় তখন আর তা নষ্ট করা যায় না। প্রতীক অত্যন্ত শক্তিশালী। এই প্রতীকগুলো তৈরি করছে সংস্কৃতি। তাই মেরী ডগলাস বলেন, সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ শ্রেণীকরণের এ বোধগুলোকে অনুধাবণ করা (চৌধুরী, ২০০৩)।

উল্লেখ্য, অন্ত্যজরা সমাজে ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করেন। অর্থাৎ তারা সমাজের সেবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। সমাজকে ধুয়ে-মুছে পরিচ্ছন্ন রাখে। কিন্তু অন্ত্যজরা নিজেরা থাকছেন নোংরা পরিবেশে। এ বিষয় নিয়ে আলোচনায় তাই মেরী ডগলাসের তত্ত্ব অবধারিত ভাবে চলে আসে।

তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণে প্রতীকবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রূপকনির্ভর অভিব্যক্তির ব্যাপারটি কেবলমাত্র মানুষের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। আমরা জানি সমাজের বস্তুগত বৈশিষ্ট্য ছাড়া বিশাল একটি দিক রয়েছে অবস্তুগত পর্যায়ে। যেমন : রীতি-নীতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ, আচার ইত্যাদি।

সামাজিক সচলতায় অন্ত্যজরাও রূপকনির্ভর অভিব্যক্তির বাইরে নয়। গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণে তাই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে ভিক্টর টার্নার। মূলত তিনি জ্ঞানগত ও প্রত্যয়গত ইতিহাসের আলোকে সমাজের অভিজ্ঞতাকে বুঝতে চেয়েছেন। তিনি মনে করতেন সমাজ কাঠামোর মধ্যে

কেন্দ্রীয় ক্রিয়াশীল বিষয় হচ্ছে অভিজ্ঞতা যা প্রতীকরূপে অবস্থান করে। সামাজিক সচলতায় এ প্রতীকের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তিনি Metaphor বা রূপক নিয়ে আলোচনা করেন। টার্নার মনে করেন, মানব মনের এ রূপকের জন্ম হয় একটি আলো-আধাঁরি অবস্থান থেকে। তিনি এর নাম দেন Liminality. টার্নার বিশ্বাস করতেন সামাজিক সচলতায় বিভিন্ন ঘটনার মূলে অবস্থান করে এ Liminality.

মূলত, চারপাশের সব ঘটনা চাইলেই মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এ কারণে সমাজে বিদ্যমান সব ঘটনার সঙ্গেই মানুষ পরিকল্পিত ভাবে যুক্ত হয় না। টার্নার এ Liminality বলতে মূলতঃ একটি আলো আধাঁরি অবস্থাকে বুঝিয়েছেন। রূপকের সৃষ্টি এ Liminality থেকেই। তবে এ রূপকের কারণ সমাজে স্পষ্ট নয় কারণ চারপাশের সব ঘটনা রূপকে পরিণত হয় না। বিশেষ কিছু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিছু ঘটনা রূপকে পরিণত হয়। এ কারণে বলা হয়ে থাকে যে, Liminality কে ব্যাখ্যা করা যায় না। এটা অস্পষ্ট। এ কারণে সমাজের সব ঘটনাকে একই মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না। সেখানে বাঁক বা কোণের সৃষ্টি হতে পারে। টার্নার মনে করেন, সমাজের ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি দিলেই সমাজকে বুঝতে পারা যায়। কারণ কিছু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এ ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনাবলীই রূপকে পরিণত হয় (চৌধুরী, ২০০৩)।

উত্তর রোডেশিয়ার ন ডেম্বু সমাজের উপর করা ভিক্টর টার্নারের কাজটি এক্ষেত্রে আমি আমার গবেষণার শুচি-অশুচি বিষয়টি দেখার সময় মাথায় রেখেছি। এ ক্ষেত্রে ন ডেম্বু সমাজের জীবনের আচার বোঝাতে ভিক্টর টার্নার প্রতীক হিসেবে লাল, সাদা ও কালো তিনটি রংয়ের ব্যবহার দেখান। এ তিনটি রংয়ের প্রতীক দিয়ে তিনটি নদীকে বোঝানো হয়। এ নদীগুলো দেবতার ক্ষমতার প্রবাহকে ইঙ্গীত করে। এখানে সাদা রংয়ের নদী দিয়ে শুচি, স্বাস্থ্য, ক্ষমতা, জীবন, বৈধতা ইত্যাদি বোঝানো হয়, লাল রংয়ের নদী দিয়ে ভিন্ন রকমের রক্ত বোঝানো হয়। যা ভাল রক্ত এবং খারাপ রক্ত দুটোরই প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কালো রংয়ের নদী দিয়ে প্রেতাত্মা, ডাইনী, রোগ-বালাই ইত্যাদিকে ইঙ্গীত করা হয়। কালো রং দিয়ে মৃত্যু ও অশুচিতাকেও ইঙ্গীত করা হয়। মূলত, লাল ও সাদা রং জীবনের প্রতীক। অপরদিকে কালো রং মৃত্যুর প্রতীক (টার্নার, ১৯৬৬)।

টার্নার বর্ণিত আলো আধাঁরি অবস্থা বা Liminal পর্যায়টি আমি অন্ত্যজদের বিভিন্ন আচার পালন, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে দৃশ্যমান দেখেছি। যেমন : জন্মদান প্রক্রিয়া, যৌবন প্রাপ্তি, মৃত্যুকালীন আচার ইত্যাদি। গবেষক হিসেবে আমার কাজ ছিল, অন্ত্যজদের মধ্যে এ আচারগুলো বোঝার চেষ্টা করা। এ প্রক্রিয়াগুলোই মূলত অন্ত্যজদের জীবনের নানা অভিজ্ঞতায় ভিন্নতা সৃষ্টি করে। এ প্রক্রিয়াগুলো অস্পষ্টতায় ঢাকা।

সত্যজিৎ রায়ের একটি বিখ্যাত চলচ্চিত্র অরণ্যেও দিনরাত্রি। ছবিতে চার বন্ধু মিলে পালামৌর জঙ্গলে বেড়াতে যায়। সেখানকার পরিবেশে এক বন্ধু ইংরেজি দ্য স্টেটম্যান পত্রিকা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে বলে, সভ্যতার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ। তখন কাজটি করার মধ্যে যে আবেদন তৈরি হয়েছিল সে অবস্থাটি Liminality. সে কাজ অন্য কোথাও করলে একই আবেদন তৈরি হবে না।

অন্ত্যজদের ক্ষেত্রেও এমন অনেক Liminal অবস্থা কলোনির ভেতর তৈরি হয়। অন্ত্যজদের মধ্যে গবেষণা করতে গিয়েও দেখা যায় কলোনির ঘেরাটোপে বিভিন্ন ঘটনা, কথা, গান ইত্যাদি ভিন্ন অর্থ তৈরি করে। সেখানে যে আবেদন তৈরি করে সে অবস্থাটি লিমিনালিটি। কিন্তু কলোনির বাইরে এগুলো তেমন কোন আবেদন তৈরি করে না।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও একটি উদাহরণ দেয়া যায়। যেমন : তীর্থ যাত্রা। কোন কোন তীর্থ যাত্রা সাময়িক আবার কোন কোন তীর্থযাত্রা দীর্ঘমেয়াদী। সাময়িক তীর্থযাত্রায় ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে তীর্থক্ষেত্রে গমন করে, অনুষ্ঠানাদি পালন করে আবার সংসারকর্মে ফিরে আসে। কিন্তু ব্যক্তি যখন দীর্ঘমেয়াদী তীর্থ যাত্রায় যায় তখন সংসার ত্যাগী হয়। যেমন : হিন্দুধর্মে সন্নাসব্রত গ্রহণ। এক্ষেত্রে বলা যায়, ব্যক্তি কেন একটি নির্দিষ্ট সময় পরে সংসার জীবনে ফিরে আসে আর কেনই বা কেউ চিরতরে সংসার ছেড়ে চলে যায় এ কারণগুলো ব্যাখ্যা করা যায় না (চৌধুরী, ২০০৩)। এ বিষয়গুলো আলো-আধাঁরিতে ঢাকা।

এ কারণেই বলা চলে, মানুষ তার অভিজ্ঞতা থেকে বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলো দিয়ে তৈরি করে রূপক বা Metaphor. আর সংস্কৃতির মুখ্য বিষয়ই হল রূপক। রূপককে বুঝতে যেয়েই Liminality এর

প্রসঙ্গ। এটি এক ধরনের অস্পষ্টতা কিংবা ধোঁয়াটে, ব্যাখ্যাহীন, অস্পষ্ট বিষয়। মানুষ সেখান থেকে Metaphor বা রূপক তৈরি করে।

গবেষণার প্রাচ্যবাদ প্রত্যয়টিকেও মাথায় রাখবার ইচ্ছা প্রকাশ করছি। সাহিত্য সমালোচক ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ (১৯৭৮) প্রাচ্যবাদ ধারণার জন্ম দেন। তাঁর রচিত ওরিয়েন্টালিজম অত্যন্ত বিখ্যাত। তাঁর মতে, ঔপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে আওতায় রেখে তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বকে শোষণ করার জন্য এবং এসবক দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতার আধিপত্য বিস্তার করার জন্য প্রাচ্য, তৃতীয়বিশ্ব এ ধরনের প্রত্যয়গুলো সৃষ্টি করা হয়েছে। এর মূল ভাবনাটি হল যা পূর্বদেশীয় নয় তাই উন্নত বা পশ্চিমা। সাঈদের মতে, পাশ্চাত্য সমাজের স্বার্থরক্ষার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে এ ধরনের প্রত্যয় নির্মাণ করা হয়েছে (চৌধুরী, ২০০৩)।

একই কথা বলেছেন সমকালীন নৃবিজ্ঞানী তালাল আসাদ। খ্রিস্টীয় রিফর্মেশনের পরবর্তীকালে ধর্মের একটি মৌলিক রূপান্তর ঘটে। আগের স্বেচ্ছাচারী এবং সামাজিক ভাবে অবদমনমূলক ধর্ম পরিবর্তিত হয়ে তুলনামূলক নিরীহ ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। নতুন রূপে আর্বিভূত ধর্মকে প্রায়ই উদারনৈতিক রাজনীতি এবং বিশ্ব সংসারের প্রতি আধুনিকত্বের দৃষ্টি ব্যাখ্যা করতে বলা হয়। সেটিকে বৈধতা দিতেও আহবান জানানো হয়। রাজনীতিকৃত এ ধর্মকে যুক্তি ও মুক্তচর্চার প্রতি হুমকিস্বরূপ বলে তালাল আসাদ উল্লেখ করেন। Genealogies of Religion (1993) বইটিতে তালাল আসাদ মূলত একটি ঐতিহাসিক বর্গ হিসেবে কিভাবে ধর্ম আর্বিভূত হল এবং সেটিকে কিভাবে একটি বিশ্বজনীন প্রত্যয় হিসেবে প্রয়োগ করা হয় তার ব্যাখ্যা দান করেন। তিনি বলেন, ধর্ম গঠনকারী উপাদান এবং সম্পর্ক সমূহ ঐতিহাসিক ভাবে নির্দিষ্ট। তাই ধর্মের কোন সর্বজনীন সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব নয় (আহমেদ; চৌধুরী, ২০০৩)।

জেমস ক্লিফোর্ড ও মার্কাসের Writing Culture গ্রন্থের নতুন ধারাটি আমার মাঠ গবেষণা পরিচালনায় সহায়ক হয়েছে। কারণ এটি উত্তর-আধুনিকতাবাদের ইঙ্গিতবাহী একটি মৌলিক গ্রন্থ। Writing Culture গ্রন্থের ভূমিকায় জেমস ক্লিফোর্ড উল্লেখ করেন, কোন এথনোগ্রাফী, এমন কি নিজ জাতির গবেষকের মাধ্যমে রচিত হলেও, কখনো অবিকল সত্যকে পূর্ণাঙ্গভাবে রূপায়ন করতে পারে না।

এদিক থেকে তিনি এথনোগ্রাফীকে একটি কবিতার সঙ্গে তুলনা করেন। এ কারণেই ক্লিফোর্ড যেকোন এথনোগ্রাফীকে Narrative Character of Culture Representations হিসেবে ব্যাখ্যা দেন। একই ধারায় জর্জ মার্কস এথনোগ্রাফী রচনায় ব্যবহৃত পরিভাষায় রচনাকারীর গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের মুখোশ উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন। উল্লেখ্য, নৃবৈজ্ঞানিক টেক্সটে সাহিত্য রচনার অনুসৃত পদ্ধতিই প্রতিফলিত হওয়া উচিৎ। তবে এথনোগ্রাফী রচনায় ক্ষমতার সম্পর্ক কিভাবে লেখনিকে প্রভাবিত করে তার পরীক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

2.1 mwnZ¨ chv‡jvPbv : বাংলাদেশে অন্ত্যজ সম্প্রদায় নিয়ে গবেষণা খুব কম করা হয়েছে। হাতে গোনা দু'একটি কাজ যা করা হয়েছে তাতে মূলত হিন্দু ধর্মের বর্ণ প্রথার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাই অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের উপর গবেষণা করতে গিয়ে কেবলমাত্র বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নয় সেই সঙ্গে ভারতীয় সমাজের প্রেক্ষিতে যে সব গবেষণাকর্ম হয়েছে সেগুলোর ওপরও নজর দেয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণে সহায়ক বইগুলো নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

K. **Karl Marx; Capital: A Critique of Political Economy, vols 1-3 1906 (1867-1894):** এ গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডের আগ পর্যন্ত কার্ল মার্ক্স শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনার উদ্যোগ নেননি। মূলত ডাস ক্যাপিটাল আধুনিক যুগের স্থানচ্যুতকরণকে একটি একক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত করে: শিল্প-ভিত্তিক পুঁজিবাদের বিকাশ ও সম্প্রসারণ। মার্ক্স তত্ত্ব দেন, শ্রেণীবিভক্ত সমাজ হচ্ছে ঐতিহাসিক বিকাশের সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিকতার উৎপাদ। আগে মানব সমাজে শ্রেণীব্যবস্থা ছিল না। আদি সাম্যবাদ সমাজ ব্যবস্থায় যে সম্পত্তি ছিল সমাজের সবাই যৌথ ভাবে তার মালিক ছিল। ক্রমান্বয়ে শ্রম বিভাজনের বিস্তার ঘটে এবং তা থেকে সৃষ্ট সম্পদ ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হয়। উদ্বৃত্ত উৎপাদনের সৃষ্টি এ প্রক্রিয়ায় জড়িত। উদ্বৃত্ত উৎপাদন একটি সংখ্যালঘু অনুৎপাদক গোষ্ঠী দ্বারা আত্মসাৎকৃত হয় যারা সংখ্যাগুরু উৎপাদনকারীদের সঙ্গে শোষণমূলক সম্পর্ক বজায় রাখে। মার্ক্স ব্যাখ্যা দেন, সব ইতিহাসই হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। শ্রেণীসমূহ শুধুমাত্র শোষক ও শোষিতের সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ নয় বরং দমনকারী ও দমিতের সম্পর্কেরও বহিঃপ্রকাশ।

মার্ক্স তাঁর ডাস ক্যাপিটাল গ্রন্থে ব্যাখ্যা দেন, শ্রমবিভাজনে আয়ের উৎস দিয়ে শ্রেণী বোঝালে চলবে না, যা শ্রেণীর বহুত্ব এনে দিয়েছে। এ গ্রন্থেই মার্ক যুক্তি দেন, সমাজে দুটি শ্রেণী বিরাজ করে। একটি শ্রেণী উৎপাদনের উপায়ের মালিক এবং অপর শ্রেণীটি শ্রম প্রদানের মানুষ। উৎপাদনের উপায় ও শ্রম মিলে গঠিত হয় উৎপাদিকা বল। আর উৎপাদন পদ্ধতি বলতে মার্ক্স বুঝিয়েছেন, উৎপাদনকে ঘিরে যে সামাজিক সম্পর্ক তার সঙ্গে উৎপাদিকা শক্তি মিলিয়ে একটি সমগ্র ব্যবস্থাকে। ডাস ক্যাপিটাল গ্রন্থে মার্ক্স আরও দেখান, শোষণভিত্তিক সমাজে শক্তিশালী শ্রেণী দুর্বল শ্রেণীকে শোষণ করে। আর শোষণ করা হয় মূলত মানুষের শ্রমকে। উৎপাদক তাঁর উৎপন্ন দ্রব্য হতে নিয়ন্ত্রণ হারান এবং এটি আর তার দখলে থাকে না। পুঁজিবাদী সমাজে এ মুনাফা লাভ আকারে দেখা হয়। মুনাফা হচ্ছে শ্রমিকের মজুরি শোষণ। শ্রমিক যে উদ্বৃত্ত শ্রম দেয় সেটিই পুঁজিপতির সম্পদের উৎস।

L. **Karl Marx; Critique of Hegel's Philosophy of Right (1843):** ক্রিটিক অব হেগেল'স ফিলসফি অফ রাইট-এ (১৮৪৩) মার্ক্স ব্যাখ্যা করেন, ধর্ম হচ্ছে অধিপতি শ্রেণীর মতাদর্শের উৎপাদ। ধর্ম শাসক শ্রেণীর আধিপত্যকে বৈধতা ও স্বাভাবিকত্ব দান করে এবং নির্যাতিত মানুষজনের বৈপ্লবিক সম্ভাবনাকে নষ্ট করে। স্বর্গে যাওয়ার আশা-ভরসা প্রদানের মাধ্যমে ধর্ম ইহজগতের নিপীড়নকে মেনে নেয়ার আহবান জানায়। ধর্ম সংক্রান্ত এ ভাবনাগুলো মার্ক্স ও এঙ্গেলসের দর্শন ও রাজনৈতিক ভাবনায় একটি কেন্দ্রীয় তত্ত্ব হিসেবে কাজ করে।

ক্রিটিক অব হেগেল'স ফিলসফি অফ রাইট-এর (১৮৪৩) ভূমিকায় মার্ক্স লেখেন, প্রয়োজন হচ্ছে সেই মনুষ্য অবস্থা এবং সম্পর্কাদির বিশ্লেষণ যেটি এটিকে মানবজাতির জন্য অপরিহার্য করে তোলে। মার্ক্স বলেন, ধর্ম হচ্ছে মানুষের খুঁতপূর্ণ আত্ম-উপলব্ধির একটি বহিঃপ্রকাশ। এ মানুষটি বিমূর্ত ব্যক্তি-রূপী মানুষ নয় বরং সামাজিক মানুষ অর্থ্যাৎ যূথবদ্ধ অর্থে মানব সমষ্টি। এটি মানুষের অস্তিত্বের বিকৃতরূপ, কারণ খোদ সমাজ হচ্ছে বিকৃত। ধর্ম সম্পর্কে মার্ক্সের কালজয়ী কথা হচ্ছে, একটি মায়া-মমতাহীন জগতের মায়া-মমতার কেন্দ্রে অবস্থান করে ধর্ম। ধর্ম হচ্ছে নিপীড়িত জনগণের আফিম কিংবা যন্ত্রণা-নিবারক। সত্যিকার সুখ অর্জন করতে হলে মানুষের এমন ধরনের জীবনযাপন পরিহার করতে হবে যেটি ধর্মের মত নকল জিনিসের প্রতি উন্মাদনা তৈরি করে (আহমেদ; চৌধুরী, ২০০৩)।

M. Kvj gv·; dv‡Ý †kYx msMvg, 1848-1850 (1850) : গবেষণায় কার্ল মার্ক্স ফরাসী কৃষকদের পরিচয় তুলে ধরেছেন। মার্ক্সের দেয়া এ পরিচয়টি কেবলমাত্র ফরাসী কৃষকদের জন্য নয় বরঞ্চ গবেষণাধীন গণকটুলীর অন্ত্যজদের জীবনের সঙ্গেও মিলে যায়। নিম্নে মার্ক্সের লেখা থেকে হুবুহু তুলে ধরা হল।

'সেই স্থূল, ধূর্ত, পাষন্ড বাতুল, মূঢ় মহীয়ান, এক সুচিন্তিত কুসংস্কার, এক করুন প্রহসন, সুচতুর নির্বোধ এক কালবিরোধিতা, এক বিশ্ব ঐতিহাসিক ভাঁড়ামি এবং সভ্যমানুষের পক্ষে পাঠোদ্ধারের অসাধ্য এক দুর্বোধ্য সাংকেতিক লিপি–এই ছবিতে সংশয়াতীত পরিচয় রয়েছে সেই শ্রেণীর, যে সভ্যতার মধ্যে বর্বরতার প্রতিনিধি (মার্ক্স, ১৯৭১ খ: ১৬৭)।'

N. **Emile Durkheim; The Elementary Forms of the Religious Life (1912):** এ বইটিতে ডুর্খেইম ব্যাখ্যা দেন যে, ধর্মীয় বিশ্বাস হচ্ছে এক অর্থে সমাজেরই রূপক। সামাজিক ভাবেই ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে যা সামাজিক সংহতি প্রকাশ করে। মূলত তিনি ধর্মকে একটি পবিত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং ধর্মের মূলে যে জ্ঞানতাত্তিক বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেন। ডুর্খেইম বিশ্বাস করতেন ধর্মের মত একটি পবিত্র প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি কোন ভাবেই মায়া, বিভ্রম, বিভ্রান্তি ইত্যাদি হতে পারে না। The Elementary Forms of the Religious Life (1912) বইটিতে ডুর্খেইম ধর্মীয় ভাবনা এবং ধর্মীয় চর্চার ধরন যেসব কারণ সমূহের উপর নির্ভর করে সেগুলো বোঝাার বিষয়ে ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে আমাদের ধর্মের সবচেয়ে প্রাচীন ও সহজ আকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। যেহেতু তিনি ধর্মের উৎপত্তির ব্যাপারে মনোযোগী ছিলেন তাই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিবর্তনবাদী। ধর্মের বিষয়ে তিনি আরও বলেন, নিজ নিজ ঢঙে প্রতিটি ধর্মই সত্য। প্রতিটিই মানব অস্তিত্বের প্রদত্ত দশার ব্যাখ্যা হাজির করে। এমন কোন ধর্ম নেই যেটি মিথ্যা। কোন ধর্মই অপরাপর ধর্ম হতে কম সম্মানজনক নয়। সেগুলো একই চাহিদায় সাড়া দেয়, একই ভূমিকা পালন করে, সেগুলোর পেছনে একই কারণ রয়েছে (আহমেদ; চৌধুরী, ২০০৩)।

O. **Ken Morrison; Marx, Durkheim, Weber: Formations of Modern Social Thought (1995):** এ বইটি থেকে মূলত ম্যাক্স ওয়েবারের শ্রেণী সম্পর্কিত ভাবনা-চিন্তা গ্রহণ করা

হয়েছে। ওয়েবার তাঁর Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology (1922) গ্রন্থে শ্রেণী সম্পর্কিত ধারণা দেন এবং ব্যাখ্যা করেন যে, মার্ক্সের ব্যাখ্যায় কী নেই। প্রথমত, তিনি শ্রেণীর ধারণাকে মর্যাদা ও দল থেকে পৃথক করেন। দ্বিতীয়ত, তিনি শ্রেণীর একটি বহুত্ববাদী ধারণার জন্ম দেন। এ সূত্রে তিনি মালিকানা শ্রেণী ও সংগ্রহ শ্রেণীর উপর স্বাতন্ত্র টানেন। ওয়েবার তাঁর ব্যাখ্যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নানা ধরন রয়েছে বলে যুক্তি তুলে ধরেন। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী শ্রেণী সবসময়ই বাজার স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত। শ্রেণী একটি বস্তু নিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্য যা মানুষের জীবনযাপন ও সুযোগকে প্রভাবিত করে। মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে সচেতন শ্রেণী এবং অসচেতন শ্রেণী বলতে যা বোঝায় তার মধ্যেও ওয়েবার একটি ভেদরেখা টানেন। তাছাড়া যে সব মার্ক্সবাদীর ভাবনায় শ্রেণী ও শ্রেণী সম্পর্কিত ধারণার মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে বলে উল্লেখ পাওয়া যায় তাদের কাজকে ওয়েবার কপট বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড বলে অভিহিত করেন। মার্ক্সের অবস্থান থেকে ওয়েবার বিপরীত অবস্থান নিয়েছেন এই বলে যে, ক্ষমতাকে অর্থনৈতিক আধিপত্যের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা যাবে না। ওয়েবারের কাছে শ্রেণী, মর্যাদাগোষ্ঠী, রাজনৈতিক দল সবগুলোই ক্ষমতা বণ্টনের প্রপঞ্চ।

P. **Antonio Gramsci; Selection from the Prison Notebooks (1971):** জেলখানায় অবস্থানকালে আন্তোনিও গ্রামসির ইতালির সমাজ, রাজনীতি, শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন প্রসঙ্গে ডায়েরিতে লিখতে থাকেন। জেলখানায় তাঁর লেখালেখির একাংশ ইংরেজিতে Selections from the Prison Notebooks (1971) নামে বের হয়, যে লেখাগুলো জেলখানার সেন্সরশীপের কঠোর বাধার সম্মুখীন হয়ে তাঁকে লিখতে হয়। গ্রামসির যুক্ত হচ্ছে, বুর্জোয়ারা হেজেমনিক ভাবেও শাসন করে। গ্রামসির বিবেচনায় একটি সমাজের বলপ্রয়োগকারী ক্ষমতার উৎস হল রাষ্ট্র এবং সিভিল সমাজ হচ্ছে হেজেমনিক নেতৃত্বের পরিসর। গ্রামসির প্রিজন নোটবুকে তিনটি স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত মডেল রয়েছে বলে পেরী অ্যান্ডরসন লিখিত ১৯৭৭ সালের একটা প্রবন্ধ থেকে বোকক যুক্তি উদ্ধৃত করেন। সাবলটার্ন শব্দটিরও প্রথম প্রয়োগ পাওয়া যায় গ্রামসির রচনাতে। এখানে গ্রামসি হেজেমনি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেন যে, হেজেমনি বলতে বোঝায় নীতিনৈতিক ও দার্শনিক নেতৃত্ব। নেতৃত্ব যা অর্জিত হয় সমাজের বৃহৎ গোষ্ঠীর সক্রিয় সম্মতির মধ্য দিয়ে। কিভাবে অতীতে ও বর্তমানে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ সংগঠিত হয়েছিল অথবা সংগঠিত হবার পথে শামিল হয়েছিল তা বর্ণনা ও বিশ্লেষণের লক্ষ্যে গ্রামসি হেজেমনির ধারণা ব্যবহার করেন।

Q. **Bernards Cohn; India: The Social Anthropology of a Civilization (1971):** বার্নাড কোহন তাঁর India: The Social Anthropology of a Civilization (1971) বইটিতে ভারতের জাতিবর্ণ নিয়ে প্রথাগত ধারার বাইরে আলোচনা করেন। তিনি মূলত ভারতের সমাজকাঠামো ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জাতিবর্ণকে প্রোথিত করে দেখেন। ফলে জাতিবর্ণের অর্থ তৈরি হয়েছে জ্ঞাতিসম্পর্কীয় ব্যবস্থা হিসেবে, সাংস্কৃতিক ও পেশাগত বর্গ হিসেবে, রাজনৈতিক ও পেশাগত সংঘ হিসেবে। কোহনের মতে, জাতিবর্ণ ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় একটা স্মারক বিশেষ। জাতিবর্ণ ব্যবস্থা কি সেটার সাধারণ কোন একক সংজ্ঞা নেই। জাতিবর্ণ ব্যবস্থা কতগুলো জন্ম নির্ধারিত গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত। কোন এক গোষ্ঠীতে সদস্যপদ বেশ কিছু আচরণ, আকাঙ্খা, দ্বায়িত্ব নির্ধারণ করে এবং নির্দিষ্ট কিছু মর্যাদাপ্রাপ্তি এবং সামাজিক ক্রিয়াকর্মও নির্ধারণ করে। এ ব্যবস্থায় মর্যাদা আরোপিত ও অপরিবর্তনীয়। পুরো ব্যবস্থাটি স্তরবিন্যস্ত, একটার সঙ্গে আরেকটার উচ্চ-নীচ ভেদ আছে। গোষ্ঠীগুলো অন্তঃবৈবাহিক। অর্থ্যাৎ বিয়ে হয় নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে। জাতিবর্ণের সঙ্গে শুচি-অশুচির মূল্যবোধ সম্পর্কিত ধারণা সম্পর্কিত। উল্লেখ্য, ভারতে জাতি ব্যবস্থার উপর প্রথম আলোচনা শুরু করেন ঔপনিবেশিক যুগের পশ্চিমী পর্যবেক্ষকরা। মূলত ধর্মগ্রন্থের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় সমাজকে তারা বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে শুধুমাত্র ধর্মের শক্তিই জাতিগুলোকে পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ করে এক বিরাট বৃত্তের মধ্যে ধরে রাখে বলে তারা ধারণা করেছিলেন। পরবর্তীকালে যখন অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি চালু হল, তখনও কিন্তু এ পুঁথিগত জ্ঞানকে বাস্তব অবস্থার উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা হল। খোলা মন নিয়ে বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস দেখা গেল না। ফলে শুধু ধর্মীয় বিভাজনের রূপরেখাগুলোই দেখা গেল। নৃতাত্ত্বিক বারনার্ড কোহন (১৯৮৬) যাকে সমালোচনা করে বলেন পৃথকীকরণ তত্ত্ব। একাধিক জাতিবর্ণের সদস্যরা পরস্পর সমান জাত বলে পরিচিত- এ প্রেক্ষিতে কোহন জাতিবর্ণকে সাংস্কৃতিক বর্গ বলেও উল্লেখ করেন।

R. **Louis Dumont; Homo Hierarchicus: The Caste System and It's Implications, 2nd edn (revised) (1970):** জাতিবর্ণ হচ্ছে ভারতীয় সমাজের একত্রকারী প্রতিষ্ঠান বলে অত্যন্ত জোরালো তত্ত্ব দান করেন লুই দুমোঁ। তিনি তাঁর বিতর্কিত Homo Hierarchicus (1980) গ্রন্থে বলেন, শুচি/অশুচির ধর্মীয় চেতনায়ই ভারতীয় সমাজের ধর্মীয় গঠনকে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সমাজ কাঠামোর মূল বৈশিষ্ট্য হল ক্রমোচ্চ বিন্যাস, যেখানে শুচি/অশুচির মানদন্ডে প্রতিটি জাতির

পদমর্যাদা নির্দিষ্ট হয়। এক সার্বজনীন ধর্মের শক্তি জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে সমগ্র সমাজটিকে একত্রে ধরে রাখে। ধর্মের ভাবগত শক্তির কাছে যাবতীয় ঐহিক ক্ষমতা এখানে পরাভূত হয়। উল্লেখ্য, নৃবিজ্ঞানে দুমোঁর Homo Hierarchicus (1970) ভারতের গ্রাম অধ্যায়ন যুগের (১৯৫০-১৯৭০) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক কাজ হিসেবে বিবেচিত। বইটিতে দুমোঁ ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থার একটি কাঠামোবাদী বিশ্লেষণ দাঁড় করান। Homo Hierarchicus এর কেন্দ্রীয় যুক্তি হল, ভারত হচ্ছে একটি অনৈতিহাসিক, পূর্ণাঙ্গ, স্তরায়িত, ধর্মীয় সমাজ : এটি হচ্ছে আধুনিক পশ্চিমা সমাজের বিপরীত যেটি কিনা ঐতিহাসিক, ব্যক্তিবাদী, সমতাভিত্তিক ও সেক্যুলার। সে অর্থে ভারত প্রতিনিধিত্ব করে Homo Hierarchicus, পক্ষান্তরে পশ্চিমা সমাজ প্রতিনিধিত্ব করে Homo Equalis.

S. **Michel Foucault; The History of Sexuality (1976):** আধুনিকতার অসম্পূর্ণতা, তার দূরন্ত অবক্ষয়, উপনিবেশোত্তর সময়ে এক বিচিত্র তরঙ্গ তৈরি করে চলেছে। বর্তমানে আমরা এমন এক উত্তর মানবতাবাদী জগতে বসবাস করছি যে উপনিবেশোত্তর, রেনেসাঁস উত্তর চেনা জগৎকে অচেনা বলে মনে হয়। তাই এর তাৎপর্য বোঝার জন্য দরকার চিন্তার নতুন উপকরণ। ফুকো যখন বর্তমান সত্তাতত্ত্বের কথা জানান কিংবা প্রতাপের ছায়ায় বন্দীশালা, চিকিৎসালয়, যৌনতা, নৈতিকতা ও সাহিত্যের পাঠকৃতিকে লালিত হতে দেখেন তখন আমরাও যেন নতুন চোখে আমাদের জগৎকে দেখতে শিখি। প্রশ্ন ওঠে, আমরা আসলে কারা কিংবা কোথা থেকে এসেছি। মূলত যৌনতার ইতিহাস লিখতে গিয়ে ফুকো যৌনতাকে পুরোপুরি বিনির্মাণ করেছেন। ফুকোর তিনখণ্ডে বিবৃত যৌনতার ইতিহাস কেবলমাত্র যৌনতার ইতিহাস নয়। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রতাপের রাজনীতি, আত্মার মায়া, ভাবাদর্শের বাস্তবতা ইত্যাদি বিষয়। শারীরিক অস্তিত্বকে ঘিরে দমন ও মুক্তি কিভাবে কল্পনার ছায়া ছড়িয়ে দেয় সেখান থেকে ফুকো পৌছে গেছেন গ্রিস ও রোমের ইতিহাসে। দেখতে চেয়েছেন যৌন নৈতিকতার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। যৌনতার ইতিহাস লিখতে যেয়ে ফুকো যেমন একদিকে ইতিহাসের সহায়তা নিয়েছেন তেমনি বিবাহ প্রথার প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্রের উপরও আলোচনা করেছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শৃঙ্খলা, নৈতিক প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যচিন্তা ইত্যাদি বিষয়। ইতিহাস থেকে অর্জিত নৈতিক চিন্তাকে সমকামিতা, যৌনতা ইত্যাদি নানা কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন তিনি। এক্ষেত্রে গ্রীক সমাজ নিয়েও আলোকপাত করেন তিনি। যৌন আচরণের উপর কেমন করে প্রতাপের ছায়া

বিদ্যমান এবং মানব মনের মধ্যে কেমন করে তা প্রভাব বিস্তার করে তাও দেখেন ফুকো (ভট্টাচার্য, ১৯৯৭)। যৌনতা কিভাবে জ্ঞানের উৎস, কিশোরদের সঙ্গে সমকামী যৌনতা, স্ত্রী, সন্তান, ভৃত্য প্রভৃতির সঙ্গে যৌন আচরণ, যৌনতার সঙ্গে চিকিৎসাবিদ্যা ও খাদ্যতত্ত্ব ইত্যাদি সবকিছু নিয়েই তিনি আলোচনা করেন। যদিও নারীবাদী সমালোচকরা বলেছেন-ফুকো পিতৃতান্ত্রিক প্রতাপের শৃঙ্খলায় প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন। তবে ফুকোই আমাদের শিখিয়েছেন- যৌনতার ইতিহাস আসলে সামাজিক প্রতাপেরই ইতিহাস। সংবিধানে সকলের সমান অধিকারের কথা থাকলেও অন্ত্যজরা যখন প্রতাপের ছায়ায় অধিকার বঞ্চিত হয় তখন বারবার ফুকোর একটি কথাই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, 'Everything is Fake'.

T. **Michel Foucault; Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings (1972-1977):** ফুকোর প্রবাদপ্রতিম কথা হচ্ছে, প্রতাপ সর্বত্র বিদ্যমান। মূলত মার্ক্সীয় পরিমন্ডলে শাসক শ্রেণী ও আধিপত্যবাদ বিষয়ক আলোচনা সুবিদিত। ফুকো এ ধারা থেকে স্বতন্ত্র পথে ব্যাখ্যা দেন। রাজনৈতিক অর্থনীতির সূক্ষাতিসূক্ষ বয়ন ফুকোর চিন্তায় নিতান্ত গৌণ স্থান দখল করে নিয়েছে। সমাজ সংস্কারের গভীরে ফুকো প্রতাপের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। তিনি লক্ষ্য করেন, প্রতাপের কৌশল ও পরিণতি। একদিকে ফুকো জ্ঞানের সঙ্গে প্রতাপের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন অন্যদিকে বন্দীশালায়, মানসিক চিকিৎসালয়ে এর বিচিত্র জটিল অভিব্যক্তি পর্যবেক্ষণ করেন। ফুকোই তুলে ধরেন, প্রতাপ কিভাবে সামাজিক মান্যতা পেয়ে গেল তা স্পষ্ট নয়। তিনি আমাদের শরীরের তন্ত্রে পর্যন্ত প্রতাপের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করেছেন। ফুকো বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির প্রতাপ প্রকাশের ধরন বুঝিয়ে দেন। ফুকোর আরেকটি যুগান্তকারী কথা হল, প্রতাপের রণকৌশলই প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের উৎপাদক। সত্য ও স্বাধীনতার অভিব্যক্তি হিসেবে সাধারণত বুদ্ধিজীবীরা জ্ঞানকে পরম সত্তা বলে বিবেচনা করেছেন এবং প্রতাপের অভিব্যক্তির সঙ্গে তার কার্যত পারাপারহীন ব্যবধানের কথা বলেন। ফুকো দেখিয়েছেন, বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় বিকশিত জ্ঞানকে কোনভাবেই প্রতাপের অভিব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না। তাছাড়া প্রতাপ যখন থেকে নতুন নতুন কৌশল নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেছে তখন থেকেই বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখা বিকশিত হয়েছে। জয় গোস্বামীর কবিতার ভাষায়, ‘আমরা যা করি ব্রক্ষ তাই, আজ ব্রক্ষ তাই, আজ ব্রক্ষ তাই।’ বর্তমান জীবনে বিজ্ঞান প্রতাপের হাতের পুতুল মাত্র। আবার বিজ্ঞানই প্রতাপের অভিব্যক্তি এবং সত্য উৎপাদন করে এর স্থায়িত্বকে নিশ্চিত

করে। ফুকো জানান, প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান প্রতাপে পরিণত হয়। নিৎসের উল্লেখ করে ফুকো আরও বলেন, সত্য কাকে বলে-তা না খুঁজে আমরা বরং ভেবে দেখতে পারি, আমাদের সমাজে সত্যকে কেন এমন সার্বভৌম মূল্য দেয়া হল যেন আমরা সবাই এর ছত্রছায়ায় এসে যেতে বাধ্য হয়েছি (ভট্টাচার্য, ১৯৯৭)! ফুকো ব্যাখ্যা দেন, প্রতাপই জ্ঞানের উৎপাদক ও নিয়ন্তা। জ্ঞান প্রতাপের পোষকতা করে বলেই শুধু প্রতাপ নানা ভাবে জ্ঞানকে বিকশিত হতে দেয়-এমন নয়। জ্ঞান ও প্রতাপ প্রত্যক্ষভাবে পরস্পরকে দ্যোতিত করে এবং এমন কোন প্রতাপ-সম্পর্ক সমাজে হতেই পারে না যা সংশ্লিষ্ট জ্ঞান-প্রস্থানকে সংগঠিত করে না। প্রতাপের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করে ফুকো মূলত প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের রাজনৈতিক ও কৌশলী চরিত্র উদ্ঘাটন করেন। প্রতাপের বিভিন্ন ব্যাখ্যায় ফুকো দেখিয়েছেন, সমাজের চিহ্নায়কগুলো যখন প্রতাপের শৃঙ্খলে রূপান্তরিত হয় ব্যক্তিসত্তা তা থেকে বিযুক্ত থাকতে পারে না। তার চেতনা ও অবচেতনা জুড়ে জেগে থাকে শুধু শৃঙ্খলের ছায়া। জ্ঞানের পরম্পরাও এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে পড়ে।

U. **Clifford Geertz; The Interpretation of Cultures (1973):** The Interpretation of Cultures (1973) বইয়ে ক্লিফোর্ড গিয়াটজ Thick Description নিয়ে আলোচনা করেন। প্রতীকবাদের প্রেক্ষাপটে গিয়াটর্জ এথনোগ্রাফী রচনায় Thick Description বা নিবিড় বর্ণনার উল্লেখ করে বলেন, একটি সমাজের নিগূঢ় বর্ণনার মধ্য দিয়ে ঐ সমাজের বৈশিষ্ট্য নিখুঁতভাবে ধরে রাখা সম্ভব যা পরবর্তীকালে অন্য গবেষকের লিখনীতেও পুনঃযাচাই করার ক্ষেত্রে সহায়ক। এথনোগ্রাফীকে উপন্যাস বা উপাখ্যান হিসেবে পাঠ করার প্রয়োজন রয়েছে। এবং ঐ উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাপুঞ্জের মধ্য দিয়েই পাঠক পরিবর্তিত সমাজটির পরিবর্তনশীলতাকে যথাযথভাবে অনুধাবনে সক্ষম। গিয়ার্টস ব্যাখ্যা করেন, নৃবিজ্ঞানী কোন কিছুর চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে পারেন। বিশদ বর্ণনা দেয়ার প্রয়োজন হয় বিশেষ কোন সমাজের ঘটনাকে এবং সেই সঙ্গে মূলত সংস্কৃতিকে একেবারে তুলে ধরার জন্যে। এ কাজটি করতে হবে Native Point of View থেকে। উল্লেখ্য নৃবিজ্ঞানে প্রচলিত এটিক ও এমিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে গিয়ার্টস এমিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী ছিলেন। গিয়ার্টস মনে করেন কোন সমাজে গিয়ে নৃবিজ্ঞানী সব বুঝে ফেলবেন এমন চিন্তা না করে বরং সেই সমাজের সংস্কৃতিকে উপস্থাপনের চেষ্টা করা উচিৎ। নৃবিজ্ঞান হবে Interpretative Anthropology অর্থাৎ ব্যাখ্যামূলক নৃবিজ্ঞান। Native Point of View বলতে যে সমাজের ওপর

গবেষক কাজ করেছেন সে সমাজের নিজস্ব যে মূল্যায়ন, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি রয়েছে সেগুলোকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতেই উপস্থাপন করা।

V. **Mary Douglas; Purity and Danger (1966):** মেরী ডগলাসের কেন্দ্রিয় বিষয় ছিল নোংরা, ময়লা বা অশুচি। তিনি সবকিছু ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন কাঠামোবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে প্রত্যয়গত অবস্থান থেকে। মেরী ডগলাসের দূষণবোধ ও নৈতিকতা থেকে সৃষ্ট নৈতিক ভুবনবোধের ব্যাখ্যায় বেরিয়ে এসেছে আদিম ও আধুনিক সমাজের বাস্তবতা। মেরী ডগলাস ব্যাখ্যা করেন, নোংরাবোধটি একটি সার্বজনীন অর্থবহন করে। নোংরা বলে একটি বস্তুকে বা বিষয়কে নির্দেশ করা হয় তখনই যখন ঐ বিষয়ের স্থান-চ্যুতি ঘটে। আদিম সমাজে নোংরাবোধের মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে নৈতিকতা, নৈতিকতা থেকে তৈরি হচ্ছে নৈতিক ভুবন। এ নৈতিক ভুবন গড়ে উঠার মধ্য দিয়ে একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হচ্ছে। নোংরা হলে পরম বা ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না। নোংরাকে শুদ্ধির মাধ্যমে ফিরিয়ে আনতে হবে। আদিম সমাজে নোংরা বোধের বিপরীতে পরম বা ঈশ্বরের বোধ তৈরি হচ্ছে। এজন্য নোংরা হল ম্যাজিক, শামান এসবের মাধ্যমে সর্বজনীন একটি রিচ্যুয়ালের দ্বারা শুদ্ধকরণের প্রক্রিয়া যা ঐ সমাজে বিদ্যমান থাকে। আবার দূষণবোধ আধুনিক সমাজে বসবাসরত মানুষের স্বাস্থ্যগতবোধ। দূষণ আজকের পৃথিবীতে একটি বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও তা সার্বজনীন নয়। কারণ দূষণবোধের অবস্থান মতাদর্শ। মতাদর্শগত কারণে দূষণ নোংরাবোধের ন্যায় কোন একক এবং সংহত প্রতীক নির্মাণে ব্যর্থ হচ্ছে। এর ফলাফলে মতাদর্শগত সমাজে বোধের ভিন্নতা বিদ্যমান। এ বোধগুলো সব সমাজে একই অর্থ বহন করে না। এ বোধগুলো যখন প্রতীক তৈরি করে দেয় তখন আর তা নষ্ট করা যায় না। এ প্রতীকগুলো তৈরি করছে সংস্কৃতি।

W. **Victor Turner; The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual (1967):** নর্দান রোডেশিয়ার ন ডেম্বু সমাজের উপর করা ভিক্টর টার্নারের কাজটিও আমি আমার গবেষণার শুচি-অশুচি বিষয়টি দেখার সময় মাথায় রেখেছি। এ ক্ষেত্রে ন ডেম্বু সমাজের জীবনের আচার বোঝাতে ভিক্টর টার্নার প্রতীক হিসেবে লাল, সাদা ও কালো তিনটি রংয়ের ব্যবহার দেখান। এ তিনটি রংয়ের প্রতীক দিয়ে তিনটি নদীকে বোঝানো হয়। এ নদীগুলো দেবতার ক্ষমতার প্রবাহকে ইঙ্গীত করে। এখানে সাদা রংয়ের নদী দিয়ে শুচি, স্বাস্থ্য, ক্ষমতা, জীবন, বৈধতা ইত্যাদি বোঝানো হয়, লাল রংয়ের নদী

দিয়ে ভিন্ন রকমের রক্ত বোঝানো হয়। যা ভাল রক্ত এবং খারাপ রক্ত দুটোরই প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কালো রংয়ের নদী দিয়ে প্রেতাত্মা, ডাইনী, রোগ-বালাই ইত্যাদিকে ইঙ্গীত করা হয়। কালো রং দিয়ে মৃত্যু ও অশুচিতাকেও ইঙ্গীত করা হয়। মূলত, লাল ও সাদা রং জীবনের প্রতীক। অপরদিকে কালো রং মৃত্যুর প্রতীক।

X. **Victor Turner; The Ritual Process: Structure and Anti-Structure (1966):** ভিক্টর টার্নার তাঁর The Ritual Process: Structure and Anti-Structure (1966) বইয়ে প্রতীক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি মনে করতেন সমাজ কাঠামোর মধ্যে কেন্দ্রীয় ক্রিয়াশীল বিষয় হচ্ছে অভিজ্ঞতা যা প্রতীকরূপে অবস্থান করে। সামাজিক সচলতায় এ প্রতীকের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তিনি রূপক নিয়ে আলোচনা করেন। টার্নার মনে করেন, মানব মনের এ রূপকের জন্ম হয় একটি আলো-আধাঁরি অবস্থান থেকে। তিনি এর নাম দেন Liminality. টার্নার বিশ্বাস করতেন সামাজিক সচলতায় বিভিন্ন ঘটনার মূলে অবস্থান করে এ Liminality. তবে সমাজে এ রূপকের কারণ স্পষ্ট নয় কারণ সমাজের সব ঘটনা রূপকে পরিণত হয় না। কিছু ঘটনা বিশেষ কিছু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রূপকে পরিণত হয়। এ কারণে বলা হয়ে থাকে Liminality কে ব্যাখ্যা করা যায় না। এটি এক ধরনের অস্পষ্টতা কিংবা ধোঁয়াটে, ব্যাখ্যাহীন, অস্পষ্ট বিষয়। এ কারণে সমাজের সব ঘটনাকে একই মাপকাঠিতে বিচার করা যাবে এমন কোন কথা নেই। সমাজকে বুঝতে হলে সমাজের ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ এ ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনাবলীই কিছু আচারের মধ্য দিয়ে রূপকে পরিণত হয়।

Y. **Edward W. Said; Orientalism (1978):** সাহিত্য সমালোচক ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ প্রাচ্যবাদ ধারণার জন্ম দেন। তাঁর রচিত ওরিয়েন্টালিজম অত্যন্ত বিখ্যাত গ্রন্থ। তাঁর মতে, ঔপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের আওতায় রেখে তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বকে শোষণ ও রাজনৈতিক ক্ষমতার আধিপত্য বিস্তারের জন্য প্রাচ্য, তৃতীয়বিশ্ব এ ধরনের প্রত্যয়গুলো সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ যা পূর্বদেশীয় নয় তাই উন্নত বা পশ্চিমা। সাঈদের মতে, এ ধরনের প্রত্যয় নির্মাণ পাশ্চাত্য সমাজের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সৃষ্ট। তাছাড়া পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ অনুসারে তথাকথিত সহজ-সরল সমাজ সম্পর্কে রচিত লেখনীতে উন্নত দেশের নৃবিজ্ঞানীরা উন্নাসিকতার প্রভাব রেখেছেন। সাঈদ প্রশ্ন তুলেছেন, তথাকঠিত সহজ-সরল সমাজ অধ্যায়নে সামাজিক বৈশিষ্ট্যাদির

আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণে যে সূক্ষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন অনুভব করেছেন সে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে ইউরোপীয়ান সমাজের বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজগুলোকে বিবেচনা না করে সমষ্টিগত ভাবে একটি অভিন্ন ভাবমূর্তি গ্রহণের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।

Z. **Talal Asad; Genealogies of religion (1993):** খ্রিস্টীয় রিফর্মেশনের পরবর্তীকালে ধর্মের একটি মৌলিক রূপান্তর ঘটে। আগের স্বেচ্ছাচারী এবং সামাজিক ভাবে অবদমনমূলক ধর্ম পরিবর্তিত হয়ে তুলনামূলক নিরীহ ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। নতুন রূপে আর্বিভূত ধর্মকে প্রায়ই উদারনৈতিক রাজনীতি এবং বিশ্ব সংসারের প্রতি আধুনিকত্বের দৃষ্টি ব্যাখ্যা করতে বলা হয়। সেটিকে বৈধতা দিতেও আহবান জানানো হয়। রাজনীতিকৃত এ ধর্মকে যুক্তি ও মুক্তচর্চার প্রতি হুমকিস্বরূপ বলে তালাল আসাদ উল্লেখ করেন। Genealogies of religion (1993) বইটিতে তালাল আসাদ মূলত একটি ঐতিহাসিক বর্গ হিসেবে কিভাবে ধর্ম আর্বিভূত হল এবং সেটিকে কিভাবে একটি বিশ্বজনীন প্রত্যয় হিসেবে প্রয়োগ করা হয় তার ব্যাখ্যা দান করেন। তিনি বলেন, ধর্ম গঠনকারী উপাদান এবং সম্পর্ক সমূহ ঐতিহাসিক ভাবে নির্দিষ্ট। তাই ধর্মের কোন সর্বজনীন সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব নয়। উনবিংশ শতাব্দীর বিবর্তনবাদী ভাবনাচিন্তায় ধর্ম বিবেচিত হয়েছিল একটি আদি মনুষ্য দশা হিসেবে যা থেকে আধুনিক আইন, বিজ্ঞান, রাজনীতি ইত্যাদির জন্ম হয় এবং আলাদা হয়ে পড়ে। পরে এ ধারণা পরিবর্তিত হয়। আসাদ ব্যাখ্যা দেন, ধর্ম মানুষের অনুশীলন ও ও বিশ্বাসের একটি স্বতন্ত্র পরিসর যেটিকে অন্য কিছুতে সরলীকরণ করা সম্ভব নয়। ধর্মের একটি নিজস্ব নির্যাস রয়েছে যা ইতিহাসোর্ত্তীণ ও সংস্কৃতি উর্ত্তীণ। একে আইন, বিজ্ঞান কিংবা রাজনীতি কোন নির্যাসের সঙ্গেই গুলিয়ে ফেলা যাবে না।

_. Arnold van Gennep; The Rites of Passage (1960): মূলত The Rites of Passage বা অবস্থান্তরের আচার সম্পর্কে ধারণা দেন আরনল্ড ভ্যান গেনেপ। এখানে তিনি ব্যাখ্যা করেন যে মানুষের দৈহিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অবস্থানেরও পরিবর্তন ঘটে। এ পদটি ভ্যান গেনেপ তার Rites of Passage নামের বইয়ে ব্যবহার করেন। কোন ব্যক্তির একটি সামাজিক ধাপ থেকে আরেকটি সামাজিক ধাপে উপনীত হওয়াকে অবস্থান্তরের আচার বলে। এক্ষেত্রে ধর্মের একটি ভূমিকা আছে। কারণ ব্যক্তি ও সমাজকে সঙ্কটের মোকাবিলা করতে সহায়তা করাই ধর্মের অন্যতম প্রধান

কাজ। যখন কোন ব্যক্তি এক সামাজিক মর্যাদা হতে আরেক সামাজিক মর্যাদায় উপনীত হওয়ার মধ্যবর্তী অবস্থায় পৌছায় তখন প্রায় প্রতিটি সমাজে ধর্মীয় আচার পালিত হয়। যেমন : জন্ম, সাবালক হওয়া, বিয়ে, মৃত্যু ইত্যাদি। সাধারণত এ অবস্থানগত আচারের তিনটি পর্যায় থাকে। এগুলো হল, আলাদাকরণ পর্যায়, দোরগোড়া পর্যায় এবং পুনঃঅন্তর্ভুক্তিকরণ পর্যায়। আলাদাকরণ পর্যায়ে ব্যক্তিকে তার পুরনো মর্যাদা হতে আলাদা করা হয়। এ পর্বের আচার হচ্ছে ব্যক্তিত্বের প্রতীকী রূপ। যেমন : মাথা ন্যাড়া করা কিংবা পুরনো নাম বাতিল করা ইত্যাদি। দোরগোড়া পর্যায়ে ব্যক্তির অবস্থান হচ্ছে মধ্যবর্তী। অর্থ্যাৎ সে পুরনো পর্যায় অতিক্রম করেছে কিন্তু নতুনটাতে এখনো ঢুকেনি। এ পর্যায়ে অবশ্য অনেক সমাজে ব্যক্তিকে পবিত্র হিসেবে দেখা হয় কারণ মধ্যবর্তী অবস্থা ক্ষমতা ও বিপদের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে ভাবা হয়। তৃতীয় পর্যায়ে ব্যক্তিকে তার নতুন মর্যাদায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ পর্যায়ের আচার ও প্রতীক সাধারণত পুনর্জন্মের সঙ্গে সম্পর্কিত।

‘. **A Asaduzzaman; The Pariah People: An Ethnography of the Urban Sweepers In Bangladesh (2001):** The Pariah People গ্রন্থে লেখক ঢাকা শহরে বসবাসরত তেলেগু মেথরদের জীবনযাত্রা এবং সমাজের সাথে তাদের খাপ খাওয়ানোর ব্যাপারগুলো তুলে ধরেছেন। তাদের পরিচয়, পদ-মর্যাদা, মানসম্মান ইত্যাদি বিষয়গুলোতে জোর দেওয়া হয়েছে। তিনি তাঁর গবেষণাকে দুইভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগে তাদের সম্প্রদায়গত জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেখানে সামাজিক সংগঠন, পরিচয়, সামাজিক রীতিনীতি ও কার্যাবলীকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। উঠে এসেছে দলাদলি সামাজিক যোগাযোগ, আন্তঃশ্রেণীর মাঝে বিভিন্ন নিয়মরীতি, বিয়ের রীতিনীতি ইত্যাদি বিষয়। দ্বিতীয়ভাগে তাদের ধর্মীয় বিষয়গুলো এবং আচার অনুষ্ঠানের ক্রিয়াগুলো তুলে ধরা হয়েছে। তাদের বিশ্বাস, মূল্যবোধ, খ্রিষ্টান ধর্মে রূপান্তরিত হওয়ার প্রবণতা ইত্যাদি বিষয় আলোচনায় উঠে এসেছে। উল্লেখ্য, গবেষক তাঁর গবেষণায় মেথর শব্দের অর্থ নিয়ে ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। The Pariah People বইটি পড়ে আমি অন্ত্যজদের উপর কাজ করার অনুপ্রেরণা পাই। শিক্ষাজীবনে এ বইটিই মূলত গবেষনাকর্মে আমার উপর প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে। গণকটুলীতে মাঠকর্ম সম্পাদনের আগে আমি বইটি পড়েছি। পরে আমার গবেষনাকর্ম শুরু করি।

Dhaka University Institutional Repository

a. **F.G. Bailey; Caste and the Economic Frontier (1957):** এফ.জি বেইলী উড়িষ্যার পার্বত্য কৃষকদের নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁরা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অর্ন্তভুক্ত, বর্ণপ্রথায় বিভক্ত। তারা সামাজিক স্তরের বিভিন্ন ভাগের নিরিখে সমগ্র সমাজকে দেখে থাকেন। বইটিতে গবেষিত এলাকায় চার ধরনের অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে। গবেষকের গবেষিত এলাকা ছিল বিসিপাড়া গ্রাম। তিনি তাঁর গবেষিত গ্রামে ঝাড়ুদারদের ক্রমোস্তরায়নের শেষ বর্ণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিসিপাড়া গ্রামের অস্পৃশ্যতা কেমন করে এ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে এখনও বাংলাদেশে বিদ্যমান এবং সামাজিক সচলতায় তার অবস্থান কেমন বিষয়টি বুঝতে বইটি আমাকে সহায়তা করেছে। উড়িষ্যার পার্বত্য এলাকার মত শুচি-অশুচির প্রভাব এত তীব্র না হলেও অন্ত্যজদের বিষয়ে অশুচিতা এখনও আমাদের মনে বিদ্যমান।

b. †Rgm IqvBR, Gg.wW; cee‡½i wewfb RwZ, eY I †ckvi weeiY, wØZxq fvM : fwgKv, m¤úv‘bv I UxKvÑgbZvmxi gvgb (2000) : ঊনিশ শতকের সত্তর দশকে ঢাকার সিভিল সার্জন থাকাকালে জেমস ওয়াইজ (জেমস ফওনস্ নর্টন ওয়াইজ) এ বইটির উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু হল ঢাকা জেলা এবং এই জেলায় বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিসমূহ।

ওয়াইজের বইটির নাম ছিল নোট্স অন রেসেস, কাস্টস অ্যান্ড ট্রাইবস্ অফ ইস্টার্ন বেঙ্গল (১৮৮৩) বাংলা অনুবাদে যার নাম দেয়া হয়েছে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ। বইটি মূলত পাঁচ ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে মুহামেডান, দ্বিতীয় ভাগে রিলিজিয়াস সেক্টর অব দি হিন্দুজ, তৃতীয় ভাগে হিন্দু কাস্টস অ্যান্ড এবরেজিনাল রেসেস, চতুর্থ ভাগে আর্মেনিয়ানস্ ও পঞ্চম ভাগে পর্তুগিজ ইন ইস্টার্ন বেঙ্গল। ওয়াইজের লেখা মূল বইটি প্রকাশ হয়েছিল একশো বছরেরও আগে। ওয়াইজের রচনা সমসাময়িক তো বটেই, পরবর্তীকালেও অনেক নৃতাত্ত্বিক, সমাজ বিজ্ঞানী বা ঐতিহাসিককে প্রভাবিত করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াইজকে পূর্ববঙ্গের নৃতত্ত্বচর্চার পথিকৃৎ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

c. †kLi e‡›‘vcva¨vq I AwfwRr ‘vk¨ß m¤úvw‘Z; RwZ, eY I ev0vjx mgvR (1998) : জাতি বর্ণ ও বাঙালী সমাজ বইটি এ ধরনের গবেষণা রচনায় অত্যাবশ্যকীয়। বইটিতে মোট আটজন

গবেষক তাদের প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তারা হলেন হিতেশরঞ্জন সান্যাল, আন্দ্রে বেতেই, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, নির্মল কুমার বসু, শেখর বন্দোপাধ্যায়, শিনকিচি তানিগুচি, সুরজিৎ সিংহ, রনজিৎকুমার ভট্টাচার্য। এর মধ্যে বর্তমান গবেষণার জন্য এ বইয়ের ভূমিকাসহ মোট চারটি প্রবন্ধ সাহিত্য পর্যালোচনায় গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলো হল :

1. e½‡'‡k RwZ e¨e¯ : K‡qKwU cm½Ñwbgj Kgvi em
2. RwZ I wbge‡Mi †PZbvÑcv_ P‡Ævcva¨vq
3. c' ghv'v : gj¨vqb I µ‡gv"Pweb¨vmÑAv‡›' †e‡ZB
4. evsjvq RwZi DrcËÑwn‡Zk iÄb mvb¨vj|

1. e½‡'‡k RwZ e¨e¯v : K‡qKwU cm½Ñwbgj Kgvi em (GB ceÜwU wbgj Kgvi emi ômvg A¨vm‡c±m Ae Kv÷ Bb †e½jô ce‡Üi Abev'| ceÜwU ôg¨vb Bb BwÛqvô cwÎKvq cKwkZ n‡qwQj, Abev' K‡i‡Qb wkek¼i g‡Lvcva¨vq) : নির্মল কুমার বসু তার প্রবন্ধে দেখান, যে সমস্ত জাতির হাত থেকে ব্রাহ্মণরা জল গ্রহণ করেন না তার একটি তালিকা।

সে তালিকায় নাম পাওয়া যায় মুচি, ভূঁইমালী, ফুলমালী, রাজবংশী, ভড়, মাল, কোনাই, বাউরি, ডোম, কোরা সাঁওতাল ও জেলের। নাম অনুযায়ী কৌলিক বৃত্তিগুলো হল : মুচির কাজ চামড়া খালানো, পাকানো ও জুতা তৈরী; ভূঁইমালীর কাজ ঝাড়ু দেওয়া ও পরিষ্কার করা; ফুলমালীর কাজ বাগান করা ও পূজার ফুল যোগান করা; রাজবংশীর কাজ কৃষি শ্রমিক ও মাঝিমাল্লার কাজগুলি করা, ভড় সমাজে চিড়াপ্রস্তুতকারণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন; মাল, কোনাই, বাউরি তিনটি সম্প্রদায়ই কৃষি শ্রমিকের কাজ করেন; ডোম বাঁশের কাজ ও ঝুড়ি বানানো; কোরা সাঁওতাল মাটি কাটা, শ্রমিকের কাজ এবং জেলে মাছ ধরার কাজ করেন।

দেশের মোট জনসংখ্যার ৬৮ ভাগই সমাজের সেই অংশ যাদের হাত থেকে উচ্চ বর্ণের লোকেরা, যেমন : ব্রাহ্মণ, বৈদ্য জল গ্রহণ করেন না (বন্দোপাধ্যায়; দাশ গুপ্ত, ১৯৯৮)।

2. RwZ I wbge‡Mi †PZbvÑcv_ P‡Ævcva¨vq (GB ceÜwU cKwkZ nq iYwRr ¸n m¤úw‘Z **Subaltern Studies Vol. VI** M‡š, Abev‘ K‡i‡Qb †kLi e‡›‘¨vcva¨vq) : পার্থ চট্টোপাধ্যায় তার প্রবন্ধে লুই দুমোঁকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। বারনার্ড কোহনের পৃথকীকরণ তত্ত্বের পরিমার্জিত করে লুই দুমো তাঁর বিতর্কিত Homo Hierarchicus (1970) গ্রন্থে বলেন, শুচি/অশুচির ধর্মীয় চেতনায় ভারতীয় সমাজের ধর্মীয় গঠনকে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সমাজ কাঠামোর মূল বৈশিষ্ট্য হল ক্রমোচ্চ বিন্যাস, যেখানে শুচি/অশুচির মানদন্ডে প্রতিটি জাতির পদমর্যাদা নির্দিষ্ট হয়। এক সার্বজনীন ধর্মের শক্তি জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে সমগ্র সমাজটিকে একত্রে ধরে রাখে। ধর্মের অবগত শক্তির কাছে যাবতীয় ঐহিক ক্ষমতা এখানে পরাভূত হয়।

এ প্রবন্ধে আন্তোনিও গ্রামসির সাধারণ বোধ (Common Sense) নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। প্রিজন নোটবুকস্ এর নির্বাচিত অংশের তৃতীয় ভাগে যার নাম The Philosoply of Praxis- আন্তোনিও গ্রামসি সাধারণ বোধের (Common Sense) একটি চরিত্র নির্ধারণ করেছেন। সাধারণ শ্রমিক-জনতার মধ্যে সক্রিয় ব্যক্তি-ব্যবহারিক জীবিকায় নিয়োজিত। নিজের কাজকর্ম করবার জন্যই পৃথিবী তথা পরিপার্শ্ব বিষয়ে তাঁর সাধারণ ধারণা বা বোধ প্রয়োজন, যাকে তাঁর নিত্যকর্মেই নিয়ত পরিবর্তন করে থাকে। কিন্তু নিজের প্রত্যক্ষ কর্মধারা বিষয়ে কোনো স্পষ্ট তাত্ত্বিক চেতনা তাঁর থাকে না, বরং তাঁর তাত্ত্বিক চেতনা ঐতিহাসিকভাবে তাঁর কাজের বিরুদ্ধাচারী হতে পারে। এমন কি বলা যেতে পারে তাঁর দুটি তাত্ত্বিক চেতনা (অথবা একটি পরস্পর বিরোধী চেতনা) রয়েছে; একটি নিহিত থাকে তাঁর কাজের মধ্যে যা তাঁকে এ পার্থিব জগৎকে কার্যকরভাবে রূপান্তরণের কাজে অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে বাস্তবে একাত্ম করে; আর অন্যটি প্রকাশ পায় ভাসা-ভাসা ভাবে কথোপকথনের মধ্যে, যা তিনি অতীত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পান এবং কোন সমালোচনা ছাড়াই গ্রহণ করেন।

চেতনার এ স্ববিরোধকে আরও বিশ্লেষণ করে গ্রামসি, এর প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন দিকগুলির মধ্যবর্তী বিরোধকে প্রতিপক্ষ সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর অন্তবর্তী দ্বন্দ্বেরই প্রতিফলন রূপে চিহ্নিত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা এখানে নিম্নবর্গের চেতনা বিশ্লেষণ পদ্ধতির এক সম্ভাব্য সূত্র পাই। এই চেতনাকে আমরা দেখি স্ববিরোধী ও খন্ডিতরূপে। অনেকটাই এলোমেলোভাবে একত্রে ধৃত–যাকে বলা যেতে পারে সাধারণ বোধ। যা অনিশ্চিত, পরস্পরবিরোধী এবং বহুরূপ এক ধারণা।

এ অনিশ্চিত, পরস্পরবিরোধী এবং বহুরূপ ধারণার বহিঃপ্রকাশ আমি অন্ত্যজদের মধ্যেও দেখতে পাই। বহুদিন ধরে কলোনির মধ্যে একত্রে থাকতে থাকতে তাদের মধ্যে কিছু সাধারণবোধ যেমন আছে তেমনি পরস্পরবিরোধী চেতনাও আছে।

3. c‘ ghv‘v : gj¨vqb I µ‡gv”P web¨vmÑAv‡›‘ te‡ZB (GB ceÜwU cKwkZ nq **Inequality among Men** M‡š, Abev‘ K‡i‡Qb AwfwRr ‘vk¸ß) : আন্দ্রে বেতেই বর্ণ শব্দ নিয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁর মতে বর্ণ শব্দটি একটি বিশেষ অর্থ বহন করে। এর অর্থ রঙ। গেল শতাব্দীতে চতুবর্ণ শ্রেণীভেদ বলতে গায়ের রঙের বর্ণভেদ বোঝায় আর এ সম্পর্কের ভিত্তি হল হিন্দুদের বংশগত পার্থক্য। জাতি ও রঙের সম্পর্ক যেমন : ব্রাহ্মণ ফরসা, ক্ষত্রিয় লাল, বৈশ্য হলুদ, শুদ্র কালো; তা শুধু এক ধরনের সাংকেতিক অর্থ বহন করে। প্রকৃত অর্থ ভিন্ন।

ব্রাহ্মণেরা সাত্ত্বিক অর্থাৎ স্বত্ব গুণান্বিত। স্বত্ত্ব শব্দটির অর্থ শুচি। কিন্তু এ অর্থ ছাড়া আরও কিছু অর্থ রয়েছে। স্বত্ব বলতে আমরা সত্য, জ্ঞান, তপস্যা বুঝে থাকি। শ্বেত বর্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সত্ত্ব।

পবিত্রতার মাত্রার ক্রমহ্রাস ঘটে যথাক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের প্রদর্শিত গুণাবলীতে। লালের সঙ্গে সম্পর্ক রজঃগুণের। দ্বিতীয় গুণ রজঃ বলতে বোঝায় শৌর্য, শক্তি। এর নিহিত অর্থ বলতে সেইসব গুণের কথা বোঝায় যা হিন্দু রাজাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রজঃ বলতে ক্ষত্রিয় বোঝায়।

কালোর সঙ্গে সম্পর্ক তমঃ গুণের। তৃতীয় গুণ তমঃ বলতে শুধুমাত্র অন্ধকার বোঝায়। এর অর্থ অশুচিতা। তাই তমঃ শব্দ হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় যারা সর্বনিম্ন তাদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। এ শব্দের ব্যবহার দ্বারা শুদ্রদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বোঝায়। আর বৈশ্যদের মধ্যে রয়েছে দুটি গুণের সমন্বয়। রজঃ ও তমঃ। আর তার নিচে যারা রয়েছে তাদের বলা হয় চন্ডাল, অস্পৃশ্য অথবা হরিজন। বস্তুত এ

অস্পৃশ্যদের পেশা, খাদ্য, আচার-ব্যবহার সবকিছুই অশুচি হিসেবে গণ্য হয়। তাই এদের স্থান সমাজের শ্রেণী ব্যবস্থার সবচেয়ে নিচে। নিম্নতম বর্গের হিন্দুগণ কোন গুণই প্রদর্শন করে না।

অন্ত্যজদের নিয়ে গবেষণার প্রেক্ষিতে এ বইটি পড়ার সময় নর্দান রোডেশিয়ার ন ডেম্বু সমাজের উপর করা ভিক্টর টার্নারের কাজটিও আমি মাথায় রেখেছি।

4. evsjvq RwZi DrcwËÑwn‡Zk iÄb mvb¨vj (ceÜwU cKvk K‡i c¨wcivm cKvkbv ms¯v, Abev' K‡i‡Qb kx‡jLv e‡›`¨vcva¨vq) : হিতেশ রঞ্জন সান্যাল বর্ণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, বর্ণের অর্থ হল গুণ। সামাজিক স্বাতন্ত্র্যের উদ্দেশ্যে প্রতিটি ব্যক্তি তাঁর নিজস্ব প্রবণতা ও দক্ষতার মাধ্যমে প্রকাশিত একটি সহজাত গুণের এক একটি বিশেষ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত।

ব্রাহ্মণেরা শিক্ষিত পুরোহিত শ্রেণীর মানুষ, তাদের পেশা ছিল শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং শিক্ষা প্রদান। রাজপদ অলংকরণ ও সৈন্যবাহিনী গঠন করল ক্ষত্রিয়রা। বৈশ্যরা ছিলেন কৃষক, কারিগর ও ব্যবসায়ী। সর্বশেষে ছিল ক্ষুদ্র বা চাকরশ্রেণী।

ঋকবেদে বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণেরা মহাপুরুষ অর্থাৎ সেই সর্বোচ্চ অস্তিমানের মুখ থেকে উদ্ভত, ক্ষত্রিয়রা তাঁর বাহু, বৈশ্যরা তাঁর উরু এবং শুদ্রগণের উদ্ভব হয়েছে তাঁর পা থেকে।

d. **Andre Beteille; Caste, Class and Power: Changing Patterns of Stratification in a Tanjore Village (1965):** বইটি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের জমা দেয়া আন্দ্রে বেতেই এর পিএইচ.ডি. গবেষণার একটি পরিমার্জিত রূপ। বেতেই দক্ষিণ ভারতের একটি গ্রামে বর্ণ, শ্রেণী ও ক্ষমতার বিষয়সমূহ নিরীক্ষণ করেন এবং সামাজিক স্তরবিন্যাসের মত বৃহত্তর বিষয়ের সঙ্গে তাদেরকে সম্পর্কিত করেন। তিনি যে গ্রামটিতে গবেষণা করেন সেখানে জমি একটি পণ্যে পরিণত হয় এবং যে প্রক্রিয়ায় জমি এ ধরনের রূপ পরিগ্রহ করে সেই প্রক্রিয়ায় বর্ণ ও কৃষি পদক্রমে এক ধরনের পরিবর্তন সাধন করে।

তিনি গ্রামের জনসাধারণকে দু'টো দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করেন। প্রথমতঃ জাতিবর্ণ প্রথা ভিত্তিতে, যেমন : ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ ও আদি দ্রাবিড়ীয়। দ্বিতীয়তঃ জমি মালিক, বর্গাদার ও কৃষি মজুরদের শ্রেণীগত সম্পর্ক। বেতেই মূলত এ দুই ব্যবস্থার মধ্যেকার সম্পর্কের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করেন।

e. **J. Arens and J.V. Beurden; Jhagrapur: Poor Peasants and Women in a Village in Bangladesh (1980):** ইয়েনেক আরেন্স ও ইওস ফান বুয়েরদেন এক ওলন্দাজ দম্পত্তি। ঝগড়াপুর তাদের মার্ক্সীয় সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতিতত্ত্ব অবলম্বনে বাংলাদেশের কৃষক সমাজের সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা। কৃষিক্ষেত্রে বিরাজমান উৎপাদন পদ্ধতি ও শ্রেণীসংগ্রাম অনুসন্ধান তাঁদের প্রধান লক্ষ্য হলেও কৃষক সমাজে নারীশ্রম শোষণ এবং নারীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করাও ছিল তাঁদের গবেষণার বিষয়।

পূর্ববাংলার কৃষক সমাজে নারীর শোচনীয় অবস্থা উদ্‌ঘাটনের প্রথম কৃতিত্ব তাদেরই। এ দম্পতি নৃবিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষক সমাজ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন।

নারী শোষণকে আরেন্স ও বুয়েরদেন দুটো অংশে ভাগ করেছেন। যথা : (১) যৌন শোষণ
(২) অর্থনৈতিক শোষণ।

তারা দেখিয়েছেন যে, যৌনসুখ শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য এবং নারীকে যৌনবস্তু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। নারীকে কখনোই যৌন সঙ্গী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় না। দ্বিতীয়ত, সমাজে নারীর অবস্থান দুর্বল বলেই তাদের ওপর অর্থনৈতিক শোষণটি অত্যন্ত নির্মম। গৃহস্থালীর কাজকর্মের মাধ্যমেই নারীর অর্থনৈতিক শোষণটি প্রচ্ছন্ন থাকে এবং নারী অসহায় বলেই তাদের ওপর পীড়নটি দ্বিগুণ হয়।

ঝগড়াপুরে দেখানো হয়, বাংলাদেশে জীবন ও সমাজ পুরুষ শাসিত। মেয়েরা বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে বসবাস করে পর্দার আড়ালে। বাঙালী নারী জীবনের গুণাবলী–ধৈর্য, ত্যাগ ও

সহনশীলতার ধারণা তার মনে গেঁথে দেওয়া হয়। নিজের হীন মর্যাদা স্বীকার করে নিতেও তাকে শিক্ষা দেওয়া হয়। যৌবনের শুরু থেকেই মেয়েরা পর্দা মেনে চলতে শুরু করে। তার কাছ থেকে নম্র ও লাজুক আচরণ আশা করা হয়, বিশেষ করে পুরুষদের সামনে। প্রথম দিকে যারা খালি গায়ে শুধুমাত্র একটি ঘাগড়া পড়ে এখানে সেখানে ছুটাছুটি করে বেড়াতো তাদেরকেই শেষের দিকে গবেষকদ্বয় দেখেছেন শাড়ী পরে, নিজেদের প্রানোচ্ছলতাকে সীমিত করে ছোট ছোট মহিলায় রূপান্তরিত হতে।

f. **Pauline Kolenda; The Caste System Analyzed: Purity and Pollution, in Caste in Contemporary India: Beyond Organic Solidarity (Rawat Publications, New Delhi), 1997 (Benjamin/Cummings Publishing Co. 1978), reprinted in T.N. Madan, Religion in India, Oxford UP, 1991:** এ প্রবন্ধটিতে গুণতত্ত্বের সঙ্গে খাদ্যের সম্পর্ককে দেখানো হয়েছে। Cool Foods যেমন : দুধ, পরিশোধিত মাখন, অধিকাংশ ফল, সবজি এগুলো স্বত্ত্ব গুণ তৈরি করে। Hot Foods যেমন : মাংস, ডিম, পেয়াজ, আম ইত্যাদি রজঃ গুণ তৈরি করে। ফুটন্ত, নষ্ট ইত্যাদি খাবার তমঃ গুণ তৈরি করে। যেমন : গরুর মাংস, মদ ইত্যাদি। যারা অস্পৃশ্য শ্রেণী তারা সাধারণত তমঃ গুণ সম্পন্ন খাবারগুলো দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে গ্রহণ করে থাকেন।

g. bxnvi iÄb ivq; evOvjxi BwZnvm, Aww‘ce (evsjv 1356) : বইটির ষষ্ঠ অধ্যায়ের বর্ণ বিন্যাস, সপ্তম অধ্যায়ের শ্রেণীবিন্যাস এবং দ্বাদশ অধ্যায়ের ধর্মকর্ম ধ্যান ধারণাকে সাহিত্য পর্যালোচনায় নেওয়া হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের সৎ শুদ্র, অসৎ শুদ্র, বর্ণ ও শ্রেণী, ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অন্যান্য শ্রেণীর সম্পর্ক, বর্ণ ও রাষ্ট্র, অধম শংকর বা অন্ত্যজ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা সাহিত্য পর্যালোচনায় গ্রহণ করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ের শ্রেণীবিন্যাস অংশে সমসাময়িক সাহিত্য, রাজপাদোপজীবী শ্রেণী, রাজসেবক শ্রেণী ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দ্বাদশ অধ্যায়ে মূলত বিদ্যমান ধর্মগুলোর আন্তঃসম্পর্ক এবং আর্যপূর্ব, আর্যতর ও বৈদিক ধর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

h. **Dr. Babashaheb Ambedkar; Writing and Speeches, Vol. 1. Bombay: Education Department, Government of Maharashtra (1979):** বইটির একটি প্রবন্ধকে সাহিত্য পর্যালোচনায় গ্রহণ করা হয়েছে। আম্বেদকার কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধটি হল, Castes in India: Their mechanism, Genesis and Development.

উল্লেখ্য, ৯ই মে ১৯১৬ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নৃবৈজ্ঞানিক সভায় প্রবন্ধটি উপস্থাপিত হয়। প্রবন্ধে ভারতবর্ষের জাতি বর্ণ ব্যবস্থা, তাদের পদ্ধতিসমূহ, উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা চলে, যুগ যুগ ধরে অন্ত্যজরা অবহেলিত ও অবজ্ঞার পাত্র। বর্তমানে তারা একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। হাজার হাজার অন্ত্যজ পরিবার বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত অন্ত্যজ কলোনি এবং এর আশেপাশে মানবেতর জীবনযাপন করছে। ঢাকা শহরের গণকটুলীতে বসবাসরত অন্ত্যজরা তার একটি অংশমাত্র। গবেষিত জনগোষ্ঠীর বিরাজমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সমস্যা, মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়, বঞ্চনা, প্রেম, যৌনতা ইত্যাদিকে আমি গবেষণার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছি। আমার গবেষণার মাধ্যমে যদি তাদের জীবনের প্রকৃত চিত্র ফুটে ওঠে তাহলে আমার গবেষণা সার্থক হবে বলে আমি মনে করি।

ZZxq Aa¨vq

M‡elYv c×wZ

এ অধ্যায়টি আমার নিজস্ব মাঠকর্ম গবেষণার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। কারণ নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল কেন্দ্রবিন্দুই হল মাঠকর্ম। গবেষিত স্থানের পরিবেশ, গবেষিত জনগোষ্ঠীর কর্মকান্ড সম্পর্কে ধারণা পেতে মাঠকর্ম পরিচালনা করা হয়। একজন পিএইচ.ডি. গবেষক হিসেবে গবেষণাকর্মের জন্য আমি ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ থেকে ১৪ মে ২০১৭ পর্যন্ত সময় বেছে নিয়েছিলাম। একাডেমিক কর্মকান্ডের উদ্দেশ্যে এ গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে এবং উল্লেখিত সময়ের মধ্যে আমি আমার প্রয়োজন অনুসারে গবেষিত এলাকায় গিয়েছি এবং ধাপে ধাপে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করেছি।

আমার গবেষণাক্ষেত্র হাজারীবাগ এলাকার গণকটুলী হরিজন কলোনি রাজধানী ঢাকাতে হওয়ায় কাজের বেশ সুবিধা হয়েছে। তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণাক্ষেত্রের অবস্থানও কাছাকাছি। গবেষণাপত্রের প্রথম অধ্যায়ে গবেষিত এলাকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

3.1 MYKUjx‡K M‡elYv‡ÿÎ wn‡m‡e †e‡Q †bqvi KviY : পিএইচ.ডি. গবেষণার মাঠকর্ম সম্পাদন করার জন্য আমি গণকটুলীকে বেছে নিয়েছিলাম কারণ এলাকাটি আমার পূর্ব পরিচিত ছিল। আমার এম.ফিল. গবেষণার মাঠকর্মও আমি গণকটুলীর হরিজন কলোনিগুলোতে করেছিলাম। একই স্থানে গবেষণা করার মূল উদ্দেশ্য ছিল, এম.ফিল. গবেষণায় যা তুলে ধরতে পারিনি পিএইচ.ডি. গবেষণার মাঠকর্মে তা পূরণের চেষ্টা করা। গবেষণাক্ষেত্রে যেয়ে আমি বুঝতে পেরেছি এম.ফিল. গবেষণার মাঠকর্মে সময়ের স্বল্পতার কারণে আমি সব কিছু তুলে ধরতে পারিনি। কিন্তু গণকটুলীর অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার মানুষ আমার মনে নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার অর্ন্তদৃষ্টি খুলে দিয়েছিলেন। এজন্য তাদের কাছে আমি ঋণী। তারপর থেকেই আরও গভীর ভাবে অন্ত্যজদের মধ্যে সামাজিক সচলতা এবং তাদের মধ্যে শুচি-অশুচির যে গভীরতা প্রথিত তা তুলে ধরার তাগিদ অনুভব করি যা আমি আমার পূর্ববর্তী গবেষণায় পারিনি। এদিকে আমার শ্বশুরবাড়িও হাজারীবাগ এলাকায় অবস্থিত হওয়ার কারণে আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদনে বেশ সুবিধা হয়েছে। গণকটুলী কলোনিতে বসবাসরত অনেক

অন্ত্যজ শ্রেণী-পেশার মানুষই আমার পূর্ব পরিচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ত্যজ শ্রেণী-পেশার অনেক পরিচ্ছন্নতাকর্মীর সঙ্গে আমার পূর্বপরিচয় ছিল। ফলে পিএইচ.ডি. গবেষক হিসেবে গবেষিত এলাকার মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করা আমার জন্য সহজ হয়েছে। এ কারণেই অন্ত্যজদের মধ্যে সামাজিক সচলতা এবং শুচি-অশুচির বর্তমান রূপ দেখতে গণকটুলীকে মাঠকর্মের ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করেছি।

3.2 M‡elYv‡ÿ‡Î c‡ek Ges wewfb †KŠkj Aej¤b : যথাযথ নিয়ম মেনে গবেষণাকর্ম সম্পাদনের জন্য আমি আমার পিএইচ.ডি. গবেষণার তত্ত্বাবধায়কের অনুমতি নিয়ে গণকটুলীর হরিজন কলোনিতে ক্ষেত্র গবেষণা শুরু করি। গবেষণাক্ষেত্রে প্রথমে আমি অনানুষ্ঠানিক কৌশল অবলম্বন করি। আমার পক্ষে গবেষিত এলাকায় যাদের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়েছে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই আমি কথাবার্তা বলি, গবেষিত এলাকার মানুষের সঙ্গে গল্পগুজবের মাধ্যমে তাদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করি। বিভিন্ন বয়সের অন্ত্যজ নারী-পুরুষরা এক্ষেত্রে আমাকে নানা ভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাদের সহযোগিতায়ই আমি অন্ত্যজ কলোনিগুলোর এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ঘুরে বেড়িয়েছি। গবেষিত এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি। এ ধরনের অনানুষ্ঠানিক কৌশল যা নৃবিজ্ঞানীরা মাঠকর্মে ব্যবহার করেন সেটাকে তাত্ত্বিকগণ Big Net Approach (Fetterman; 2010) বলে অভিহিত করেন। Big Net Approach এর মাধ্যমে খুব সহজেই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী তথ্যদাতাদের কাছ থেকে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করা যায় এবং তথ্যদাতা তথা গবেষিত এলাকার বাসিন্দাদের কাছে গবেষকের গ্রহণযোগ্যতা সহজ হয়ে উঠে। এজন্য আমি ক্ষেত্র গবেষনায় প্রবেশের পর অনানুষ্ঠানিক কৌশল অবলম্বন করি।

অন্ত্যজদের নিজেদের মধ্যে শুচি-অশুচির স্বরূপটা কেমন, যাদের সঙ্গে অন্ত্যজরা কাজ করছেন তাদের মধ্যে অন্ত্যজদের সম্পর্কে শুচি-অশুচির ধারণাটা কিভাবে কাজ করছে, সামাজিক সচলতায় অন্ত্যজরা কেমন করে টিকে আছেন তথা তারা কিভাবে তাদের অস্তিত্ব ধরে রেখেছেন ইত্যাদি দেখতে আমি গণকটুলীর হরিজন কলোনি এবং তার আশেপাশে বিদ্যমান টিনের চালাগুলোতে মাঠকর্ম পরিচালনা করি।

আমার মাঠকর্ম সম্পাদন অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার অনেকেই সহজভাবে গ্রহণ করেননি। ফলে অনানুষ্ঠানিক কৌশল অবলম্বন করেও অনেকক্ষেত্রে আমি প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি। তারা সঠিক তথ্য অনেক সময় আমাকে দিতেন না। যাচাই-বাছাই করে (Cross Check) পরে এ তথ্যগুলোর সত্য-মিথ্যা আমি জানতে পারি। অন্ত্যজ নারী-পুরুষরা প্রায়শই অনেক ব্যস্ত থাকতেন। এজন্য তারা একবার আমাকে একটা নির্ধারিত সময়ও বেঁধে দিয়েছিলেন। তখন আমাকে অন্ত্যজদের বেঁধে দেয়া সময় অনুযায়ী তাদের সঙ্গে কথা বলতে হত। দীর্ঘ গবেষণা শুরুর কিছুদিন পর অবশ্য অন্ত্যজরা আমার সঙ্গে খোলামেলা ভাবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করেন। আবার অনেকেই আমাকে দেখতেন সন্দেহের দৃষ্টিতে। তারা অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে আমার সঙ্গে কথা বলতেন। সন্দেহের কারণে আমার অনেক প্রশ্নের উত্তরও অন্ত্যজরা এড়িয়ে যেতেন। অনেক সময় অন্ত্যজদের চোখে-মুখে অজানা ভয় ও শঙ্কা কাজ করত। অন্ত্যজরা মনে করতেন আমার সঙ্গে খোলামেলা ভাবে কথা বললে, অকপটে সব তথ্য দিলে আমি হয়ত উপর মহলকে তথা কোন সরকারি বা রাজনৈতিক মহলকে জানিয়ে দেব এবং তার ফলে তাদের অন্ত্যজ কলোনিগুলোতে যাপিত জীবনে ব্যাঘাত ঘটবে।

যদিও আমি গণকটুলির হরিজন কলোনিতে বসবাসরত অন্ত্যজদের আমার গবেষণা কর্মকান্ড সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে অবহিত করেছিলাম তবু তাদের অনেকেই আমাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি বলে মনে হয়েছে। আমি যখন অন্ত্যজদের সঙ্গে কলোনিগুলোতে বসে কথা বলতাম তখন দেখেছি অনেকেই আমার কথাবার্তা, ডায়েরি লেখনী খুব সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতেন। এমনও হয়েছে, আমি অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার কারও সঙ্গে কথা বলছি তখন দূর থেকে তথ্যদাতাকে কেউ হাত ইশারা করে তথ্য দিতে কিংবা সঠিক তথ্য দিতে নিষেধ করছেন। অনেকে মাঠ গবেষণা চলাকালীন তথ্য সংগ্রহের সময় আমাকে দেখিয়ে কিংবা আমাকে ইঙ্গীত করে ইশারায় নিজেদের মধ্যে কথা বলতেন। আমার তখন সব সময়ই মনে হয়েছে যে, তারা আমাকে নিয়েই কথা বলছেন। অবশ্য এগুলো আমার মনের ভুল ধারণাও হতে পারে যা আমাকে অন্ত্যজদের সম্পর্কে আরও বেশি কৌতুহলী করে তুলেছে। এসব কারণে তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ করতে অনেক সময় আমার কষ্ট হয়েছে। মূলত কিছু কাঠামোগত, কিছু অকাঠামোগত, আবার অনেকক্ষেত্রে আংশিক কাঠামোগত কিংবা আংশিক

অকাঠামোগত প্রশ্ন করে আমি আমার পিএইচ.ডি. গবেষণার মাঠকর্ম সম্পন্ন করি। এ পর্যায়ে আমি আমার গবেষণার বিভিন্ন ধাপ নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস করছি।

উপরের আলোচনা থেকে বলা চলে, আমার গবেষণায় কিছু মিশ্র গবেষণা পদ্ধতি লক্ষ্যণীয়। এখানে যেমন অনানুষ্ঠানিক কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে ঠিক তেমনি ভাবে ধ্রুপদি অংশগ্রহণমূলক গবেষণা পদ্ধতির ধারা থেকে সরে এসে ক্রিয়াবাদ এবং তার পরবর্তী ধারাবাহিকতায় সমালোচনামূলক বিতর্কটি মাথায় রেখে বর্তমান নৃবৈজ্ঞানিক ধারাগুলো আমার সুবিধা অনুযায়ী ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়েছে। মাঠ গবেষণায় গিয়ে আমি দেখেছি গুণগত পদ্ধতিতে কাজ করলে গবেষণাটি আরও গভীরতর হয়। তাই আমি আমার গবেষণাকর্মে গুণগত পদ্ধতি ব্যবহারের চেষ্টা করেছি। এইচ. রাসেল বার্নাড (১৯৮৮), পি. জেমস স্পেডলি (১৯৮০), ডেভিড এম. ফেটারম্যান (২০০৯) প্রমুখের বইগুলো পড়ার পাশাপাশি নতুন ধারার গবেষণা পদ্ধতি দেখতে আমি ড. ফারহানা বেগমের Women's Reproductive Illness: Capital and Health Seeking (2015) বইটিতে আলোচিত গবেষণা পদ্ধতির সহায়তা নিয়েছি।

অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির বিতর্ককে বোঝাতে পি. জেমস স্পেডলি (১৯৮০) সাধারণ অংশগ্রহণ বনাম অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ নামক দুটি ধারণা ব্যবহার করেন এবং তার মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে বিভিন্ন সংকটময় ও সংবেদনশীল অবস্থায় নৃবিজ্ঞানীরা অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিটি অনুসরণ করতে পারেন না। তারা সাধারণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানুষের কর্মকান্ডগুলো মনোযোগ সহকারে দেখে থাকেন। আমিও আমার গবেষণায় সাধারণ ভাবে অংশগ্রহণের চেষ্টা করেছি।

আরও উল্লেখ্য যে, মূল তথ্যদাতা নির্বাচন কৌশল নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়। আমি আমার গবেষণায় এ কৌশল গ্রহণ করেছি। মাঠকর্মে প্রবেশের পর একজন নারী এবং একজন পুরুষকে আমি মূল তথ্যদাতা হিসেবে নির্বাচন করি। আমার দুজন মূল তথ্যদাতা ছিলেন যথেষ্ঠ সাহায্যকারী। আমার গবেষণায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য তথ্যদাতা ও উত্তরদাতাদের বাড়িতে তারা আমাকে নিয়ে গেছেন, তাদের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

তাছাড়া তারা আমাকে ওয়ার্ড কমিশনারের কার্যালয় থেকে গবেষিত এলাকা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কাজে যথেষ্ঠ সহায়তা করেছেন। আমি নানা সময়ে তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি এবং তার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছি। আমার একজন উত্তরদাতা ছিলেন যথেষ্ট শিক্ষিত। আমি খুব সহজেই আমার গবেষণার বিষয়বস্তু, গবেষণার উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয় তাদের সঙ্গে আলোচনা করতাম। তারাও উৎসাহ নিয়ে আমার কথাগুলো শুনতেন, আমার প্রশ্নগুলো তারা বুঝতে চেষ্টা করতেন এবং সে অনুযায়ী উত্তর দিতেন।

মাঠকর্ম গবেষণায় আমি উন্মুক্ত সাক্ষাৎকার কৌশলটিরও অনুসরণ করি। এ পদ্ধতিতে আমি আমার তথ্যদাতাদের সঙ্গে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে গল্পগুজব চালিয়ে যেতাম। এ সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় আমি কোন ডায়েরি, কলম বা কাঠামোবদ্ধ রীতিনীতি অনুসরণ করিনি। অন্ত্যজ শ্রেণীর মহিলারা যখন রান্না করতেন তখন আমি তাদের পাশে বসে গল্প করতাম। কাজের ফাঁকে বিকেলে সবাই যখন একসঙ্গে বসে গল্প করতেন তখন আমিও তাদের পাশে বসে থাকতাম। এ ধরণের গল্পগুজব চলাকালে এক পর্যায়ে আমার গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য বের হয়ে আসত। আমি তখন নিবিড় ভাবে তাদের পর্যবেক্ষণ করতাম। এ ধরণের সাক্ষাৎকার কৌশলকে অনানুষ্ঠানিক বা অকাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার বলা হয় (Bernard; 1995). আমি আমার তথ্যদাতাদের সঙ্গে তাদের জীবনের নানা ঘটনা, পরিবারের কথা, তাদের ভাললাগা, পছন্দ-অপছন্দের বিষয়াবলী, তাদের সন্তানদের পড়াশোনার কথা, জীবনের স্বরণীয় ঘটনাগুলো জানতে চেয়ে গল্পগুজব করি। গল্পগুজবের এক পর্যায়ে আমি তাদের কাছ থেকে খুব সহজেই আমার গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

আমার গবেষণায় আমি কিছু ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে সেমি-স্ট্রাকচার (আংশিক কাঠামোবদ্ধ) কৌশলটি অনুসরণ করেও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। এ সাক্ষাৎকার গ্রহণের আগে আমি একটি লিখিত প্রশ্নের তালিকা তৈরি করেছিলাম। সামান্য গল্পগুজবের পাশাপাশি লিখিত প্রশ্নের তালিকানুযায়ী আমি তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতাম। অন্ত্যজশ্রেণীর নারী-পুরুষরা সাধারণত সকালবেলা কাজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতেন। এজন্য আমি তাদের কাছ থেকে আংশিক কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। কারণ তারা ব্যস্ত থাকতেন। তাদের কাছ থেকে উন্মুক্ত সাক্ষাৎকার কৌশলের মাধ্যমে তথ্য

সংগ্রহ করলে তাদের কাজের দেরি হতে পারে এটা মাথায় রেখে আমি এ কৌশলে তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। আমি তাদের সালাম দিয়ে, তাদের সঙ্গে কুশলাদি বিনিময় করে, তাদের পরিবারের সদস্যদের কথা জিগ্যেস করে আমার সাজানো প্রশ্ন তালিকার উপর মনোযোগ প্রদান করতাম। আমি এ কৌশলটি গ্রহণ করেছিলাম যেন অল্প সময়ে আমার গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

আমার গবেষণাকর্মটিকে আমি বিভিন্ন কেসস্টাডির সমন্বয়ে সাজিয়েছি। অন্ত্যজদের মধ্যে সামাজিক সচলতা এবং শুচি-অশুচিকেন্দ্রিক বিভিন্ন ঘটনা আমি তাদের মুখে শুনে এগুলো গবেষণাকর্মে অর্ন্তভুক্ত করেছি। আমি চেষ্টা করেছি ঘটনাগুলো যথাসম্ভব অবিকৃত ভাবে আমার গবেষণাকর্মে ফুটিয়ে তুলতে এবং গভীর ভাবে জানার প্রয়াস চালাতে।

আমার গবেষণায় লক্ষ্যনীয় যে গণকটুলী হরিজন কলোনিতে বসবাসরত অন্ত্যজদের মধ্যে তেলেগু ও হিন্দী ভাষার প্রচলন রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের বিভিন্ন হরিজন কলোনিতে বসবাসরত অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার মানুষরা বেশিরভাগ বাংলাতেই কথা বলেন। দীর্ঘদিন ধরে এ সমাজে কাজ করতে করতে তাদের জীবনে বাঙালি সংস্কৃতি চরমভাবে বিদ্যমান। তাই তাদের সঙ্গে একাত্মতা করা আমার পক্ষে সহজ হয়েছে। আমি এটাও দেখেছি যে বাংলা বলার পেছনে তাদের নিগূঢ় বেদনা রয়েছে। এ বিষয়ে আমি অন্য একটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

মাঠকর্ম গবেষণায় আমি আমার তথ্যদাতাদের জীবনী অধ্যায়ন করেছি। জীবনী অধ্যায়ন হল ব্যক্তির জীবনের নানা গল্প ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা। মাঠকর্ম গবেষণার সময় আমি অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার মানুষজনের কাছ থেকে তাদের জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও গল্পের বর্ণনা শুনেছি। জীবনী অধ্যায়নের মাধ্যমে আমি অন্ত্যজদের ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাগুলো জেনেছি। শুচি-অশুচি ঘিরে তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া নানা গল্প ও বেদনা শুনেছি। আমি যখন অন্ত্যজদের কাছ থেকে উন্মুক্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতাম তখন তারা তাদের জীবনের বিভিন্ন গল্প ও অভিজ্ঞতাগুলো আমাকে বলতেন। জীবনী অধ্যায়নকে ব্যক্তি জীবনের বিবরণ বলে অবহিত করা হয়, যা সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে

উঠে আসে (Denzin, 1989). অন্ত্যজদের জীবনী অধ্যায়নের মাধ্যমে আমার গবেষণায় উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো উঠে আসে।

আমি আমার গবেষণায় Focus Group Discussion (FGD) করেছি। Focus Group Discussion (FGD) মূলত কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর সুনির্দিষ্ট আলোচনা। একই জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষদের মধ্যে এটি একটি দলগত আলোচনা। এখানে সবাই অংশগ্রহণ করতে পারেন। অবসরে অন্ত্যজরা একত্রিত হয়েছেন এবং আমি সুকৌশলে একটি বিষয় তাদের মাঝে উপস্থাপন করে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। বিষয়গুলোর মধ্যে বেশির ভাগই ছিল অন্ত্যজদের জীবনে বিদ্যমান সমস্যা নিয়ে। যেমন : অন্ত্যজদের প্রাত্যহিক জীবনে নারী-পুরুষ সম্পর্কে টানাপোড়েন, বাসস্থান সমস্যা, পুষ্টিহীনতা, কর্মহীনতা, শিক্ষাহীনতা ইত্যাদি। তারা তাদের বিদ্যমান সমস্যাগুলো নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছেন। যেহেতু আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা সবাই আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সরাসরি জড়িত তাই আলোচনা জমে উঠেছে এবং বাস্তবসম্মত ফল পাওয়া গেছে। তাছাড়া তাদের আগের অনেক অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কেও আমি সাধারণ ধারণা পেয়েছি। এভাবে আমি অনেক প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করতে পেরেছি, আবার অনেক প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করতে পারিনি।

মাঠকর্ম গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য ফিল্ডনোট উপকারী ভূমিকা পালন করে। ফিল্ডনোট গ্রহণ করে আমি আমার গবেষণা সম্পন্ন করেছি। ফিল্ডনোট গ্রহণের ফলে গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় বাদ পড়ার হাত থেকে রেহাই পেয়েছি। ফিল্ডনোট গ্রহণের সরঞ্জাম হিসেবে আমি ডায়েরি, কলম, পেনসিল, ক্যামেরা এবং মাঝে মাঝে ল্যাপটপ ব্যবহার করেছি। ক্যামেরার মাধ্যমে অন্ত্যজদের Living Picture তুলে ধরাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। আমি তাদের ছবি তুলেছি, তাদের কথা রেকর্ড করেছি। ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার এগুলো ব্যবহারের আগে গবেষিত জনগোষ্ঠীকে তা অবহিত করেছি এবং তাদের অনুমতি নিয়েছি। আমি চেষ্টা করেছি তাদের প্রতি আস্থাশীলতার পরিচয় দিতে। অবশ্য অন্ত্যজদের সামনে মাঠকর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আমি ডায়েরিতেই লিখে রাখতাম। এ ব্যাপারে তারা অসুন্তষ্ট হতেন না বা কিছু মনে করতেন না। অনেকক্ষেত্রে তারা আমাকে এসব সরঞ্জাম ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করতেন যেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আমি ভুলে না যাই। তবে বেশ সাবধানতা অবলম্বণ করে আমাকে ফিল্ডনোট ব্যবহার করতে হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার মানুষের

অঙ্গভঙ্গি, কথাবলার ধরণ এবং তাকানোর ধরণ দেখে বুঝতে পারতাম তারা আমার নোট গ্রহণকে সহজ ভাবে নিতে পারেননি। এ অস্বস্তি এড়ানোর জন্য আমি ডায়েরিতে নোট গ্রহণ থেকে দূরে থাকতাম এবং সবকিছু মাথায় রাখার চেষ্টা করতাম। তবুও এমন অনেক বিষয় থাকতো যেগুলো নোট গ্রহণ ছাড়া মনে রাখা সম্ভব হত না। ফলে অনেক সাবধানে আমাকে এ নোট গ্রহণের কাজ করতে হয়েছে। ফিল্ডনোট গ্রহণের ফলে আমার গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণের কাজ অনেক সহজ হয়েছে।

আমার গবেষণায় নমুনায়ন ব্যবহার করা হয়েছে। নমুনায়ন পরিসংখ্যানের ধারণা হলেও তা নৃবেজ্ঞানিক গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য বহুল ব্যবহৃত হয়। নমুনায়ন পদ্ধতিতে জনসংখ্যার প্রতিটি একক অধ্যায়নের পরিবর্তে জনসংখ্যার একটি নির্দিষ্ট অংশ অধ্যায়ন করে মোট জনসংখ্যা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের সময় আমি নমুনায়ন পদ্ধতিটি অনুসরণ করি। অন্ত্যজ কলোনি ও ঘেরাটোপের মধ্যে নির্মিত টিনের চালার কতিপয় ব্যক্তিকে আমি অধ্যায়ন করেছি এবং তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে আমার গবেষণাটিকে সাজিয়েছি। গবেষণার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এবং গবেষণা কাজের সুবিধার কথা চিন্তা করে আমি উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতিটি ব্যবহার করেছি। নৃবৈজ্ঞানিক গভীর অনুসন্ধান করার পেক্ষিতে আমি আমার গবেষণার নমুনায়নের সংখ্যা কম নিয়েছি। আমি ২৯ জন অংশগ্রহণকারী তথ্যদাতা নির্বাচন করি। এর মধ্যে ১৮ জন পুরুষ এবং ১১ জন মহিলা। আমি প্রথমে House Hold Census করি। সেখান থেকে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য Snow Ball Sampling করি। Snow Ball Sampling করতে যেয়ে আমি একাধিক Key Informant এর কাছ থেকে অন্যান্যদের নাম জানতে পারি যারা আমার গবেষণায় উত্তরদাতা হয়েছেন। মূলত তাদের প্রত্যেকেরই একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। Snow Ball Sampling করার উদ্দেশ্যই ছিল সেসব মানুষকে খুঁজে বের করা যারা পরস্পর পরিচিত।

৩.৩ Z_¨ msM‡ni DcKiY : 'সামাজিক সচলতায় অন্ত্যজরা : শুচি-অশুচির বর্তমান রূপ' এ শিরোনামে অন্ত্যজদের উপর কাজ করতে গিয়ে দু'ধরনের উৎস থেকে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি। যথা : (a) Primary (b) Secondary

(a) Primary: প্রাথমিক উৎসে বা মাঠ পর্যায়ে ব্যক্তিগত অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

(b) Secondary: দ্বিতীয় উৎস হিসেবে অন্ত্যজ শ্রেণী-পেশার ওপর লিখিত গবেষণাগুলোর তথ্যাদির ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অবশ্য সংশ্লিষ্ট সব বই যে অন্ত্যজ শ্রেণীর ওপর তা নয়। কিছু কিছু বই সাধারণ অর্থে ভারতীয় উপমহাদেশে বিদ্যমান জাতিবর্ণ প্রথার উপর রচিত হয়েছে। অন্যান্য বই ছিল গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ এবং গবেষণা পদ্ধতি নির্মাণের উপর।

3.4 cZ¨qmg‡ni we‡kølY : আমার পিএইচ.ডি. গবেষণার প্রত্যয়সমূহ হল 'সামাজিক সচলতা', 'অন্ত্যজ' ও 'শুচি-অশুচি'। নিম্নে প্রত্যয়সমূহ বিশ্লেষণ করা হল।

mvgwRK mPjZv : সামাজিক সচলতা বলতে বোঝায় মূলত সামাজিক গতিশীলতা। অবশ্য ভারতীয় সাবলটার্ন স্টাডিজের ভাবনা-চিন্তায় সামাজিক সচলতা কিছুটা ভিন্ন মাত্রা পায়। উপমহাদেশে সামাজিক সচলতার ইতিহাসে নিহিত বাস্তবতা তথা পরিবর্তনশীল সামাজিক সম্পর্ক প্রতিনিয়ত ভিন্ন মাত্রা পাচ্ছে। ফলে সমাজের নানা পর্যায় ও বিবর্তনের মধ্যেই অন্ত্যজ শ্রেণীর সচলতার সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে অবিরাম। অন্ত্যজ শ্রেণীর এ অবিরাম সংগ্রামের নামই সামাজিক সচলতা।

উল্লেখ্য, এ সংগ্রাম চলতে থাকলে বর্তমান জাতি-শ্রেণী আধিপত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে অন্ত্যজদের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ নিঃসন্দেহে সমাজ কাঠামোকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দেবে।

একথা চরম সত্য, ভারতীয় উপমহাদেশের মত কৃষিপ্রধান দেশে বুর্জোয়া বিপ্লব এবং ধনতন্ত্রের বিকাশ সুষমভাবে ঘটেনি, সেখানে রয়েছে অন্ত্যজ শ্রেণীর শ্রেণীবৈষম্যের জটিল স্তরভেদ।

নিম্নজাতির অধিকতর মর্যাদা দাবি করার একটি প্রক্রিয়া সামাজিক সচলতায় চলমান জাতিভেদ ব্যবস্থায় অনেকদিন ধরেই প্রচলিত ছিল। শ্রীনিবাস এ প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছিলেন সংস্কৃতায়ন। সামাজিক সচলতার চলমান গতিশীলতায় সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যেও প্রকাশ পেত উচ্চ-নীচের

সংঘাত। অবশ্য বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিম্নজাতি তথা অন্ত্যজরা আর বলেন না যে, ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে আমরা উচ্চতর জাতির সমান। বরং বলেন আমরা পৃথক, অবদমিত, বঞ্চিত, দলিত (চট্টোপাধ্যায়, ২০১২)।

এদিকে আধুনিক ইউরোপীয়ান সমাজের ছাঁচে রাষ্ট্রীয় সংবিধানে উদারনৈতিক কাঠামো গ্রহণ করা সত্ত্বেও ভারতীয় উপমহাদেশে আজকের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা জাতিবৈষম্যের বাস্তবতা স্বীকার করে নিয়েছে। নীতি হিসেবে স্থির করেছে নিম্নতর জাতি যেহেতু সামাজের বৈষম্য ও অত্যাচারের শিকার, তার স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং তাকে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দেয়ার জন্য বিশেষ আইনগত ব্যবস্থা থাকা উচিৎ।

ভারতবর্ষের ধর্মীয় ইতিহাসে তার নানা পরিবর্তন, বিরোধ, নতুন ধর্মের প্রবর্তন, শাস্ত্রীয় ধর্ম আর লোকধর্মের নানা সংমিশ্রণের মধ্যে উচ্চনীচের পারস্পরিক ক্ষমতার বিরোধ দেখতে পাওয়া যায়। ফলে এ সমাজের মৌলিক দ্বন্দ্বের চরিত্র এখনও আমাদের কাছে অস্পষ্ট রয়ে গেছে। ইউরোপীয়ান সমাজের বিবর্তনের ছকের সঙ্গে তা মেলে না বলে ইউরোপীয়ান পন্ডিতেরা বলেন, এ দেশের নিজস্ব কোন ঐতিহাসিক গতি নেই। যতটুকু গতি এসেছে, তা কেবলমাত্র ঔপনিবেশিক শাসনের ফলেই এসেছে। যদিও আমরা সে কথা মানতে পারিনা। আমাদের মনে রাখতে হবে, সাবলটার্নদের মধ্যে সামাজিক স্তরায়ন এবং বেঁচে থাকার সংগ্রাম নতুন সচলতা তৈরি করেছে।

AšÍ¨R gvbl : নীহাররঞ্জন রায় রচিত বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্বে অন্ত্যজ চলকটির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল।

অধম সংকর বা অন্ত্যজ পর্যায়ে রয়েছে ৯টি উপবর্ণ। অর্থাৎ এরা অস্পৃশ্য। এরা হলেন :

১. মলেগ্রহী (মলগৃহী)

২. কুড়ব

৩. চন্ডাল (চাঁড়াল)

৪. বরুড় (বাউড়ী)

৫. তক্ষ (তক্ষণকার)

৬. চর্মকার (চামার)

৭. ঘট্টজীবী (পাঠ্যান্তরে ঘণ্টজীবী–খেয়াঘাটের রক্ষক, খেয়াপারাপার করে মাঝি)

৮. ডোলাবাহী–ডুলি–বেহারা, বর্তমান দুলিয়া, দুলে

৯. মল (বর্তমান মালো) (রায়, ১৯৪৯)

ïwP-AïwP : ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী সম্পর্কে শুচি-অশুচির ধারণা সৃষ্টি করা হয় হিন্দু ধর্মশাস্ত্রগুলোতে। অপস্তম্ভ, গৌতম, বৌধায়ণ, বশিষ্ঠের ধর্মসূত্রগুলোতে অপবিত্রতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়া হয়। মূলত ধর্মসুক্তগুলোতে কোন্ কোন্ ধরণের কর্মে লিপ্ত হলে মানুষ অপবিত্র হয় তার একটি তালিকা সুনির্দিষ্ট করা হয়। তালিকার অর্ন্তভুক্ত মানুষরা কতগুলো শাস্ত্রাচরণের মধ্য দিয়ে বা কিছুদিন অপবিত্রতার জীবনযাপনের পর পুনরায় পবিত্র হওয়ার সুযোগপ্রাপ্ত হন। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে অপবিত্র বা অস্পৃশ্য হিসেবে যাদের নির্দিষ্ট করা হয়েছে তারা কতগুলো মনুষ্যগোষ্ঠী যারা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্তই অপবিত্র বা অস্পৃশ্য থাকেন। তাদের পবিত্র বা স্পর্শযোগ্য হওয়ার কোন সুযোগই নেই। মানুষ যত নিম্নবর্ণের হবে, তার পবিত্রতারকালও ততই বৃদ্ধি পাবে। যেমন বশিষ্ঠের বিধান অনুযায়ী : একজন ব্রাহ্মণ (মৃত্যু বা জন্মের কারণে) দশদিন পর অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হবে। একজন ক্ষত্রিয় পনের দিন পর, একজন বৈশ্য বিশ দিন পর, একজন শূদ্র একমাস পর। এখানে লক্ষ্যনীয়, যে যে ক্ষেত্রে অপবিত্রতার কারণ হয়, তার মধ্যে পতিত ব্যক্তি এবং অন্ত্যজকে স্পর্শ করাও যুক্ত হয়েছে। এরা স্থায়ীভাবে ও জন্মসূত্রে অপবিত্র। এখানে ধর্মসূত্রে কতকগুলো মনুষ্যগোষ্ঠীকে সমগ্রভাবে অপবিত্র বা অস্পৃশ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ঋষি বৌধায়ন তার বিধানে এ সম্পর্কে আরও কঠোরতা প্রয়োগ করেন। তিনি বলেন, ' ...একজন পতিত ব্যক্তি, কোন চিতা, কোন কুকুর অথবা কোন চণ্ডালকে স্পর্শ করলে স্নান করতে হবে' (সেন, ২০১০)।

শুচি-অশুচির ব্যাখ্যায় পার্থ চট্টোপাধ্যায় তার প্রবন্ধে লুই দুমোকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। বারনার্ড কোহনের পৃথকীকরণ তত্ত্বের পরিমার্জিত করে লুই দুমো তাঁর বিতর্কিত Homo Hierarchicus (1970) গ্রন্থে বলেন, শুচি/অশুচির ধর্মীয় চেতনায় ভারতীয় সমাজের ধর্মীয় গঠনকে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সমাজ কাঠামোর মূল বৈশিষ্ট্য হল ক্রমোচ্চ বিন্যাস, যেখানে শুচি/অশুচির মানদন্ডে প্রতিটি জাতির পদমর্যাদা নির্দিষ্ট হয়। এক সার্বজনীন ধর্মের শক্তি জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে

নিয়ন্ত্রণ করে সমগ্র সমাজটিকে একত্রে ধরে রাখে। ধর্মের অবগত শক্তির কাছে যাবতীয় ঐহিক ক্ষমতা এখানে পরাভূত হয়। শেখর বন্দোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত সম্পাদিত জাতি, বর্ণ ও বাঙ্গালী সমাজ (১৯৯৮) বইয়ের পদ মর্যাদা : মূল্যায়ন ও ক্রমোচ্চ বিন্যাস প্রবন্ধে আন্দ্রে বেতেই বলেছেন, ব্রাহ্মণেরা সাত্ত্বিক অর্থাৎ স্বত্ব গুণান্বিত। স্বত্ত্ব শব্দটির অর্থ শুচি। কিন্তু এই অর্থ ছাড়া আরও কিছু অর্থ রয়েছে। স্বত্ব বলতে আমরা সত্য, জ্ঞান, তপস্যা বুঝে থাকি। শ্বেত বর্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সত্ত্ব।

পবিত্রতার মাত্রার ক্রমহ্রাস ঘটে যথাক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের প্রদর্শিত গুণাবলীতে। লালের সঙ্গে সম্পর্ক রজঃগুণের। দ্বিতীয় গুণ রজঃ বলতে বোঝায় শৌর্য, শক্তি। এর নিহিত অর্থ বলতে সেইসব গুণের কথা বোঝায় যা হিন্দু রাজাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রজঃ বলতে ক্ষত্রিয় বোঝায়। কালোর সঙ্গে সম্পর্ক তমঃ গুণের। তৃতীয় গুণ তমঃ বলতে শুধুমাত্র অন্ধকার বোঝায়। এর অর্থ অশুচিতা। তাই তমঃ শব্দ হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় যারা সর্বনিম্ন তাদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। এ শব্দের ব্যবহার দ্বারা শুদ্রদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বোঝায়। আর বৈশ্যদের মধ্যে রয়েছে দুটি গুণের সমন্বয়। রজঃ ও তমঃ (বন্দোপাধ্যায়; দাশগুপ্ত, ১৯৯৮)।

উত্তর রোডেশিয়ার ন ডেম্বু সমাজের উপর করা ভিক্টর টার্নারের কাজটিও আমি আমার গবেষণার শুচি-অশুচি বিষয়টি দেখার সময় মাথায় রেখেছি। এ ক্ষেত্রে ন ডেম্বু সমাজের জীবনের আচার বোঝাতে ভিক্টর টার্নার প্রতীক হিসেবে লাল, সাদা ও কালো তিনটি রংয়ের ব্যবহার দেখান। এ তিনটি রংয়ের প্রতীক দিয়ে তিনটি নদীকে বোঝানো হয়। এ নদীগুলো দেবতার ক্ষমতার প্রবাহকে ইঙ্গীত করে। এখানে সাদা রংয়ের নদী দিয়ে শুচি, স্বাস্থ্য, ক্ষমতা, জীবন, বৈধতা ইত্যাদি বোঝানো হয়, লাল রংয়ের নদী দিয়ে ভিন্ন রকমের রক্ত বোঝানো হয়। যা ভাল রক্ত এবং খারাপ রক্ত দুটোরই প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কালো রংয়ের নদী দিয়ে প্রেতাত্মা, ডাইনী, রোগ-বালাই ইত্যাদিকে ইঙ্গীত করা হয়। কালো রং দিয়ে মৃত্যু ও অশুচিতাকেও ইঙ্গীত করা হয়। মূলত, লাল ও সাদা রং জীবনের প্রতীক। অপরদিকে কালো রং মৃত্যুর প্রতীক (টার্নার, ১৯৬৬)।

শুচি-অশুচি চলকটি ব্যাখ্যা করার সময় মেরী ডগলাসের তত্ত্বটি চলে আসে। কারণ মেরী ডগলাসের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল নোংরা, ময়লা বা অশুচি। প্রত্যয়গত অবস্থান থেকে তিনি কাঠামোবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

দিয়ে সবকিছু ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। মেরী ডগলাসের দূষণবোধ ও নৈতিকতা থেকে সৃষ্ট নৈতিক ভুবনবোধের ব্যাখ্যায় বেরিয়ে এসেছে আদিম ও আধুনিক সমাজের বাস্তবতা। আধুনিক সমাজের বাস্তবতায় শুচি-অশুচির আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শুচি-অশুচির বর্তমান রূপ। আদিম সমাজে নোংরাবোধটি একটি সার্বজনীন অর্থবহন করে। নোংরা বলে একটি বস্তুকে বা বিষয়কে নির্দেশ করা হয় তখনই যখন ঐ বিষয়ের স্থান-চ্যুতি ঘটে। আদিম সমাজে নোংরা বোধের মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে নৈতিকতা, নৈতিকতা থেকে তৈরি হচ্ছে নৈতিক ভুবন। এ নৈতিক ভুবন গড়ে উঠার মধ্য দিয়ে একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হচ্ছে। নোংরা হলে পরম বা ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না। নোংরাকে শুদ্ধির মাধ্যমে ফিরিয়ে আনতে হবে। আদিম সমাজে নোংরাবোধের বিপরীতে পরম বা ঈশ্বরের বোধ তৈরি হচ্ছে। আবার দূষণবোধ আধুনিক সমাজে বসবাসরত মানুষের স্বাস্থ্যগতবোধ। দূষণ আজকের পৃথিবীতে একটি বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও তা সার্বজনীন নয়। কারণ দূষণবোধের অবস্থান মতাদর্শ। এর ফলাফলে মতাদর্শগত সমাজে বোধের ভিন্নতা বিদ্যমান। এ বোধগুলোর মাধ্যমে আমরা এক ধরনের শ্রেণীকরণ করছি এবং এ শ্রেণীকরণের মাধ্যমে আমরা আমাদের মূল্যবোধগুলো তৈরি করছি। এ বোধগুলো সব সমাজের মূল্যে একই অর্থ বহন করে না। এ বোধগুলো যখন প্রতীক তৈরি করে দেয় তখন আর তা নষ্ট করা যায় না। প্রতীক অত্যন্ত শক্তিশালী। এই প্রতীকগুলো তৈরি করছে সংস্কৃতি (ডগলাস, ১৯৬৬)।

3.5 M‡elYvi ˆbwZKZv : মাঠকর্ম চলাকালীন সময়ে আমি সর্বদা আমার নীতি-নৈতিকতার জায়গায় অটুট থাকার চেষ্টা করেছি। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী তথ্যদাতাদের কাছে আমার অবস্থান ও পরিচয় অবিকৃত ভাবে বর্ণনা করেছি। তাদের প্রতি যথাসম্ভব সম্মান দেখিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী, অভিমতগুলোর উপর সম্মান দেখিয়েছি। তাদের গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে আমি সবসময়ই সজাগ ছিলাম। অন্ত্যজরা তাদের অনেক সংবেদনশীল বিষয় আমার সঙ্গে ভাগাভাগি করেছেন। আমি সেগুলোকে কোন ভাবেই অন্য কারও কাছে প্রকাশ করিনি। এ গবেষণায় বর্ণনারত ঘটনা অধ্যায়ন, জীবনী অধ্যায়নগুলো উপস্থাপনের আগে আমি তাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করেছি। এমন অনেক সংবেদনশীল বিষয় তারা আমাকে বলেছেন যেগুলো আমাকে আমার গবেষণার বিষয় সম্পর্কে সূক্ষাতিসূক্ষ জ্ঞান প্রদান করেছে। কিন্তু একই সঙ্গে তারা আমাকে ওইসব বিষয়গুলো গবেষণাকর্মে উপস্থাপন করতে নিষেধ করেছেন। এগুলো মাথায় রেখে আমি গবেষণাকর্ম তৈরি করি।

তাছাড়া আমি আমার গবেষণায় তথ্যদাতাদের নাম ব্যবহারের আগে তাদের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করেছি। তারা আমাকে অনুমতি দিলে আমি তাদের প্রকৃত নাম ব্যবহার করেছি। যারা আমাকে তাদের প্রকৃত নাম ব্যবহারের অনুমতি দেননি তাদের ক্ষেত্রে আমি ছদ্যনাম ব্যবহার করেছি। সর্বোপরি, নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য জরুরি নৈতিক দিকগুলো মাথায় রেখে আমি গবেষণার মাঠকর্ম সম্পন্ন করি।

4.1 AšÍ¨R Rb‡Mvôxi ‘w¶Y Gkxq †c¶vcU : সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি অন্যতম ধরণ হচ্ছে–জাতি বর্ণ প্রথা যা বিশ্বের অন্য কোথাও দেখা যায় না, একমাত্র ভারতীয় উপমহাদেশ ছাড়া। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে জাতিবর্ণ প্রথার মত কিছু উপাদান লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু তা জাতিবর্ণ ব্যবস্থার মত স্থায়ী রূপে সমাজ কাঠামোর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং সেভাবে সেখানকার সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি, যা হয়েছে ভারতে।

ধারণা করা হয়, সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের কিছুকাল পর ভারতে আর্যদের আগমন ঘটে। এরপর আর্যরা ভারতে স্থায়ী হয়ে হিন্দুদের বর্তমান মূল ধর্মগ্রন্থ বেদ প্রণয়ন করতে শুরু করেন এবং মনে করা হয় বেদ রচিত হয়েছে পাঁচশত বছর ধরে। বেদ মূলতঃ বহু রচয়িতাদের রচিত প্রার্থনা সংগীতের একটি সংকলন গ্রন্থ। এ পাঁচশ বছর ধরে যে সমাজ পরিচালিত হয় তাকেই বৈদিক সমাজ বলা হয় এবং জাতি বর্ণ প্রথার শুরু হয় বেদের একেবারে শেষদিকে। বেদের পুরুষ সুক্তের দশম মন্ডলে জাতিবর্ণের কথা উলেখ করা হয় এবং ধারণা করা হয় জাতিবর্ণ প্রথা এখান থেকেই যাত্রা শুরু করে। এর সময়কাল ১০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের কিছু আগে বা পরে। তারপর আর বেদ রচিত হয়নি। ব্রাহ্মণরা বেদ অনুযায়ী অন্যান্য শাস্ত্র রচনা করতে থাকেন এবং বৈদিক সমাজ রূপান্তরিত হয় শাস্ত্রীয় সমাজে (সেন, ২০১০)।

বেদের শেষ দিকে ৪টি বর্ণের কথা বলা হয় এবং প্রত্যেক বর্ণের জন্য কাজও নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। প্রথম বর্ণে ব্রাহ্মণ–যারা ব্রহ্মার মুখ থেকে উৎপত্তি হয়েছেন। তাদের কাজ পূজা-অর্চনা করা, দ্বিতীয় বর্ণে ক্ষত্রিয়–যারা ব্রহ্মার বাহু থেকে এসেছেন। তাদের কাজ যুদ্ধ-বিগ্রহ, তৃতীয় বর্ণে বৈশ্য–যারা এসেছেন ব্রহ্মার উরু থেকে। তাদের কাজ ব্যবসা-বাণিজ্য করা। তারপর চতুর্থ বর্ণে রয়েছেন শূদ্র–যারা এসেছেন ব্রহ্মার পদযুগল থেকে। তাদের কাজ সবার সেবা করা। এখানে চতুবর্ণের পেশা ও কাজ জন্মগত এমন কিছুর উল্লেখ নেই। পরবর্তীতে পেশা ও মর্যাদা এক এক বর্ণের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় এবং বিয়ষটি জন্মগত রূপ লাভ করে (সেন, ২০১০)।

Dhaka University Institutional Repository

যাই হোক, জাতিবর্ণ প্রথার আবির্ভাব ঘটানো হয়েছিল মূলতঃ রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা এবং প্রভাব বিস্তারের চেতনা থেকে। এ জাতিবর্ণ প্রথাকে টিকিয়ে রাখার জন্য পর্যায়ক্রমিক অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন আর্য ব্রাহ্মণরা এবং তা জাতি প্রথার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। যেমন : স্বজাতি বিবাহ, বাল্য বিবাহ, সতীদাহ প্রথা, বিধবা বিবাহ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি।

4.2 c‡iwnZ m¤ú‘vq mó civ‡Y ewYZ Kwnbx Ges gbi weavb : পুরোহিত সম্প্রদায় সৃষ্ট পুরাণে বর্ণিত কাহিনী এবং মনুর বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে হরিশংকর জলদাসের নিরীক্ষাধর্মী বই রামগোলামে (২০১২)।

তাঁর ভাষায়, মল ও আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য কিছু মানুষকে নিযুক্ত করতেন শাসক সম্প্রদায়। ভারতবর্ষে যেমন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও তেমনি এ ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষেই শুধু এ কাজের সঙ্গে ঈশ্বরের বিধান এবং শাস্ত্রীয় অনুশাসন যুক্ত হয়েছে। ঈশ্বরীয় বিধানে বলা হয়েছে, সমাজের বিশেষ এক শ্রেণীপেশার মানুষ এ কাজ করবে। শাস্ত্রকাররা পুরাণের কাহিনীর মোড়কে তাদের অভিসন্ধিকে প্রথাবদ্ধ করেন। ব্রহ্মা বিশ্ব সৃষ্টিকর্তা, তাই সব মানুষের পিতাও তিনি। একদিন এ বিশ্বপিতা বনপথে হাঁটছিলেন। হঠাৎ মহর্ষি ব্রহ্মা পথের ঠিক মাঝখানে একদলা মানুষের মল দেখলেন। গা গুলিয়ে উঠল তাঁর, মন বিষণ্নতায় ভরে গেল। বিষণ্ন ব্রহ্মা বেকায়দায় পড়ে গেলেন। পবিত্র দেবতা তিনি। তিনি তো আর নোংরা মল অতিক্রম করতে পারেন না! আবার অনন্ত সময় ধরে পথের মধ্যে থেমে থাকাও সম্ভব নয় ব্রহ্মার পক্ষে। চিন্তাক্লিষ্ট হলেন বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমাধানের দ্বার খুলে গেল। তিনি অনেক্ষণ পথ হাঁটছিলেন। তিনি ঘর্মাক্ত হয়েছেন। রাস্তার ধূলো তাঁর গায়ে লেগে আছে। দেহের চামড়ায় আঙুল ঘষলেন ব্রহ্মা, ঘষায় দেহ থেকে কালো নোংরা কিছু পদার্থ বেরিয়ে এল। আঙুল থেকে পথে পড়ে গেল ওগুলো। ঘামে-ধুলোয় জড়ানো ওই বর্জ্য পদার্থ থেকে জন্ম নিলেন একজন মানুষ। ব্রহ্মা আদেশ দিলেন, মাত্রক, ওই মহী-মাটি থেকে মলগুলো পরিষ্কার করে দে, ওগুলো আমার পথ চলায় বিঘ্ন ঘটিয়েছে। মাত্রক আনতমস্তকে তার স্রষ্টার আদেশ পালন করলেন। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে ঘষে ঘষে পথ থেকে মলগুলো পরিষ্কার করে দিলেন তিনি। ব্রহ্মা খুশি হলেন। বললেন, আজ থেকে তুই মহীথর। ভদ্র মানুষদের মল পরিষ্কার করবি তুই। তাতেই তোর জীবন ধন্য হয়ে উঠবে। ব্রহ্মা পথ দিয়ে হেঁটে চলে গেলেন তাঁর গন্তব্যে। পথের মাঝে অসহায়

মহীথর দাড়িয়ে থাকলেন ভদ্র-শিক্ষিত মানুষজনের মল পরিষ্কার করার জন্য। ব্রহ্মা প্রজাপতি। মানুষ-প্রকৃতি, পশু-পাখি, নদী-সমুদ্র–সবই ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছেন। তিনি আদি পিতা। তার সৃষ্ট মানুষ অমৃতের পুত্র নামে পরিচিত; শুধু মহীথর ছাড়া। না হলে কেন সর্বশক্তিমান ব্রহ্মা সামান্য মল অতিক্রম করে যেতে পারেন না? পারেন না এ জন্য যে, মল টানার অস্পৃশ্য সন্তানটিকে জন্ম দেয়ার গভীর অভিলাষটি তখন তাঁর ভেতর তোলপাড় করেছে। তাই তিনি নোংরা বস্তু থেকে নোংরা সন্তানটির উদ্ভব ঘটালেন। কিন্তু অমৃতের পুত্রদের থেকে এ সন্তানটিকে অভিশপ্ত করে রাখলেন মহর্ষি ব্রহ্মা। এ ব্যাপারে তাঁর ভেতর কোন অনুকম্পা কিংবা উদার স্নেহ জাগল না। প্রকৃতপক্ষে, এ কাহিনী তৈরি করেছিলেন পুরোহিত সম্প্রদায়। অনুশাসন নির্মাণের প্রবল ক্ষমতা ছিল তাদের হাতে। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে তারা মানুষের যুক্তিকে অগ্রাহ্য করেছিল। শাস্ত্রীয় অনুশাসনের এতই শক্তি ছিল যে, একসময় সমাজের মানুষ পুরোহিতের মিথ্যা বাণীকে বিশ্বাস করতে শুরু করেন। মিথ্যা পরাক্রমশালী সত্য হয়ে মানুষের মনে জায়গা করে নেয় (জলদাস, ২০১২, পৃষ্ঠা ২৯-৩১)।

মল-মূত্র পরিষ্কার করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে নিযুক্ত করতে পুরোহিত গোষ্ঠী শাস্ত্রবাণীকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন এবং সার্থক হন। শাস্ত্রমতে ঈশ্বরের নির্দেশেই মল-আবর্জনা টানার কাজটি করতে হচ্ছে তাঁদের।

এবার মনুসংহিতার প্রসঙ্গটি তুলে ধরা হল। মনু ঋষির লেখা বিধানই মনুসংহিতা। মনুসংহিতায় লেখা রয়েছে, ছোট জাতদের শহরে বা ভদ্র মানুষদের কাছাকাছি বাস করার অধিকার নেই। তারা থাকবে শহর বা গ্রামের বাইরে। গাছের তলা, শ্মশান, পাহাড় বা বন তাদের বাস করার উপযুক্ত স্থান। মনুর বিধানে আরও বলা রয়েছে, ব্রাহ্মণের ঘর থাকবে পাঁচটা, ক্ষত্রিয়দের ঘর হবে চারটা। বৈশ্যরা তিনটা ঘর বাঁধতে পারবেন। কিন্তু শূদ্রদের ঘরের সংখ্যা হবে দুটো, ইচ্ছে করলে বা সামর্থ থাকলেও দুটোর বেশি ঘরের মালিক তারা হতে পারবে না (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১২)।

বর্তমানে মনুর বিধান বিলুপ্ত প্রায় একটি গ্রন্থ। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার আলোকে বলা চলে এ বিধান একেবারেই অচল। কিন্তু আমার গবেষণায় দেখা গেছে, অন্ত্যজদের জন্য কলোনি বানাবার সময় সিটি

কর্পোরেশন মনুর বিধান মনে রেখেছেন। কর্পোরেশন মনুর লিখে যাওয়া নিয়ম মেনে অন্ত্যজদের প্রত্যেক পরিবারের জন্য দুটি করে ঘর বরাদ্দ করেছেন। একটি শোবার ঘর, আরেকটি ছোট্ট রান্নাঘর।

4.3 kgY ms¯‹Z Ges e¶Y¨ ms¯‹Z : ভারতীয় উপমহাদেশে বহুকাল যাবৎ দুটো সাংস্কৃতিক ধারা পরিলক্ষিত হয়। তার একটি হল শ্রমণ সংস্কতি, অন্যটি হল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি। শ্রমণ সংস্কৃতি উপমহাদেশের আদি সনাতন মৌলিক সংস্কৃতি, যা উপমহাদেশীয়। প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে সংশিষ্ট। অন্যটি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি যা আর্যরা বাইরে থেকে নিয়ে এসেছে। এ দুটি সংস্কৃতির মধ্যে আকাশ জমিন পার্থক্য। শ্রমণ সংস্কৃতি অন্তর্মূখী, আর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বহির্মূখী।

মানুষের সমমর্যাদা, সমানাধিকার, ভ্রাতৃত্ববোধ, নিরপেক্ষতা, ন্যায় ও সত্য চর্চার সমন্বিত রূপের অনুশীলন ও প্রয়োগই শ্রমণ সংস্কৃতি। আর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে জাতিভেদ, বর্ণভেদ, শাসক-শোষকের ভূমিকারই প্রাধান্য। শ্রমণ সংস্কৃতি নিবৃত্তি প্রধান যেখানে ত্যাগই বড় কথা। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রবৃত্তি প্রধান যেখানে ভোগ-বিলাসই মূল কথা (জলদাস, ২০১২)। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি আর্যরাই এ উপমহাদেশে নিয়ে এসেছিল যা ঐতিহাসিকদের মতানুসারে সাড়ে তিন থেকে চার হাজার বছরের অধিক পুরনো নয়। শাসক ও শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে গিয়ে আর্যরা শ্রমণ সংস্কৃতিকে কোনঠাসা করে রেখেছিলেন। আর্য ব্যবস্থাপকেরা জনতাকে দাসে পরিণত করার জন্য চতুবর্ণ বিধান রচনা করলেন। এ অবস্থায় শোষিত, বঞ্চিত, অসহায় মানুষ হারিয়ে যাওয়া শ্রমণ সংস্কৃতির মধ্যেই তাদের মুক্তির দিশা খুঁজে পেল।

এ সময় উপমহাদেশে আর্বিভূত হলেন দুই মহাপুরুষ। জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ। দুই মহাপুরুষই সুপ্রাচীন শ্রমণ সংস্কৃতি তথা সনাতন সন্ত ধর্মকে নতুনভাবে পরিমার্জিত রূপে উপস্থাপন করলেন। সমাজে অহিংস, সত্য, সমতা, শান্তি স্থাপিত হল। তবে শ্রমণ সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসারের ফলে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। ঐতিহাসিক কাহিনী মতে, সম্রাট অশোকের নাতির ছেলে খুব অল্প বয়স্ক পুত্র বৃহদ্রথকে রেখে অকালে মারা যান। তার সেনাপতি পুষ্যমিত্র সুঙ্গ, যিনি ছিলেন একজন আর্য ব্রাহ্মণ্য, তিনি শিশুপুত্র বৃহদ্রথের হয়ে রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। একদিন পুষ্যমিত্র সুঙ্গ রাজদরবারে সবার সামনে বৃহদ্রথের শিরচ্ছেদ করেন এবং নিজেকে

রাজা বলে ঘোষণা করেন। অতঃপর তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে রাজধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন। এর ফলে মূলনিবাসী যারা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাদের উপর নেমে আসে অত্যাচারের খড়্গ। শাস্ত্রীয় বিধানের নামে মানুষের উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, বিবাহ, জীবন-মরণ, গর্ভধারণ-জন্ম অর্থ্যাৎ জীবনের নানা ক্রিয়ার উপর ধর্মীয় আইন বাস্তবায়ন করা হয়। যা সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, রাজনৈতিক অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ব্রাহ্মণ্যবাদের জাত-বর্ণের যাতাকলে পিষ্ট শান্তিকামী মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে। নিজ দেশে নিজ ধর্মে তারা পরবাসী হয়ে যায়।

এ অবস্থায় শ্রমণ সংস্কৃতি তথা সন্তধর্মের পুনর্জাগরণে পাঁচজন ভক্তিবাদী ও মানবতাবাদী মহাত্মার আগমন ঘটে। তারা হলেন সন্তগুরু রবিদাসজী মহারাজ, সন্তগুরু কবিরজী, সন্তগুরু নানকজী, গুরু দাদু দয়ালজী ও চৈতন্য মহাপ্রভু।

এ বিপ্লবী মহাপুরুষগণ ব্রাহ্মণ্যবাদের বর্ণভেদ, জাতিভেদ, অধিকারভেদের প্রাচীর ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় নাম পাওয়া যায় পথপ্রদর্শক জ্যোতিরাও ফুলে, গুরুচাঁদ ঠাকুর, পেরিয়ার রামস্বামী, স্বামী শিবনারায়ণ, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের। এ সমাজসংস্কারগণ বিশ্বাস করতেন বেদ ঈশ্বর সৃষ্ট নয়। বেদ মানুষেরই রচিত। বেদই সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করেছে।

তাদেরই উত্তরসূরী আরেকজন সার্থক অনুগামী মহাবিপ্লবী বাবাসাহেব ড. ভিমরাও আম্বেদকার। আম্বেদকারের নাম উপমহাদেশের অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার মানুষের কাছে একটি মুক্তিমন্ত্র। তাদের কাছে তিনি কেবলমাত্র ভারতের সংবিধান প্রণেতা এবং বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী মাত্র নন। তিনি উপমহাদেশের কোটি কোটি লাঞ্ছিত, দলিত ও মানবিক অধিকারহীন জনগণের মুক্তিদাতা। সারা বিশ্বে মানবাধিকার যোদ্ধা নামে পরিচিত।

একটা সময় তিনি ভারতবর্ষে জল-অচল আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ভারতের জল-অচল সম্প্রদায় ছিল অত্যন্ত নিচু জাতের। যাদব ঠাকুরদের পুকুর বা কুয়ার জল স্পর্শ করার কোন অধিকার

ছিল না জল-অচল জাতের। ফলে জল স্পর্শ করার অধিকারের জন্য আন্দোলন শুরু হয় যার নেতৃত্বে ছিলেন আম্বেদকার। এতসব মানবতাবাদী কাজের জন্য আম্বেদরকারকে তুলনা করা হয় স্পার্টাকাস ও সক্রেটিসের সঙ্গে। দীর্ঘ সময় একাই লড়াই করে গেছেন তিনি। মননশীল রাজনৈতিক সাহিত্যেও তার অবদান ব্যাপক। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছে যেমন শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা বা মহাদেব অত্যন্ত সম্মানের ঠিক তেমনি নিম্নবর্ণের হিন্দুদের কাছে আম্বেদকার পরম পূজনীয় (জলদাস, ২০১২)।

4.4 AšÍ¨R‡'i †ckvi BwZnvm : অন্ত্যজদের পেশার ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে আমি আমার প্রাথমিক উৎস ও দ্বিতীয় উৎস উভয়ের উপরই নির্ভর করেছি। এগুলো আমি বার বার পরীক্ষা/পুনঃপরীক্ষা করেছি। অন্ত্যজদের পেশার ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে সত্যেন সেনের শহরের ইতিকথা (২০০৬) বই থেকে জানা যায়, ১৯২০ সালে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সংগ্রহের জন্য দুটি প্রধান কেন্দ্র ছিল ভারতের কানপুর এবং প্রাক্তন মাদ্রাজ (বর্তমানে ভারতের উত্তর প্রদেশ)। তারা ছিলেন তেলেগু ও হিন্দী ভাষী। তাছাড়া এলাহাবাদ, চারগাঁও প্রভৃতি জায়গা থেকেও তাদের সংগ্রহ করে আনা হত। উল্লেখ্য, ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের বিশাখাপত্তম থেকে অনেক তেলেগুভাষী অন্ত্যজ এবং উত্তর প্রদেশে অবস্থিত কানপুরের হামিরবাগ থেকে অনেক হিন্দীভাষী অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার মানুষ এদেশে নিয়ে আসা হয় (সেন, ২০০৬)। তেলেগু আর হিন্দীভাষী অন্ত্যজ সম্প্রদায়টি পূর্ববঙ্গে এসে সাংস্কৃতিক সংকটে যেমন পড়েছে তেমনি পড়েছে ভাষা সংকটে। কাশ্যপ বর্ণের সনাতনধর্মী এ শ্রেণীপেশার মানুষেরা শুধু দু'বেলা পেটের খাবার জোগাড় করার জন্য নিদারুণ অবহেলা ও অপমান সয়ে গেছে বছরের পর বছর।

পরবর্তীতে ১৯৪০ এর দশকে যুদ্ধ, অভাব, দেশভাগ ইত্যাদি কারণে দেশীয় বাঙালী লোকজন হালকা ধরনের পরিচ্ছন্নতার কাজে আসেন। ১৯৪৩ সালে অসংখ্য বাঙালী মুসলিম অফিস-আদালত পরিষ্কার করার কাজে নিয়োজিত হন। ১৯৭৪ সালে বন্যা পরবর্তী দুর্ভিক্ষের কারণে আরও বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি এ পেশায় নিয়োজিত হন (দলিত বার্তা; ২০০৯)।

অন্ত্যজদের পেশার ইতিহাস জানতে পারি গণকটুলী হরিজন কলোনিতে বসবাসরত অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার প্রবীণদের সঙ্গে কথা বলে যারা বংশ পরম্পরায় এ ঘেরাটোপের মধ্যে বসবাস করছেন। বেশ কয়েকটি পেশার মধ্যে ঝাড়ুদারি অন্ত্যজদের আদি পেশা। সে সূত্রে তারা নিজেদেরকে জাত

সুইপার বলে দাবি করেন। কিন্তু কিভাবে অন্ত্যজরা এ পেশার সঙ্গে যুক্ত হলেন, সেটি একটি যন্ত্রণাদায়ক ইতিহাস। তাদের জোর করে এ পেশায় নামানো হয়। আদিতে তারা এ পেশায় ছিলেন না। ব্রিটিশরা তখন ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করতেন। ভারতবর্ষের নিম্নবর্ণের মানুষগুলোর তখন অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে দিন কাটছিল। ব্রিটিশ কনজারভেন্সি ইন্সপেক্টরগণ তখন ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের ডেকে এনে এ কথা বলেন যে, তাদের ভাল কাজ দেয়া হবে। তারা অন্ত্যজদের আরও প্রলোভন দেন যে, ভাল চাকরির পাশাপাশি অসুস্থ হলে বিনা পয়সায় চিকিৎসা দেয়া হবে, থাকার ঘর দেয়া হবে, আরও অনেক সুবিধা দেয়া হবে। এ প্রস্তাবে তখন নিম্নবর্ণের বেশ কিছু হিন্দু সাড়া দেন এবং এলাকা ছেড়ে চলে এসে সরকারি চাকরি নেন। সরকার তখন তাদের দূর দূরান্তের বিভিন্ন এলাকায় পাঠিয়ে দেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের চাকরি, থাকার ঘর, চিকিৎসা সবকিছুই দেয়া হয় কিন্তু তাদের বলা হয় মলমূত্র ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে, অফিস ও রাস্তাঘাট ঝাড়ু দিতে হবে।

অন্ত্যজরা এসব কাজ করতে রাজি না হলে তাদের ওপর শুরু হয় নানা ধরনের অত্যাচার ও নির্যাতন। তারা তখন সরকারের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ আনেন এবং কাজ দেয়ার কথা বলে ডেকে নিয়ে মানসম্মত কাজ না দেয়ার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। নানা নির্যাতন ও মারধরেও অন্ত্যজরা এ কাজ করতে রাজি না হলে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের লোকেরা একটি জরুরি বৈঠকে বসেন। পরবর্তী সময়ে জানা গেছে, ওই বৈঠকে একটি গোপন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্তটি হল যেভাবেই হোক, অন্ত্যজদের একটি অংশকে কাজ করতে রাজি করাতে হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আন্দোলনরত অন্ত্যজদের মধ্য থেকে কিছু লোককে ডেকে নিয়ে সরকার তাদের নানাভাবে হাত করার চেষ্টা করে এবং বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন দেখায়। কৌশলে কিছু সংখ্যক অন্ত্যজ শ্রেণী-পেশার নেতাকে হাত করতেও সক্ষম হয় সরকার। প্রবীণ অন্ত্যজরা বলেন, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার প্রতিদিনই ওই লোভী নেতাদের মদের বোতল দিয়ে মদ্যপানে আসক্তি করে তোলেন। মাতাল অবস্থায় ওইসব অন্ত্যজদের কাজ থেকে তারা কাজ আদায় করিয়ে নেন। এভাবে চলতে থাকে দিনের পর দিন। ওই অন্ত্যজ নেতারা তখন তাদের গোত্রের অন্যান্যদের ঝাড়ুদারি পেশায় যোগ দিয়ে সরকারের দেয়া সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে বলেন। এভাবে ব্রিটিশের দেয়া ঝাড়ুদারি চাকরিতে অন্ত্যজদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। আস্তে আস্তে অন্ত্যজরাও নিজেদেরকে ঝাড়ুদারি পেশার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে থাকেন। এক পর্যায়ে ঝাড়ু

দারি পেশাই হয়ে উঠে অন্ত্যজদের জীবন-জীবিকার মূল পেশা। ফলে ব্রিটিশরা যখন উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন, তখনও অন্ত্যজরা ওই পেশাতেই রয়ে যান। ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পর ভারত ও পাকিস্তান নামে যখন দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়, অন্ত্যজরা তখনও এ পেশাকেই আকড়ে ধরে থাকেন। আর পাকিস্তান ভাগ হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হলে অন্ত্যজরা ঝাড়ুদারি পেশাকে তাদের আদি জাত পেশা হিসেবে ঘোষণা করেন। এখনও এ পেশা আকড়ে ধরেই তাদের অধিকাংশের জীবন চলে (জলদাস, ২০১২)।

অন্ত্যজদের ঝাড়ুদারি পেশার বাইরে অন্যান্য কাজগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, মর্গে লাশ কাটা, জুতা সেলাই করা, শ্মশানে লাশ দাহের কাজ করা ইত্যাদি। অনেক অন্ত্যজ নারী বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে মালিশওয়ালীর কাজ করেন। অন্ত্যজদের পেশাগত পার্থক্য নির্ধারিত হয় মূলত অভ্যন্তরীণ শ্রেণী বিভক্তি বা ভাগ অনুযায়ী। তবে এ দেশের হরিজন কলোনিগুলোর বেশিরভাগ অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার মানুষই মলমূত্র পরিষ্কার এবং ঝাড়ুদারি পেশার সঙ্গে জড়িত।

ঢাকা শহরের হরিজন কলোনিগুলোতে যে সব অন্ত্যজ ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করার কাজে জড়িত তাদের একটি বড় কর্মক্ষেত্র হল ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, অফিস আদালত ইত্যাদি। তাছাড়া তারা বাসাবাড়ি পরিষ্কার করার কাজও করে থাকেন। আগে দেখা যেত, তারা সামনে দিয়ে ঘরে ঢুকতেন না, পেছন দিয়ে ঢুকতেন। ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করে চলে যেতেন।

বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের উপদেষ্টা সুবল চন্দ্র দাস জানান, সরকারি বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানেই সাধারণত একটি ঝাড়ুদার পদ থাকে। সেগুলোতে কাজ করেন বহু অন্ত্যজ। সময়ের পরিবর্তন ও অগ্রগতির সঙ্গে এদেশের বহু মানুষ তাদের পেশা বদল করলেও অন্ত্যজ শ্রেণী-পেশার মানুষ এখনও তাদের আদি পেশা ছাড়তে পারেননি। তারা এ পেশা আর ছাড়তেও চান না। অন্ত্যজদের মতে, এটি তাদের আদি ও জাত পেশা। তাদের পূর্বপুরুষ এ পেশা থেকে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। সুতরাং তারাও এ পেশাতেই জীবিকা নির্বাহ করতে চান।

4.5 mvgwRK mPjZvq AšÍ¨Riv : সামাজিক সচলতা মূলত সামাজিক গতিশীলতা। অবশ্য ভারতীয় সাবলটার্ন স্টাডিজের চিন্তা প্রকরণে সামাজিক সচলতা কিছুটা ভিন্ন মাত্রা পায়। প্রথমত, বিষয়টি জটিল। দ্বিতীয়ত, বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির পঠন পাঠনে অভ্যস্ত শ্রেণীর কাছে ঈষৎ দুর্বোধ্যও। তবে উপমহাদেশে সামাজিক সচলতার ইতিহাসে নিহিত বাস্তবতা তথা পরিবর্তনশীল সামাজিক সম্পর্ক প্রতিনিয়ত ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। ফলে সমাজের নানা পর্যায় ও বিবর্তনের মধ্যেই অন্ত্যজ শ্রেণীর সচলতার সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে অবিরাম। ধারণা করা হয়, এ সংগ্রাম চলমান থাকলে বর্তমান জাতি-শ্রেণী আধিপত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে অন্ত্যজরা আগামী দিনে আরো বড় সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে।

সাম্যবাদী দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামসির দর্শনে যে সাবলটার্ন ইতিহাসের সূত্রপাত সেটি নিঃসন্দেহে অন্ত্যজদের বিবর্তনশীল সামাজিক বিন্যাস এবং সামাজিক সম্পর্কের জটিল ও বহুস্তর বাস্তবতার অনেক কাছাকাছি এনে ব্যাখ্যা করে। আমরা জানি, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সাবলটার্ন শব্দটির প্রথম প্রয়োগ পাওয়া যায় গ্রামসির রচনায়। কখনও প্রলেতারিয়েত, কখনও বা আরও ব্যাপক সাধারণ অর্থেও শব্দটি ব্যবহার করেন তিনি। ভারতীয় উপমহাদেশের মত একটি কৃষিপ্রধান দেশে বুর্জোয়া বিপ্লব পাশ্চাত্যের মত নয় এবং এখানে ধনতন্ত্রের বিকাশ তেমন সুষমভাবে ঘটেনি। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রধান বৈশিষ্ট হল, এখানে শ্রেণীবৈষম্যের জটিল স্তরভেদ দেখতে পাওয়া যায়।

তাছাড়া পরিবর্তশীল সমাজব্যবস্থা জাতিপ্রথাকে প্রভাবিত করে, ফলে জাতিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের রীতিনীতিতে অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। এর সঙ্গে রয়েছে নানান ধরণের ভাবধারার অনুকরণ প্রবণতা। যেমন : সাংস্কৃতিক অনুকরণ, পশ্চিমি ভাবধারার অনুকরণ অথবা ধর্ম নিরপেক্ষ রীতিনীতি অবলম্বন (শ্রীনিবাস, ১৯৬৩)।

সামাজিক সচলতায় চলমান জাতিভেদ ব্যবস্থায় নিম্নজাতির আরও মর্যাদা দাবি করার একটি প্রক্রিয়া অনেকদিন ধরেই প্রচলিত ছিল, শ্রীনিবাস যার নাম দিয়েছিলেন সংস্কৃতায়ন। এ প্রক্রিয়ায় দেখা যেত যে, অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার মানুষ উচ্চজাতির আচার-ব্যবহার আদব কায়দা অনুকরণ করে দাবি জানাচ্ছে, আমরা মোটেই নিকৃষ্ট নই, ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে আমরা উচ্চ জাতিরই সমান। এ দাবির ক্ষেত্রে

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুক্ত থাকত নবলব্ধ আর্থিক বা রাজনৈতিক ক্ষমতা যার জোরে সে জাতি বা তার নেতৃত্বস্থানীয় অংশ, ধর্মাচারের ক্ষেত্রে অধিকতর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রায় সব অঞ্চলেই বিভিন্ন জাতির এ ধরণের সংস্কৃতায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। তার মধ্যে অন্ত্যজরাও অর্ন্তভুক্ত। তবে দাবি জানালেই যে সে দাবি উচ্চ জাতির সদস্যরা মেনে নিতেন তা নয়। অবশ্য বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে অন্ত্যজরা আর বলেন না যে, ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে আমরা উচ্চতর জাতির সমান। বরং বলেন, আমরা পৃথক, অবদমিত, বঞ্চিত ও দলিত।

আমার গবেষণা ক্ষেত্রে গিয়ে দেখেছি, অন্ত্যজরা তাদের অনেকক্ষেত্রে আলাদা রাখতে চাইছেন। এখানে তাদের প্রাপ্তির ব্যাপারটি কাজ করেছে। জাতিভিত্তিক দাবি জানানোর ক্ষেত্রে উচ্চতর জাতির সঙ্গে ধর্মীয় বা আচরণগত মিল নয় বরং তাদের সঙ্গে সামাজিক পার্থক্য প্রতিষ্ঠা করেই নিম্নতর জাতি তথা অন্ত্যজরা রাষ্ট্রের কাছে পৃথক সুযোগ সুবিধা প্রত্যাশা করছেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সেটি ভারতবর্ষে যেমন, বাংলাদেশেও তেমন।

এদিকে আধুনিক ইউরোপীয়ান সমাজের ছাঁচে রাষ্ট্রীয় সংবিধানে উদারনৈতিক কাঠামো গ্রহণ করা সত্ত্বেও ভারতীয় উপমহাদেশে আজকের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা জাতিবৈষম্যের বাস্তবতা স্বীকার করে নিয়েছে। নীতি হিসেবে স্থির করেছে যে নিম্নতর জাতি যেহেতু সমাজের বৈষম্য ও অত্যাচারের শিকার, তার স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং তাকে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দেয়ার জন্য বিশেষ আইনগত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। অর্থ্যাৎ সমাজে সচলতা প্রয়োজন।

তার মধ্যে জাতিগত আন্দোলনের ক্ষেত্রে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কিছু দাবি উঠেছে। উল্লেখ্য, জাতি নিয়ে যেসব দাবির কথা উঠে এসেছে তাতে সামাজিক গতিধারায় ধর্মীয় আচার-আচরণের কথা খুব কমই রয়েছে। প্রায় সব দাবিই সরাসরি অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ইস্যুতে তোলা হয়েছে। এটাও খুব বড় ধরনের সামাজিক পট পরিবর্তন।

এদিকে আমাদের সমাজের ক্রম গতিধারায় ধর্মীয় আচারের ক্ষেত্রে জাতিবৈষম্যের অনেক প্রথাই ইতোমধ্যে পাল্টে গেছে। সমাজ বর্ণভিত্তিকের পরিবর্তে হয়ে উঠেছে শ্রেণীভিত্তিক। খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছেদ, পূজা-অর্চনা, ছোঁয়াছুঁয়ি ইত্যাদি দৈনন্দিন ব্যাপারে জাতিবৈষম্যের বহু চিরাচরিত নিয়ম আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে যাচ্ছে। তা নিয়ে প্রকাশ্যে বিরোধ যে খুব একটা হয় তাও মনে হয় না। বিরোধ হয় অনেক বেশি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য নিয়ে।

এখানে বলা প্রয়োজন, ইউরোপীয়ান সমাজের মূল দ্বন্দ্বের ভেতর একটা ঐতিহাসিক গতি কাজ করেছে। সেটিও কিন্তু এসেছে সামাজিক সচলতার ফলেই। যে সচলতা একটি ঐতিহাসিক বিবর্তনের জন্মদান করেছে। তারই ফলে ইউরোপে এসেছে শ্রেণী সংঘাত, এসেছে পুঁজিবাদ, যুক্তিবাদ ও আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা।

যদিও পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকদের মতানুসারে, সে অর্থে ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজের কোন নিজস্ব ঐতিহাসিক গতি নেই। একই সমাজকাঠামোকে ক্রমান্বয়ে জিইয়ে রাখা ছাড়া ভারতীয় সমাজে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তেমন কোন পরিবর্তনই হয়নি। এ কারণেই ইউরোপীয়ান পন্ডিতরা বলতেন, ইউরোপের ঔপনিবেশ হওয়াটা ছিল প্রাচ্যের ভবিতব্য। একটা জড়, অনড়, সনাতন প্রথাবদ্ধ সমাজকে উজ্জীবিত করা, তাকে গতিশীল করাই ঔপনিবেশবাদের ঐতিহাসিক কর্তব্য। যে অসাধ্য কাজটি ভারতীয় উপমহাদেশে কেবল ব্রিটিশরাই করতে পেরেছেন বলে তারা দাবি করেন। অর্থ্যাৎ ইউরোপ যদি ভারতীয় সমাজকে একবারে গোড়া ধরে নাড়িয়ে না দিত, তবে ভারতীয় সমাজ কখনোই বিকশিত হতে পারত না (চট্টোপাধ্যায়, ২০১২)।

কিন্তু একথা চরম সত্য, ভারতীয় সমাজ কাঠামোর মূল যুক্তি, তার মৌলিক ভাবধারা এতই স্বতন্ত্র এবং ইউরোপের আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে তার অসঙ্গতি এতই প্রবল যে, সবরকম পরিবর্তনই একান্তভাবে সীমিত থাকতে বাধ্য হয়েছিল। ইউরোপের সংস্পর্শে এসে আধুনিক যুক্তিবাদী চিন্তার বীজ ভারতের জমিতে প্রোথিত হলেও তা থেকে যা জন্মেছে তা ইউরোপীয়ান আধুনিকতার বিকারমাত্র। সামাজিক সচলতায় অন্ত্যজদের ক্ষেত্রেও সে কথা প্রযোজ্য।

এক্ষেত্রে ফরাসি দার্শনিক লুই দুমোঁ এ দুই ভাবধারার মৌলিক বিপরীত্যের কথাটা খুব জোর দিয়ে বলেছেন। আধুনিক ইউরোপের সমাজকাঠামো যে আদর্শের উপর দাড়িয়ে রয়েছে তার মূল কথা ছিল সাম্য। সেই আদর্শ বলে যে সমাজ তৈরি হয়েছে তার আগে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন ব্যক্তি। ব্যক্তিরাই চুক্তির মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্র তৈরি করেছে। রাষ্ট্রের চোখে সব ব্যক্তিই সমান, আইনের চোখে সবার সমান অধিকার। এ প্রাথমিক সাম্যের ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চলে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির প্রতিযোগিতা। তাতে কেউ বেশি পায়, কেউ কম পায়। তা থেকেই সৃষ্টি হয় শ্রেণী, শ্রেণী-বৈষম্য। শ্রেণীগত যে অসাম্য তার মূলেও রয়েছে সে সাম্যের আদর্শ। ফলে শ্রেণীগত দাবি প্রতিষ্ঠিত হয় সাম্যের আদর্শের নজির দেখিয়েই। ভারতীয় সমাজেও অসাম্য রয়েছে, কিন্তু আদর্শের ক্ষেত্রেই সে অসাম্যকে স্বীকার করে নেয় অর্থ্যাৎ গোড়াতেই মেনে নেয়, সব মানুষ সমান নয়। জন্ম থেকেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠী পৃথক। এ পার্থক্য সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, প্রকৃতিপ্রদত্ত। উচ্চস্থান বজায় রাখতে হলে ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীকে প্রমাণ করতে হবে যে, উচ্চস্থানে বসাটা তার ন্যায্য প্রাপ্য। অন্যদের দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে হবে যে সামগ্রিক সামাজিক প্রয়োজনেই উচ্চ-নীচের তারতম্যতা জরুরি।

এ প্রসঙ্গে দুঁমো বলেন, জাতিভেদ প্রথাকে কেন্দ্র করে যে মূল্যবোধ ভারতীয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা এমনই এক আদর্শ প্রচার করতে সক্ষম হয়েছিল যে, সেখানে উচ্চ-নীচের বৈষম্য ক্ষমতার বৈষম্য নয়। সামগ্রিক সমাজের প্রয়োজনেই উচ্চনীচের প্রভেদটা জরুরি, কারণ নিম্নজাতি যেমন উচ্চের সাহায্য ছাড়া বাচঁতে পারবে না, উচ্চও তেমনি নীচ জাতির সাহায্য ছাড়া বাঁচতে পারবে না। পৃথক পৃথক জনগোষ্ঠীর মধ্যে উচ্চ-নীচের সম্পর্ক নির্দিষ্ট করেই ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথা সবাইকে এক করেছে। এ একের ধারণাটা সবাই স্বীকারও করে নিয়েছে। আদর্শ হিসেবে সবাই এটা গ্রহণ করেছে কারণ প্রত্যেকেরই এখানে নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। কাউকে বাদ দিয়ে অন্যেরা চলতে পারেন না (চট্টোপাধ্যায়, ২০১২)। এভাবেই এগিয়ে চলেছে পুরো ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক গতিধারা।

দুঁমোর মতে, এ আদর্শ আধুনিক ইউরোপীয়ান ভাবধারার সম্পূর্ণ বিপরীত, কারণ এখানে ব্যক্তি নেই, আছে জাতি। সাম্য নেই, আছে উচ্চনীচের ভেদ। প্রতিযোগিতা নেই, আছে পারস্পরিক নির্ভরতা। নিম্নজাতি শুধু উচ্চের আদর্শ অনুকরণ করে মর্যাদাবৃদ্ধির চেষ্ট করেছে, এটাই একমাত্র সত্য নয়। উচ্চের ধর্মাদর্শকেই সে বহু বছর অমান্য করেছে, বর্জন করেছে, বিপরীত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার দাবি

জানিয়েছে। সামাজিক গতিধারায় বস্তুত ভারতবর্ষের ধর্মীয় ইতিহাসে, তার নানা পরিবর্তন, বিরোধ, নতুন ধর্মের প্রবর্তন, শাস্ত্রীয় ধর্ম আর লোকধর্মের নানা সংমিশ্রণের মধ্যে উচ্চনীচের পারস্পরিক ক্ষমতার বিরোধ দেখতে পাওয়া যায়। যদিও ভারতীয় সমাজে মৌলিক দ্বন্দ্বের চরিত্র এখনও আমাদের কাছে অস্পষ্ট। ইউরোপীয়ান সমাজের বিবর্তনের ছকের সঙ্গে তা মেলে না বলে ইউরোপীয়ান পন্ডিতরা বলে দিয়েছেন, এ দেশের নিজস্ব কোন ঐতিহাসিক গতিই নেই। যতটুকু গতি এসেছে, তা ঔপনিবেশিক শাসনের ফল। যদিও আমরা সেকথা মানতে রাজি না। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য ইউরোপীয়ান ছকেই আমরা রেনেসাঁস, রিফর্মেশন, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদের ইতিহাস খুঁজেছি। খুঁজতে গিয়ে প্রতিপদেই দেখেছি, যে প্রক্রিয়ায় যা ফল প্রত্যাশিত ছিল, তা হয়নি। সবই কম বেশি অন্য ধারায় প্রবাহিত।

অবশ্য সাম্প্রতিককালে দুমোঁর কাজের তীব্র সমালোচনা করেন দীপঙ্কর গুপ্ত (১৯৯১), নিকোলাস ডার্কস্ (২০০১), রনাল্ড ইন্ডেন (১৯৭৫) এবং অর্জুন আপ্পাদুরাই (২০১৩)।

দুমোঁ দাবি করেন জাতি ব্যবস্থার সার বস্তু হল ক্রমোচ্চতা, দুমোঁ যার মধ্যে আপেক্ষিক শুচিতার ভিত্তিতে সমস্ত জাতিগুলোকে শ্রেণীবদ্ধ করেন। এ বক্তব্য বিশেষ ভাবে সমালোচনা করেছেন দীপঙ্কর গুপ্ত। গুপ্তের যুক্তি হল, পৃথক ও বিযুক্ত সমকূলে বিবাহ করা জাতিগুলোর মধ্যে বিভাজনেই আছে জাতিব্যবস্থার সারবস্তু। ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিন্যাস জাতিব্যবস্থার ভিত্তি নয়, এমনকি যেখানে এ বিন্যাস দেখতে পাওয়া যায় সেখানেও শুচি/অশুচির মানদন্ডে তা নির্ধারিত হয় না।

গুপ্ত আরও বলেন, জাতিব্যবস্থার আদর্শবাদ একটি নয়, অনেকগুলো। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি সাধারণ নীতি থাকলেও এগুলো প্রকাশিত হয় বিভিন্নরূপে, কখনও পরস্পরবিরোধী ভাবেও। দুমোঁ জাতিব্যবস্থার সারবস্তু সংস্থাপিত করেন শুচি/অশুচির দ্বন্দ্বের দ্বারা বর্ণিত ধর্মীয় ভূমির উপর এবং দাবি করেন যে ধর্মের শক্তি নির্দিষ্ট অংশগুলোকে (পৃথক জাতিগুলোকে) এক পূর্ণতার মধ্যে সংহত করেন। এ দাবি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দুমোঁকে আরেকটি গভীর সমস্যার সমাধান করতে হয় অর্থ্যাৎ জাতিব্যবস্থার প্রতিষ্ঠান ও রীতিনীতির আদর্শের সঙ্গে তার বাস্তবতার মিল দেখাতে হয়। এ সমস্যার উত্থানের কারণ জাতির বাস্তব পদ বিভিন্ন স্থানে ও কালে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পায় এবং এ বিশেষ

বিন্যাসের সঙ্গে যে শুচি/অশুচির নিরিখে নির্দিষ্ট আদর্শ বিন্যাসের মিল খুঁজে পাওয়া যাবে তারও কোন কথা নেই। দুমোঁ এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন ধর্ম ও অর্থের মধ্যে একটা চূড়ান্ত পার্থক্য করে এবং দাবি করেন প্রথমটি দ্বিতীয়টির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এর ফলে জাতিগুলোর পদ নির্ধারণে ক্ষমতার ভূমিকা খুব সামান্য বলে তিনি মনে করেন বিশেষ করে ক্রমোচ্চ বিন্যাসে পরিমাণভিত্তিক মান নির্ধারণে শুচি/অশুচির মানদণ্ডকেই তিনি একমাত্র পরিবর্তনীয় উপাদান বলে মনে করেন যা পদ মর্যাদার ক্রমপর্যায়ের দুই চরম সীমাকে নির্দিষ্ট করে, আর ক্ষমতা সংক্রান্ত উপাদানে শুধু মধ্যবর্তী স্তরের পদবিন্যাসই নির্ধারিত হয়।

ডার্কস (১৯৮৭) সম্প্রতি দেখিয়েছেন যে, প্রাক ঔপনিবেশিক দক্ষিণ ভারতে জাতিগুলোর পদমর্যাদা শুচি/অশুচির ধর্মীয় মানদন্ডে নির্ধারিত হত না-এ মর্যাদা নির্ভর করত রাজপদ থেকে তাদের দূরত্বের উপর। ডার্কস ঔপনিবেশিকবাদ, ইতিহাস, রাজনীতি ইত্যাদির উপর জোর দিয়েছেন যা দুমোঁ হতে ভিন্ন। অন্য আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে গেইল ওমভেট (১৯৯৪) দেখানোর চেষ্টা করেন, ভারতে জাতিভিত্তিক সামন্তব্যবস্থা টিকে ছিল ব্রাহ্মণদের সঙ্গে রাষ্ট্রক্ষমতার সহযোগিতার ফলে। ঔপনিবেশিক সরকার এ কাঠামোটিকে গ্রহণ করে, পরিবর্তন করে এবং অনেকাংশে শক্তিশালী করে নিজেদের কাজে লাগায়। ডার্কসের কাছ থেকে কয়েকটি শব্দ ধার করে আমরা জাতিব্যবস্থাকে বর্ণনা করতে পারি, ক্ষমতার সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি বলে। ডার্কসের মতে ঔপনিবেশিক ইতিহাস উপেক্ষা করার কারণে রাজনীতি ও ধর্মের আলাদাকরণ খোদ ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপের কারণে কিনা, সেটি দুমোঁ বুঝতে পারেননি।

ইন্ডেন ও আপ্পাদুরাইয়ের বক্তব্য হচ্ছে, দুমোঁর বক্তব্য সমাজবৈজ্ঞানিক কিংবা নৃবৈজ্ঞানিক হওয়ার চাইতে অনেক বেশি ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সের ঐতিহ্যের ফলশ্রুতি। এ ডিসকোর্স ভারতকে একটি অতীন্দ্রিয়বাদী এবং সেকেলে পরিসর হিসেবে দাঁড় করায়।

তাছাড়া দুঁমোই বলেন, জাতিভেদ প্রথাকে কেন্দ্র করে যে মূল্যবোধ ভারতীয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা এমনই এক আদর্শ প্রচার করতে সক্ষম হয়েছিল যে, সেখানে উচ্চ-নীচের বৈষম্য ক্ষমতার বৈষম্য নয়। সামগ্রিক সমাজের প্রয়োজনেই উচ্চ-নীচের প্রভেদটা জরুরি, কারণ নিম্নজাতি যেমন উচ্চের সাহায্য ছাড়া বাচঁতে পারবে না, উচ্চও তেমনি নীচ জাতির সাহায্য ছাড়া বাঁচতে পারবে না। পৃথক

পৃথক জনগোষ্ঠীর মধ্যে উচ্চনীচের সম্পর্ক নির্দিষ্ট করেই ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথা সবাইকে এক করেছে। প্রত্যেকেরই এখানে নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। কাউকে বাদ দিয়ে অন্যেরা চলতে পারেন না। মূলত দুঁমোর এ বক্তব্য অন্ত্যজ সমাজ গবেষণায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

সাবলটার্নদের মধ্যে সামাজিক সচলতা একটি জটিল প্রক্রিয়া। সাবলটার্ন শব্দটি কেবলমাত্র প্রলেতারিয়েতের প্রতিশব্দ নয়। তাতে ধরা পড়ে এমন কিছু ধারণা যা অন্য কোন শব্দ দিয়ে ধরা যায় না। সাবলটার্ন শব্দটি গ্রামসি ব্যবহার করেছেন অন্তত দুটি অর্থে। একটি অর্থে এটি সরাসরি প্রলেতারিয়েত শব্দের প্রতিশব্দ। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় সাবলটার্ন শ্রেণী হল শ্রমিক শ্রেণী।

সামাজিক ক্ষমতার এক বিশেষ ধরনের বিন্যাস ও প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী শোষিত ও শাসিত হয়। এ বিন্যাসে সাবলটার্ন শ্রমিকশ্রেণীর বিপরীত মেরুতে অবস্থিত একটি হেজেমনিক শ্রেণী অর্থ্যাৎ পুঁজির মালিক বুর্জোয়া শ্রেণী। শ্রমিক শ্রেণী/বুর্জোয়া শ্রেণী, এ বিশেষ অর্থে সাবলটার্ন/হেজেমনিক শ্রেণীর সামাজিক সম্পর্কের বিষয়ে গ্রামসির বিশ্লেষণ আধুনিক মার্কসবাদী আলোচনায় এক বিশিষ্ট অবদান। এ বিশ্লেষণে গ্রামসি গুরুত্ব দিয়েছেন সে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটির উপর যার মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণী কেবল শাসনতন্ত্রে তার প্রভুত্বই প্রতিষ্ঠা করে না, সৃষ্টি করে এক সার্বিক সামাজিক কর্তৃত্ব বা হেজেমনি। কেবল রাষ্ট্রীয় শক্তিকে অবলম্বন করে এ সার্বিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। সংস্কৃতি ও ভাবদর্শের জগতে এক আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে হেজেমনিক বুর্জোয়া শ্রেণী তার শাসনের নৈতিক ভিত্তি হিসেবে সাবলটার্ন শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকে সামাজিক সম্মতিও আদায় করে।

কিন্তু গ্রামসির লেখায় আরও সাধারণ অর্থেও সাবলটার্ন কথাটা ব্যবহৃত হয়েছে। কেবল পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় নয়, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অন্যান্য ঐতিহাসিক পর্বেও সাবলটার্ন শ্রেণীর কথা বলেছেন গ্রামসি। স্পষ্টতই এখানে সাবলটার্ন এর অর্থ শিল্পশ্রমিক শ্রেণী নয় বরং যেকোন শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ক্ষমতাবিন্যাসের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা উঠে এসেছে এখানে। এ বিন্যাসকে গ্রামসি দেখেছেন একটি সামাজিক সম্পর্কের প্রক্রিয়ার ফল হিসেবে, যার এক মেরুতে অবস্থিত প্রভুত্বের অধিকারী ডমিন্যান্ট শ্রেণী, অপর মেরুতে যারা অধীন সেই সাবলটার্ন শ্রেণী।

অবশ্য গ্রামসি বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব, শাসন এ শব্দগুলোকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ফলে কর্তৃত্বের অধিকার, প্রভুত্বের অধিকার, শাসনের অধিকার-এ ধারণাগুলোর মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি না গ্রামসির আলোচনা থেকে তা বোঝা কষ্টকর হয়ে দাড়ায়।

আমাদের মনে রাখতে হবে, শাসকশ্রেণীর ধর্মবিন্যাস আর তাদের অধীন শ্রেণীগুলোর (যেমন : অন্ত্যজ) ধর্মবিন্যাস প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে এক হলেও তাদের আকার ও চরিত্র পৃথক, এমনকি বিরোধী রূপও ধারণ করতে পারে। এ বিরুদ্ধতা থেকেই জন্ম নেয় সাবলটার্ন শ্রেণীর প্রতিরোধ যা বহু সমাজে ক্ষমতাশালী শ্রেণীগুলোকে বিপদে ফেলতে সক্ষম হয়।

এক্ষেত্রে আবার প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে মিশেল ফুকো। ফুকোর বিশ্লেষণ থেকে ক্ষমতার তিনটি পৃথক মাত্রা বেরিয়ে আসে। যথা : সার্বভৌমত্ব, অনুশাসন আর গর্ভনমেন্টালিটি। সার্বভৌমত্ব হল সনাতন রাষ্ট্রক্ষমতা, যার এক বা একাধিক নির্দিষ্ট কেন্দ্র থাকে, যার প্রতিভূ রাজা অথবা আইনানুগভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন রাষ্ট্রপ্রধান। এ সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করা হয় কোনও নির্দিষ্ট ভূখন্ডের ওপর অথবা কোনও নির্দিষ্ট প্রজামন্ডলীর ওপর। যেমন : অন্ত্যজ।

অনুশাসনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনায় ফুকো আধুনিক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত করেছেন হাসপাতাল, কারাগার, স্কুল, কারখানা-এসব প্রতিষ্ঠানকে, যেখানে মানুষকে রাখা হয় নজরবন্দী অবস্থায়। অসুস্থ মানুষের শারীরিক ক্রিয়াকর্ম কেমন চলছে তা পরীক্ষার জন্য তাকে নজরবন্দী রাখা হয় হাসপাতালে, আইনভঙ্গকারীকে নজরাধীন রাখা হয় কারাগারে, ছাত্রকে স্কুলে, শ্রমিককে কারখানায়, অন্ত্যজদের নির্দিষ্ট ঘেরাটোপে। অর্থ্যাৎ কলোনিতে।

নজরবন্দী করতে পারলে তবেই তাকে অনুশাসনবদ্ধ করা যায়। এ শাসন শারীরিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে না, তা কাজ করে মানুষের চেতনায়। অনুশাসনের উদ্দেশ্য সার্বভৌম শক্তির ভয় দেখানো নয়, তার উদ্দেশ্য স্বশাসন। আধুনিক সমাজের নাগরিক নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করেই বুঝে নিবে যে অসুস্থ হলে তার ডাক্তারের নজরাধীন হওয়া উচিৎ-না হলে তার শাস্তি হবে, এ জন্য নয়, হলে তার

নিজের মঙ্গল, সেজন্য। একই যুক্তিতে সে সময় মতো কারখানায় কাজ করতে যাবে, তার ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠাবে। এ হল আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা, যেখানে ক্ষমতার আদর্শ সার্বভৌম নয়, বরং কেন্দ্রহীন সর্বব্যাপী এক অনুশাসনতন্ত্র। যেখানে সবাই স্বাধীন, অথচ স্বাধীন ভাবেই তারা অনুশাসনের শৃঙ্খল পরতে রাজি। সার্বভৌম ক্ষমতা অনুশাসনতন্ত্রে স্বশাসনের আদর্শের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে মিলে গেছে। সে ক্ষমতা সবচেয়ে প্রবল ভাবে কার্যকর যা নিজেকে স্বশাসনের চেহারায় উপস্থিত করতে পারে।

হাসপাতালে বা স্কুলে নজরবন্দী হলে আমরা মনে করি না আমাদের স্বাধীনতা খর্ব করা হল। আমরা ভাবি আমাদের মঙ্গলের জন্যই আমাদের স্বাস্থ্য বা বিদ্যাবুদ্ধির যথাযথ পরীক্ষা বা মূল্যায়ন হওয়া উচিৎ। আবার যে ডাক্তার বা শিক্ষক আমাদের পরীক্ষা করছেন, তিনিও কোন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে তা করছেন, এমন নয়। তাঁর ওপরেও নজরদারি আছে। তিনিও ঠিক করে কাজ করছেন কিনা তার পরীক্ষা হচ্ছে। এভাবে গোটা সমাজের অনুশাসন ব্যবস্থায় কোনও কেন্দ্রবিন্দু নেই যেখানে এসে সব নজরদারি শেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকেই কোনও না কোন ভাবে নজরবন্দী। এ হল আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্র যার প্রধান অস্ত্র সার্বভৌমত্ব নয়, অনুশাসন।

ক্ষমতার তৃতীয় একটি মাত্রা রয়েছে ফুকো যার নাম দিয়েছেন গর্ভনমেন্টালিটি। ফুকো শব্দটি তৈরি করেছেন গর্ভনমেন্ট শব্দের অর্থ থেকে এটিকে পৃথক করতে। আমরা তাই একে শুধু প্রশাসন না বলে বলতে পারি প্রশাসনিকতা। এর মূল কথা হল, ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে জনগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য। কোনও সাধারণ অর্থে কল্যাণ নয়, বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর বিশেষ বিশেষ কল্যাণের জন্য (চট্টোপাধ্যায়, ২০১২)। যেমন : জনগোষ্ঠীর কোন বিশেষ অংশের রোজগার বাড়ানো প্রয়োজন, অন্য কোন অংশের কর্মসংস্থান দরকার, কোন কোন গোষ্ঠীর জন্মনিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। এসব সরকারি নীতি কার্যকর করতে গেলে ক্ষমতা প্রয়োগ করা দরকার।

কিন্তু ক্ষমতা প্রয়োগ মানে সার্বভৌম শক্তি প্রয়োগ নয় বরং জনগোষ্ঠীর এক-এক অংশের ব্যবহার, প্রবণতা, চাহিদা, স্বার্থ ইত্যাদি যাচাই করে তার মাধ্যমে জনকল্যাণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। যেমন : কোনও জনগোষ্ঠীকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বাসস্থান সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গায়ের

জোর না খাটিয়ে আর্থিক উৎসাহ দেয়া বা আর্থিক অন্তরায় সৃষ্টি করা। যে পন্থাটি বর্তমানে আদি অন্ত্যজদের পুরানো কলোনি থেকে সরানোর জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের উদারনৈতিক মানবতাবাদী বর্ণনার এক চরম সমালোচনা পাওয়া যায় ফুকোর আলোচনায়। এ সমালোচনা তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শকেও ক্ষমা করেনি কারণ সে রাষ্ট্রেরও আদর্শ জনকল্যাণের নামে অনুশাসন ও প্রশাসনিক ক্ষমতাতন্ত্রের জাল বিস্তার করা।

এদিক থেকে গ্রামসি অনেক বেশি আশাবাদী ছিলেন। গ্রামসির সমস্ত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল পার্টি-শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক পার্টি, যা এ অখন্ড যুক্তিসিদ্ধ সমাজচেতনাকে বহন করবে। ফ্যাসিস্ট শাসনের চরমতম অন্ধকারের মধ্যেও কারাগারে বসে তিনি বৈপ্লবিক বিকল্পের পথ সন্ধান করেছেন।

পূর্ববর্তী মার্কসবাদীদের সঙ্গে গ্রামসির তফাৎ এখানেই যে, এ পার্টির ধারণায় গ্রামসি অনেক জটিলতা মানতে রাজি ছিলেন। তিনি মানতে রাজি ছিলেন যে, উন্নত সমাজ চেতনা না থাকলেও তথাকথিত ধর্মান্ধ কৃষক শোষণের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হতে পারে। পার্টির কাছে তার আবেদন ছিল এই যে, শ্রমিকশ্রেণী এ তথাকথিত পশ্চাদপদ কৃষককে অবজ্ঞা না করে বা দূরে সরিয়ে না দিয়ে বোঝার চেষ্টা করুক যে, কৃষক চেতনায় অথবা নিম্নশ্রেণীর লোকসংস্কৃতিতে প্রতিরোধের সূত্রগুলো কোথায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্রামসির চিন্তায় গোটা সমাজকে নেতৃত্ব দিতে পারে এমন একটি সংগঠিত সমাজচৈতণ্যের ভূমিকা অপরিহার্য থেকে গেছে। এ সমাজচৈতন্যকেই ফুকো বলছেন, আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্রের চালিকাশক্তি।

cÂg Aa¨vq

ïwP-AïwPi eZgvb i/c

5.1 fviZxq mgvRe¨e¯'vq ïwP-AïwPi MfxiZv : ভারতীয় উপমহাদেশে অন্যান্য আদি জনগোষ্ঠীর সমাজগুলোর ন্যায় ঋগ্বেদীয় আর্য সমাজের মধ্যে শ্রেণী-বিভাজন প্রখর ছিল না। ক্রমে ক্রমে পুরোহিত, সমর নায়ক, কৃষক এবং বিভিন্ন হস্তশিল্পে নিযুক্ত কারুশিল্পীদের কতগুলো সামাজিক কর্মবিভাজন হল। তাদের মধ্যে মর্যাদাভেদ ছিল-কিন্তু সামাজিক শ্রেণীভেদ প্রখরতর হয়নি। কিন্তু খাদ্য উৎপাদনে উদ্বৃত্ত সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কেরও পরিবর্তন ঘটল এবং ক্রমে শ্রেণীবিন্যাস একটা সুস্পষ্ট রূপ পেতে লাগল।

একথা চরম সত্য, আর্যরা বহু সংখ্যায় দলে দলে ভারতে প্রবেশ করেছিল। কালক্রমে শত্রুপক্ষের জনগোষ্ঠীর সঙ্গেও তাদের মিলন ঘটেছিল। কিন্তু এ বিরাট সংখ্যক মানবগোষ্ঠীর মধ্যে যোদ্ধা ও পুরোহিতরা ছিলেন সমাজের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। আবার পরবর্তী পর্যায়ে আর্যদের অধিকাংশই অর্ধদাসের পর্যায়ে পরিণত হল। এ নিম্নপর্যায়ের মানুষরাই খাদ্য উৎপাদন বা পশুপালনে লিপ্ত ছিলেন। যোদ্ধা বা পুরোহিতদের পক্ষে শেষ পর্যন্ত এ সমস্ত উৎপাদনমূলক কর্মে ব্যাপৃত থাকা সম্ভব হয়নি। ফলে অপরের শ্রমে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত ভোগী হয়ে পড়লেন তারা। সমাজে শুরু হল শ্রেণীবিভাজনের প্রক্রিয়া। উল্লেখ্য, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষ সূক্ত সমাজের এ শ্রেণী-বিভাজনের পর্বেই রচিত হয়। পুরুষ সুক্তে শ্রেণীর কথা বলা হয়নি কিন্তু বর্ণের কথা বলা হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এখানে বর্ণ ও শ্রেণী প্রায় সমার্থক হয়ে দাড়িয়েছে। পুরুষ সুক্তে উল্লেখিত বর্ণ এবং আধুনিক সমাজের শ্রেণী অনেকটা সমার্থকই ছিল। এখানে অন্ত্যজদের চিহ্নিত করা হয়েছিল সমাজের তিন উচ্চবর্ণের মানুষদের সেবার ভারপ্রাপ্ত শ্রমনির্ভর একটা সামাজিক শ্রেণী হিসেবে (সেন, ২০১০)।

বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে অন্ত্যজদের মূলত সেবকশ্রেণী হিসেবেই চিহ্নিত হতে দেখা যায়। সেবকশ্রেণী রূপে অন্ত্যজদের কাজকর্মেরও কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে। মনে করা হত, অন্ত্যজরা ছিলেন কঠোর শ্রমের প্রতিভূ। তারা ছিলেন শ্রমিক ও বিভিন্ন হস্তশিল্পী। বিভিন্ন ব্রাহ্মণ ধর্মগ্রন্থে পুরোহিত ও রাজণ্যদের আরও ক্ষমতাশালী করার জন্য যে বিস্তৃত যজ্ঞের বিধান প্রদান করা হয় তার ফলে সমাজে ধর্মাচরণ সম্পর্কিত বিষয়ে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং

রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে ক্ষত্রিয় বা রাজণ্যদের শ্রেষ্ঠত্ব আরও প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর্য ঋষিরাও তাঁদের বিধানের দ্বারা জাতিভেদ প্রথাকে সুনির্দিষ্ট করে দেন মানুষের জন্ম ও ধর্মাচরণের ভিত্তিতে। বশিষ্ঠের এ শিক্ষা অনুযায়ী ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাচরণ বেদসিদ্ধ হলেও অন্ত্যজদের কোনরকম ধর্মাচরণ এক অর্থে নিষিদ্ধ ছিল। কে কোন জাতে জন্মগ্রহণ করবে তা সুনির্দিষ্ট হয় তার পূর্বজন্মের কৃতকর্মের দ্বারা। সুকর্মের অধিকারীরা উচ্চ জাতে যথা ব্রাক্ষণ বা ক্ষত্রিয় জাতে জন্মগ্রহণ করেন, আর দুষ্কর্মের অধিকারীরা নিচু জাতে যথা বৈশ্য বা শূদ্র জাতে জন্মগ্রহণ করেন। ফলে জাতিভেদ প্রথার ভিত্তিতেই সমাজের মানুষরা উচ্চ-নীচ ভাগে বিভক্ত হয়। জন্মগ্রহণে জাত পরিবর্তনের কোন বিধান নেই। পেশা পরিবর্তন বা উন্নততর সামাজিক অবস্থান গ্রহণের চেষ্টাও হিন্দুশাস্ত্রে অনুমোদনীয় নয়। এক কথায় সামাজিক অগ্রগতির ধ্যান-ধারণা বা দর্শন হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে অনুপস্থিত। কারণ এ ধরণের কোন পরিবর্তন বা অগ্রগতি জাতিভেদ প্রথা বা যে বিশ্বাসের উপর জাতিভেদ প্রথা প্রতিষ্ঠিত তার সম্পূর্ণ বিরোধী (সেন, ২০১০)।

ধারণা করা হয়, কার্ল মার্কস সুদূর অতীতে ভারতের সমাজজীবনের এ অচলাবস্থাকেই সামাজিক বন্ধ্যাত্ব এবং জাতিভেদ প্রথার কারণ হিসেবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। সীমাবদ্ধ সমাজ, গতানুগতিক জীবনধারা এবং মানুষের ইচ্ছা-আকাঙ্খাকে দমিত রাখা বা সংক্ষেপে সামাজিক প্রগতির সমস্তরূপ বিরুদ্ধতাই জাতিভেদ প্রক্রিয়াকে একটা স্বাভাবিক রূপ দান করার চেষ্টা করে। ভারতীয় সমাজে জাত মানুষের স্বাভাবিক জন্মগত এবং তাই অপরিবর্তনীয়।

বৈশ্যদের প্রধান পেশা ছিল কৃষিকার্য। আর তারা ছিলেন চতুবর্ণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক। পুরোহিতরা ব্রাক্ষণ এবং শাসক ও যোদ্ধারা ক্ষত্রিয় হিসেবে প্রথম ও দ্বিতীয় উচ্চতম বর্ণ হিসেবে মান্যতা পেলেন। আর ভারতের বিজিত আদিবাসী এবং আর্যদের মধ্যে নিঃস্ব অংশ মিলিতভাবে পরিণত হল শ্রমজীবী হিসেবে এবং অন্ত্যজ নামে তারা পরিচিত হলেন। এ বিষয়ে ঐতরেয় ব্রাক্ষণে তীক্ষভাবে বলা হয়েছে : শূদ্রের ন্যায় ...অপরের সেবক, ইচ্ছামতো দূর করে দেবার, ইচ্ছামতো হত্যা করবার যোগ্য।

এভাবেই সুনিদির্ষ্ট পেশা হিসেবে ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয় বা রাজন্য, বৈশ্য ও শূদ্র চতুবর্ণের সৃষ্টি হল। বৈদিক যুগে দাসদের সৃষ্টি এবং তাদের শ্রমে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য পুরোহিত ও যোদ্ধাদের ভোগের মধ্য

দিয়ে ভারতীয় সমাজজীবনে শ্রেণী-বিভাজন এবং তৎসহ জাতিভেদ প্রথার সূচনা করেছিল-সুনির্দিষ্ট পেশার ভিত্তিতে চারপ্রকার বর্ণের ভেদে জাতিভেদ প্রথা প্রখরতর হল। আর এ জাতিভেদ এবং শ্রেণীভেদের মধ্যে পার্থক্যও প্রায় অবলুপ্ত হল এ কারণে যে, শূদ্ররা যারা পরিণত হল সর্বাপেক্ষা নীচ জাতিতে, তারাই আবার ছিল শ্রমজীবী শ্রেণী। তাদের শ্রমে উৎপাদিত উদ্বৃত্তের দ্বারা জীবনধারণ করতেন পুরোহিত বা রাজন্যরা-যারা ছিল উচ্চতর বর্ণের। উচ্চতম বর্ণের দ্বারা নিম্নতম বর্ণের মানুষদের শোষণের দারা শ্রেণীভেদও তীক্ষ হয়ে উঠল। যেমন : প্রাচীন ভারতের মনুর বিধানে আছে, কিন্তু একজন অন্ত্যজ ক্রীত হোক কিংবা অক্রীত হোক, তাকে হীন কাজ করার জন্য বাধ্য করা যেতে পারে, কারণ ব্রাক্ষণের দাসত্ব করবার জন্যই স্বয়ম্ভু কর্তৃক সে সৃষ্টি হয়েছিল। অতএব, হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা বস্তুত উৎপাদন শক্তির অগ্রগতির ফলে সৃষ্ট শ্রেণী বিভাজিত সমাজব্যবস্থারই অপর একটি পরিচয়।

মনু সংহিতায় এবং অন্যান্য শাস্ত্রে আন্তঃবিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ হয়েছে এবং চর্তুবর্ণকে কঠোরতম ভাবে নিশ্ছিদ্র প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করে বংশপরম্পরাগত ভাবে সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় করে রাখা হয়েছে। শুধু শ্রম-বিভাজন নয়, এমনকি ধর্মাচরণের অধিকারও বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশ অনুযায়ী ব্রাক্ষণদের পক্ষে কায়িক শ্রম নিষিদ্ধ। অপরপক্ষে অন্ত্যজদের জন্য একমাত্র কায়িক শ্রমই নির্দেশিত, বৌদ্ধিক ক্রিয়াকর্ম অন্ত্যজদের জন্য নিষিদ্ধ (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১২)।

হিন্দু শাস্ত্রে বর্ণিত চর্তুবর্ণ তদানীন্তন ভারতের আর্থ-সামাজিক ভিতের উপরই শুধু প্রতিষ্ঠিত ছিল না, শাস্ত্রে উল্লেখিত সমস্ত বিধান থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, চর্তুবর্ণ আসলে ছিল আর্থ-সামাজিক ভিত্তিতে বিভক্ত জনগোষ্ঠী। সমাজের উৎপাদন, বিতরণ ও ভোগ ব্যবস্থার বিন্যাস অনুযায়ী চর্তুবর্ণ ছিল শ্রেণী-বিভাজন ব্যবস্থার বিন্যাস অনুযায়ী শ্রমবিভাজনের নির্দেশক। এ চতুবর্ণেরও অনেক বিস্তার হয়েছে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায়। ফলে সামাজিক কাঠামো আরও জটিলতর হয়েছে।

ভারতের এ সামাজিক অচলায়তন নিরবচ্ছিন্নভাবেই বয়ে চলেছে। ঔপনিবেশিক মতানুসারে, ইউরোপীয়ান সমাজেও নিরবচ্ছিন্নতার ধারা ছিল, কিন্তু সময় সময় তা দারুণ আঘাত পেয়ে ভেঙ্গে গেছে। সমাজ পুর্নগঠিত হয়েছে নতুন মূল্যবোধ এবং নতুন বিন্যাস নিয়ে। কিন্তু ভারতের সমাজ

থেকে গেছে বন্ধ্যা এবং ভারতীয় সমাজের জাত-পাতের যন্ত্রণা, এ বন্ধ্যাত্বেরই যন্ত্রণা। এ বন্ধ্যাত্বকে ভাঙবার জন্য কোন বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ভারতে ঘটেনি আধুনিক কালে বা মধ্যযুগে, কেবলমাত্র কিছু সমাজসংস্কারের প্রচেষ্টা ছাড়া।

মূলত ধর্মসুক্তগুলোতে কোন কোন ধরণের কর্মে লিপ্ত হলে মানুষ অপবিত্র হয় তার একটি তালিকা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ মানুষরা কতগুলো শাস্ত্রাচরণের মধ্য দিয়ে বা কিছুদিন অপবিত্রতার জীবনযাপনের পর পুনরায় পবিত্র হওয়ার সুযোগপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে অপবিত্র বা অস্পৃশ্য হিসেবে যাদের নির্দিষ্ট করা হয়েছে তারা কতকগুলো মনুষ্যগোষ্ঠী যারা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্তই অপবিত্র বা অস্পৃশ্য থাকে এবং তাদের পবিত্র বা স্পর্শযোগ্য হওয়ার কোন সুযোগই নেই। প্রথমক্ষেত্রে যেমন : মৃতদেহ স্পর্শ করলে বা বহন করলে মৃতদের স্বামী, স্ত্রী বা পুত্র কন্যাদের ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট সময়কালীন, কোন কুকুরকে স্পর্শ করলে, পরিবারে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের সাময়িক অপবিত্রটা ঘটে এবং শাস্ত্রানুমোদিত আচরণাদি পালনকালে ঐ অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। আবার এ সাময়িক অপবিত্রতার কালও বর্ণভেদে বিভিন্ন।

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় শুচি-অশুচির গভীরতা মানুষের মননে প্রথিত। মানুষ যত নিম্নবর্ণের হবে, আচরণাদিও ততো বৃদ্ধি পাবে (সেন, ২০১০)। যেমন বশিষ্ঠের বিধান অনুযায়ী :

একজন ব্রাহ্মণ (মৃত্যু বা জন্মের কারণে) দশদিন পর অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হবে।
একজন ক্ষত্রিয় পনের দিন পর।
একজন বৈশ্য বিশ দিন পর।
একজন শূদ্র একমাস পর।

কিন্তু কতকগুলো কর্ম নির্দিষ্ট হয়েছে যার ফলে অপবিত্রতা থেকে মানুষ মুক্তি পায় না বরং ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করে। যেমন বশিষ্ঠের মতে : একজন দ্বিজ মৃত্যু বা জন্ম কারণে অপবিত্রতার কালে যদি কোন শূদ্র কর্তৃক প্রদত্ত খাদ্য গ্রহণ করে তবে সে নরকে ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করেন এবং পুনরায় কোন জন্তুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন (সেন, ২০১০)।

অপবিত্রতার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। নারীদের সর্বক্ষেত্রেই পুরুষ অপেক্ষা নিম্নস্তরের মানুষ হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ধরে নেয়া হয়েছে যে নারীরা পাপী। তাই বশিষ্ঠ বলেছেন যে, প্রতিমাসে ঋতুস্রাব নারীদের পাপকে নিঃসৃত করে দেয়। তাই ঋতুকালীন নারীরা তিনরাত্রির জন্য অপবিত্র থাকে। যেহেতু ঋতুকালীন নারীরা অপবিত্র থাকে তাই ঐ সময় নারীদের ক্ষেত্রে সাজসজ্জা করা, স্নান করা, দন্তমাজন করা, অগ্নি স্পর্শ করা, গৃহকর্ম করা, ভূমিতে বিনা অন্যত্র শয়ন করা এমনকি মৃদু হাসিঠাট্টা করাও নিষিদ্ধ।

ঋতুকালীন নারীদের অপবিত্রতারও ব্যাখ্যা দেন বশিষ্ঠ। তাঁর মতে, বেদে বলা হয়েছে, ইন্দ্র যখন ত্বশত্রির ত্রি-মুণ্ড সমন্বিত পুত্র বৃত্রকে হত্যা করেন তখন তিনি পাপ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং তিনি নিজেকে গভীর পাপে কলঙ্কিত বলে মনে করেন। সবাই তাঁর নিন্দা করে বলেন, ওহে, তুমি একজন ব্রাক্ষণের হত্যাকারী! ইন্দ্র তখন স্ত্রীলোকদের কাছে ছুটে যান এবং তাদের বলেন, ব্রাক্ষণ হত্যাজনিত পাপের তৃতীয় অংশ তোমরা বহন কর। তখন স্ত্রীলোকরা জিগ্যেস করেন, তোমার ইচ্ছা পূরণের জন্য আমরা কি লাভ করব? ইন্দ্র বলেন, তোমরা বেছে নাও। নারীরা বলেন, যখন স্বামীরা ইচ্ছা করবে আমরা যেন সঠিক ঋতুতে সন্তান উৎপাদন করতে পারি, আমরা যেন সন্তানের জন্ম হওয়া পর্যন্ত আনন্দ উপভোগ করতে পারি। তিনি বললেন, তাই হবে। তখন তারা পাপের তৃতীয় অংশ নিজেরা গ্রহণ করলেন। ব্রাক্ষণ হত্যার ঐ পাপই প্রতি মাসে ঋতুঃস্রাব হিসেবে নিঃসৃত হয়। এ প্রসঙ্গে বশিষ্ঠ বলেন, ঋতুকালীন কোন নারী কর্তৃক প্রদত্ত খাদ্য ভক্ষণ করো না কারণ ঐ নারী তখন ব্রাক্ষণ হত্যাজড়িত পাপের রূপ ধারণ করেছে। এদিকে ভারতীয় সমাজে শ্রম-বিভাজন ও শ্রেণী সংঘাত বিকাশের একটা বিশেষ স্তরেই অপবিত্রতা ও অস্পৃশ্যতার এ ধরণের তত্ত্ব ও ভাবদর্শের সৃষ্টি হয় পুরোহিততন্ত্রের পক্ষ থেকে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আধুনিককালেও নারীদের এ ঋতুকালীন অশুদ্ধতা সমাজের অনেকেই মেনে চলেছেন। এটি অন্ত্যজদের মধ্যে গবেষণা করতে গিয়েও দেখা গেছে। অন্ত্যজদের বসবাসের কলোনিগুলোতে ঋতুকালীন সময়ে নারীদের কিছুটা সাময়িক অশুদ্ধ বলে বিবেচনা করা হয়। তার ফলে তাদের প্রাত্যহিত কর্মকান্ডে সামান্য হলেও ব্যাঘাত দেখা দেয়।

এদিকে ধর্মসূত্রগুলো এবং অন্যান্য শাস্ত্রকাররা ব্যাখ্যা করেন যে, কোন কোন মানবগোষ্ঠী চিরস্থায়ী ও বংশগতভাবেই অপবিত্র বা অস্পৃশ্য। আবার সাময়িক অপবিত্রতার ক্ষেত্রেও অপবিত্রতার সময়কাল শুধু তার নিজ জাতের উপরই নির্ভরশীল নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চ জাতের মানুষ যদি নিম্নজাতের মৃতদেহকে স্পর্শ করে তবে উচ্চজাতের মৃতদেহ স্পর্শকালে তার যতদিন অপবিত্রতা বজায় থাকবে প্রথমক্ষেত্রে তার থেকেও দীর্ঘতর সময়ব্যাপী তার অপবিত্রতা টিকে থাকবে। অর্থ্যাৎ মৃত্যুতেও জাত-পাত থেকে মুক্তি নেই। নিম্নজাতের মৃতদেহ স্পর্শ করলে বেশিদিন অপবিত্র জীবনযাপন করতে হবে (সেন, ২০১০)।

শুচি-অশুচি প্রসঙ্গে ঋষি গৌতম বলেন, একজন পতিত ব্যক্তিকে, একজন চণ্ডালকে, সন্তানপ্রসবকালীন অশুদ্ধ স্ত্রীলোককে, রজঃস্রাবকালীন অশুদ্ধ স্ত্রীলোককে অথবা কোন মৃতদেহকে এবং মৃতদেহ স্পর্শ করেছে এমন ব্যক্তিকে স্পর্শ করলে কোন ব্যক্তিকে তার পোশাক-পরিচ্ছেদসহ স্নান করে শুদ্ধ হতে হবে। আমাদের নিজেদের জীবনযাত্রায়ও অনেকক্ষেত্রে এ বোধগুলো কাজ করে। এখানে লক্ষ্যনীয়, যে যে ক্ষেত্রে অপবিত্রতার কারণ হয়, তার মধ্যে পতিত ব্যক্তি এবং চণ্ডালকে স্পর্শ করাও যুক্ত হয়েছে। এ পতিতরা বা চণ্ডালরা রজঃস্বলা স্ত্রীলোক বা মৃতদেহ স্পর্শকারী কোন ব্যক্তির মত সাময়িক ভাবে অপবিত্র নয়। তারা স্থায়ী ভাবে এবং জন্মসূত্রে অপবিত্র। এখানে ধর্মসূত্রে কতকগুলো মনুষ্যগোষ্ঠীকে সমগ্রভাবে অপবিত্র বা অস্পৃশ্য হিসেবে ঘোষণা করা হচ্ছে। যেমন : বর্তমানে অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার মানুষ।

এ প্রসঙ্গে ঋষি বৌধায়ন তার বিধানে আরও কঠোরতা প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেন, কোন আসন, কোন বিছানা, কোন যান, কোন জলযান, কোন রাস্তা, কোন তৃণ যদি কোন অন্ত্যজ বা পতিত ব্যক্তি কর্তৃক পৃষ্ট হয় তবে হাওয়ার দ্বারা তা শুদ্ধ হবে। অর্থ্যাৎ পতিতরা বা অন্ত্যজদের স্পর্শ দ্বারা কেবলমাত্র কোন আসন বা যান ইত্যাদিই অপবিত্র হবে না, এমনকি যে রাস্তার উপর দিয়ে বা যে ঘাসের উপর দিয়ে তারা চলাফেরা করবে তাও অপবিত্র হবে।

ঋষি বৌধায়ন আরেক স্থানে বিধান দিয়েছেন, ...একজন পতিত ব্যক্তি, কোন চিতা, কোন কুকুর অথবা কোন চণ্ডালকে স্পর্শ করলে স্নান করতে হবে। এ চরম অমানবিক ও নৃশংস বিধানের কারণ খুঁজতে গেলে বৈদিকোত্তর যুগের সামাজিক প্রক্রিয়া ও উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যেই প্রবেশ করতে হবে। তাই বলা চলে, ভারতীয় সমাজে অস্পৃশ্যতার সূচনা হয়েছিল এ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই শ্রেণী-উৎপীড়নের একটি অঙ্গ হিসেবে। কিন্তু এর প্রকাশটা ছিল ভয়াবহ এবং সাধারণ শ্রেণীশোষণ অপেক্ষা অধিকতর অমানবিক। অনেকে বলার চেষ্ট করেন যে, হরপ্পা যুগে অর্থ্যাৎ সিন্ধু সভ্যতাতেই এ অস্পৃশ্যতার বীজ উপ্ত ছিল। কিন্তু এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না বরং ঐতিহাসিক তথ্য এ সত্যই প্রমাণ করে যে অস্পৃশ্যতা আর্য সমাজেরই সৃষ্টি এবং ক্রমে দ্রাবিড়রাও তা গ্রহণ করে এবং তাকে স্বীকৃতি দেয় (সেন, ২০১০)।

উল্লেখ্য, প্রতিটি জাতিই অপর জাতির বিশেষ ধরণের অভ্যাস, প্রথা ও আচরণসমূহকে কিছুটা অপবিত্র বলে মনে করতেন। সুতরাং তাদের সংস্পর্শে নিজেদের মর্যাদা দূষিত হতে পারে। একই সারির ভিন্ন ভিন্ন জাতি একই ভূমিতে এক সঙ্গে আহার করতে পারে কিন্তু নিম্নতর পদমর্যাদার ব্যক্তিগণ সে জায়গায় প্রবেশের অনুমতি পায় না, তাহলে আহার্য অশুচি হতে পারে।

সাধারণত একটি জাতির অপবিত্রতার মাত্রা পরিমাপ করা হয় সেই জাতির প্রতি ব্রাক্ষণের মনোভাবের উপর। আমি আমার গবেষণায় দেখেছি, কেবলমাত্র ব্রাক্ষণদের মনোভাব নয় বরঞ্চ সমাজের অন্যান্য ধর্মের মানুষের মনোভাবও অন্ত্যদের প্রতি ঘৃণিত। অন্ত্যজদের বসবাসের কলোনিকে তারা ঘৃণার চোখে দেখে। এক্ষেত্রে তাদের মনে চরম ভাবে শুচি-অশুচি বোধ কাজ করে।

5.2 mgv‡R A¯úk¨ AšÍ¨Riv : বর্ত্তমান ভারতে (১৯০৫) স্বামী বিবেকানন্দ অস্পৃশ্যদের বলেছেন ভারতের ভারবাহী পশু ও চলমান শ্বশান। তাঁর অমর বাণী, ভুলিও না---নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাক্ষণ ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। এ কথাগুলো আমাকে ভীষণ ভাবে আলোড়িত করেছে। আমি চেষ্টা করেছি নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে আমার গবেষনাক্ষেত্র গণকটুলীতে অন্ত্যজদের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করতে।

সভ্যতার ক্রম অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে অন্ত্যজরা এগিয়ে যেতে পারেননি। সমাজে অন্ত্যজদের চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া সবকিছু এখনও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। ইচ্ছা করলেই তারা কোথাও গিয়ে খেতে পারেন না কিংবা বসতে পারেন না। অন্ত্যজ ছাড়া সমাজের অন্যান্যরা তাদের অস্পৃশ্য বলে দূরে ঠেলে দেন। অনেক ক্ষেত্রে তাদের তাড়িয়ে দেয়া হয়। সনাতন ধর্মাবলম্বীর অনুসারী এ অন্ত্যজদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের মত একই দেবদেবীর আরাধনা করলেও সব মন্দিরে অবাধ প্রবেশাধিকার অন্ত্যজদের নেই।

উল্লেখ্য, অন্ত্যজরা এদেশের নাগরিক এবং সাংবিধানিক সুবিধার দাবীদার। একজন নাগরিক এদেশে যে সব নাগরিক অধিকার ভোগ করেন একজন অন্ত্যজেরও সে সব অধিকার ভোগ করার নিশ্চয়তা সংবিধানে সংরক্ষিত। কিন্তু সংবিধানে রক্ষিত সে নিশ্চয়তার বাস্তব প্রতিফলন নেই। ঔপনিবেশিক আমলে অন্ত্যজরা যে অনগ্রসর সম্প্রদায় হিসেবে সমাজে পরিচিত ছিলেন, এখনও তারা ঠিক তাই আছেন বলে দাবি করেন।

এদেশের অন্ত্যজদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার আইনগত কোন ব্যাখ্যা অবশ্য কারও কাছে নেই। কেননা এদেশের সংবিধানে ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারের ২৭ নং ধারায় বলা আছে, সব নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। আর সংবিধানের দ্বিতীয়ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির ১৯(১) ধারায় বলা আছে, সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন। আবার ১৯(২) ধারায় বলা আছে, মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমানস্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, অন্ত্যজদের তাদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোন আইনগত ভিত্তি নেই।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের উপদেষ্টা সুবল চন্দ্র দাস ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, সমাজের দৃষ্টিতে কোন জনগোষ্ঠী নোংরা হয়ে চলাফেরা করলে, ময়লা আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ করলে কিংবা ময়লা পোশাক পড়লে অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয় না। অথচ অন্ত্যজদের বেলায় এমনই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি আরও বলেন, অন্ত্যজরা সমাজের অংশ। অন্য সম্প্রদায়ের আর দশজন মানুষের মত স্বাভাবিক চলাফেরা করে সমাজে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে তাদের। কিন্তু বাস্তবে তারা রাষ্ট্রীয় অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

এদিকে অন্ত্যজরা যে অস্পৃশ্য নয়, আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষই সেকথা মানতে নারাজ। তারা মনে করেন, অন্ত্যজরা যখন যা স্পর্শ করেন সঙ্গে সঙ্গে তা শুদ্ধতা হারায়। তাই তাদের সঙ্গে বসা যায় না, খাওয়া যায় না এবং তাদের ছোঁয়া যায় না। আর এক্ষেত্রে সমস্ত বাধ্যবাধকতা থেকে যায় অন্ত্যজদের উপর। তাদের অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের কাছ থেকে সবসময় দূরে থাকতে হয়। সবকিছু দেখে শুনে এমনভাবে চলতে হয় যেন অন্যদের পবিত্রতা নষ্ট না হয়। অর্থাৎ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার অন্ত্যজদের নেই। অথচ আমাদের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারের ৩৬ নং ধারায় বলা আছে, জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেলা, ইহার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে। কিন্তু অন্ত্যজদের বেলায় এ বিধানের কার্যকারিতা নেই।

গণকটুলীর হরিজন কলোনিতে বসবাসকারী রাজিব রবিদাস জানান, যেসব জায়গায় গণমানুষের অবাধ যাতায়াত সেখানে তারা যেতে পারেন না। ক্ষুধা পেলে চাইলেই কোন হোটেলে বসে কিছু খেতে পারেন না। সামাজিকভাবে তাদের ওপর এসব বিধি-নিষেধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অন্ত্যজরা নিচু জাতের মানুষ। তাই হোটেলে আমাদের বসতে দেয়া হয় না। কিছু খেতে হলে হোটেলের বাইরে দাড়িয়ে খেতে হয়। হোটেলের থালাবাসন অন্ত্যজদের ব্যবহারের জন্য নয়। তাই এক কাপ চা খেতে হলেও কাপ সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হয়। দোকানের বাইরে দাড়িয়ে চায়ের জন্য কাপ বাড়িয়ে দিতে হয়। রাজিব বলেন, সমাজে আমরা এতই ঘৃণিত যে, সব জায়গায় বসার অনুমতি নেই। পরিচয় জানলে অন্য সম্প্রদায়ের লোকজন আমাদের তাড়িয়ে দেন।

তবে এ ধরনের আচরণের ব্যতিক্রমও আছে। অন্ত্যজদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত। অনেক অন্ত্যজ ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করার কাজে জড়িত নয়। তারা বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অফিসে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে একত্রে কাজ করছে। আদের আচরণ তথাকথিত অন্ত্যজদের আচরণ থেকে অনেক ভিন্ন। তাদের প্রতি সমাজের মানুষ কিন্তু একই মনোভাব পোষণ করে না।

বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের মহাসচিব নির্মল চন্দ্র দাস জানান, কিছুদিন আগে গণকটুলী হরিজন কলোনির একটি ছেলে আজিমপুরের একটি হোটেলে খেতে বসেছিলেন। সেখানে এক লোক তাকে চিনে ফেললে হোটেলে তাকে খাবার না দিয়ে উঠে চলে যেতে বলা হয়। হোটেলের টেবিল চেয়ার ব্যবহারের অনুমতি তাকে দেয়া হয়নি। শুধু হোটেলে ঢুকতে না দেয়া নয়, অনেক জায়গায় নাপিতরা অন্ত্যজ শ্রেণী-পেশার চুলও কাটেন না। নির্মল ক্ষোভের সঙ্গে আরও বলেন, গাইবান্ধার একটি হোটেলে বানর সঙ্গে করে এক লোককে খেতে দেখেছি। অথচ ওই মুহূর্তে হোটেলে আমাকে বসতে দেয়া হয়নি। অন্ত্যজ বলে হোটেলের লোকজন বাইরে দাড় করিয়ে আমার হাতে খাবার দিয়েছে। দেখলাম বানর সঙ্গে করে খেতে এ সমাজের মানুষের সমস্যা হয় না। কিন্তু অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার মানুষের পাশে বসতে আপত্তি দেখা যায়। সমাজে সবাই আমাদের হাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়; কিন্তু পরিষ্কার হওয়ার পর আমাদের আর মানুষ মনে করেন না। সমাজে পশুর চেয়েও আমরা বেশি ঘৃনিত।

পিএইচ.ডি. গবেষণার অংশ হিসেবে নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আজিমপুর, নীলক্ষেত ও নিউ মার্কেটের কয়েকটি দোকানে অন্ত্যজদের প্রসঙ্গে কথা বলেছি। অন্ত্যজদের খাবারের দোকানে ঢুকতে না দেয়ার কারণ সম্পর্কে নিউ মার্কেটের একটি স্নাক্সের দোকানের কর্মচারী সালাম মিয়া বলেন, অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার কেউ হোটেলে ঢুকলে আর কেউ হোটেলে ঢুকতে চায় না। অন্ত্যজদের পাশে বসিয়ে খেতে দিলে আর কেউ হোটেলে খেতে আসবেন না। ফলে আমাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। সে কারণে অন্ত্যজদের হোটেলের ভেতরে ঢুকতে বা বসতে দেয়া হয় না। তবে থালা-বাসন নিয়ে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে তারা যা কিনতে চান তাই দেয়া হয় বলে তিনি জানান।

আমার গবেষণায় দেখা গেছে, এখানে অন্ত্যজদের কাছ থেকে দূরে থাকার পেছনে কেবল ধর্মীয় বোধই নয় বরং সামাজিক অনেক কারণও দায়ী। এক্ষেত্রে মানুষের মনে শুচি-অশুচির বোধগুলো কাজ করেছে। পুরনো ঢাকার হোটেল ব্যবসায়ী রফিক মিয়া জানান, তার দোকানে অন্ত্যজদের প্রবেশ একেবারেই নিষিদ্ধ। তিনি বলেন, অন্ত্যজরা নিচু জাত। ওদের স্পর্শে জিনিসপত্রের পবিত্রতা নষ্ট হয়। অন্ত্যজরা যে হোটেলে বসেন সেখানে কোন ভদ্রলোক যাননা।

শুধু হোটেল রেস্তোরা নয় অনেক জায়গায় অন্ত্যজরা হিন্দু-মুসলিম কারও বাড়িতে ঢোকার অনুমতি পান না। গণকটুলীর কলোনিগুলোতে Focus Group Discussion (FGD) এর সময় জানা যায়, নিম্নবর্ণের মানুষ হওয়ার কারণে এটি অন্ত্যজদের প্রতি আরেক ধরনের সামাজিক বৈষম্য। তবে এ অবস্থা শহরাঞ্চলের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে বেশি। জানা যায়, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে অন্ত্যজরা কারও সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তার বাড়ির সামনে গিয়ে অপেক্ষা করেন। অনুমতি ছাড়া অন্ত্যজরা ভেতরে ঢুকতে পারেন না। নির্মল বলেন, এমন পরিস্থিতি এখন অনেকটা শিথিল হয়েছে। তবে পুরোপুরি এখনো উঠে যায়নি। তিনি আরও বলেন, একটা সময় ছিল যখন আমরা কারও বাড়িতে গিয়ে বসতে পারতাম না। বাড়িতে গেলেও ঘরের ভেতর ঢোকার অনুমতি ছিল না। হাট-বাজারে ঢোকাও আমাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। সে অবস্থার এখন পরিবর্তন হয়েছে। আমরা এখন অনেকের বাড়িতে যেতে পারছি, বসতে পারছি। তবে সবাই আমাদের সমান চোখে দেখে না। অনেকেই তাড়িয়ে দেন। এ ধরনের আচরণ খুব কষ্ট পেলেও করার কিছু নেই।

বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের উপদেষ্টা সদস্য সুবল চন্দ্র দাসের বাসায় গেলে তাঁর মেয়ে চন্দ্রিমার সঙ্গে কথা হয়। তিনি বলেন, সমাজে আমাদের সঙ্গে যে ধরনের আচরণ করা হয় তেমন আচরণ আর কারও সঙ্গে করা হয় না। অন্ত্যজ বলে আমাদের এখনও অনেক জায়গায় থালার বদলে কলাপাতায় খেতে দেয়া হয়। যে পিঁড়িতে বসতে দেয় সেটি পরে তারা আমাদের কাছে ধুয়ে নেয়। তিনি আরও বলেন, ময়লা আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ করি বলে সমাজে আমরা অস্পৃশ্য, অচ্ছুত, অন্ত্যজ। কিন্তু এর কোন কারণ আমরা খুঁজে পাই না। সমাজের মানুষ কেন আমাদের সঙ্গে এমন আচরণ করেন তা আমরা বুঝি না। কেননা, ময়লা পরিষ্কারের কাজ করি বলে আমরা সবসময় ময়লা গায়ে মেখে বা নোংরা হয়ে থাকি না। সমাজে চলতে হলে কিভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকতে

হয়, আমরা তা বুঝি। তাছাড়া, আমাদের মধ্যে এখন অনেকেই শিক্ষিত। স্কুল, কলেজে লেখাপড়া করেন অনেকে। অন্ত্যজদের মধ্যে অনেকে ঝাড়ু-দারি পেশার সঙ্গেই জড়িত নয়। তাছাড়া ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করেন বলে অন্ত্যজরা আলাদা এ ধারণাও সবাই পোষণ করেন না।

সুবল চন্দ্র দাস বলেন, শুধু ময়লা পরিষ্কার করে বলে অন্ত্যজদের অচ্ছুত ভাবা হয়–একথা ঠিক নয়। মূল কারণ অন্য জায়গায়। অন্ত্যজরা সমাজে অস্পৃশ্য আদিকাল থেকে। বিষয়টি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। আইনগত কোন ব্যাখ্যা না থাকলেও মানুষ এখনও তাদের অস্পৃশ্য মনে করেন। এটি সমাজে বর্ণ ও শ্রেণী প্রথার একটি গুরুত্বপূর্ণ নজির। তবে পেশাগত কারণ যে এর পেছনে কাজ করে না তা নয়। অবশ্যই সেটি একটি কারণ। তিনি আরও বলেন, সমাজ এমন হয়ে গেছে যে আমরা হরিজন বলে আমাদের কোন রুচি থাকতে পারবে না, ঘৃণা-ভালবাসা থাকতে পারবে না। তাই বেঁচে থাকাটাই আমাদের কাছে ভাল থাকা।

অভিজ্ঞতার উদাহরণ দিয়ে বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের মহাসচিব নির্মল বলেন, এখন অন্ত্যজরা আগের তুলনায় অনেক আধুনিক। তারা নিজেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন। কিন্তু বিশ বছর আগেও এমন অবস্থা ছিল না। তখন অন্ত্যজদের কলোনিগুলোতে ঢোকা যেত না দুর্গন্ধের কারণে। ময়লা আবর্জনার মধ্যে অন্ত্যজরা বসবাস করতেন। প্রায় প্রত্যেকেই বাড়িতে শূকর রাখতেন, মদ পান করে মাতাল হয়ে পড়ে থাকতেন। স্বাভাবিক ভাবেই মানুষ তাদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকতেন। এভাবে অন্ত্যজদের সঙ্গে সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের দূরত্ব দিন দিন বেড়েছে। নির্মল আরও বলেন, অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার অনেকেই এখন মদ্যপান করেন না। শূকর পোষাও আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে।

গবেষক হিসেবে গণকটুলীর হরিজন কলোনিগুলোতে গিয়ে অবশ্য কলোনিগুলো খুব অপরিষ্কার দেখতে পাই। তবে নির্মলের কথা অনুযায়ী শূকর পালন এবং মদ কেনা-বেচার প্রবণতা আগের তুলনায় সত্যি অনেক কমে গেছে। কিন্তু তারপরও সমাজে অন্ত্যজদের প্রতি যে নেতিবাচক মনোভাব তা দূর হচ্ছে না। তা চলমান রয়েছে।

অন্ত্যজদের মধ্যে যারা লেখাপড়া করেন, তাদের মধ্যে অনেকে ঝাড়ুদারি পেশার সঙ্গেই জড়িত নয়। তাদের প্রতি অবশ্য সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য লক্ষ্যনীয়। অন্ত্যজরা অস্পৃশ্য বলে যে একটা মিথ প্রচলিত এক্ষেত্রে তা শিথিল। এখানে দারিদ্রতাই মুখ্য বিষয় নয়। এটা একটি মানসিক বিষয়।

কলোনিতে করা Focus Group Discussion (FGD) করতে যেয়ে অন্ত্যজ মহিলাদের কাছ থেকে কিছু সুন্দর কথা বেরিয়ে আসে। তাদের দাবি, অন্ত্যজ নারীরা মায়ের জাত। মা যেমন তার সন্তানকে সব সময় ধুয়ে-মুছে, পরিষ্কার করে কোলে তুলে রাখেন; অন্ত্যজরাও ঠিক তেমনি দেশকে, দেশের মানুষকে সন্তানের মতোই সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন। সন্তানের কাছে মা যেমন কখনও অস্পৃশ্য বা অচ্ছুত হন না; তেমনি অন্ত্যজরাও কখনও অস্পৃশ্য হতে পারেন না।

গণকটুলী হরিজন কলোনির বাসিন্দা বাবু চন্দ্র হাড়ি আক্ষেপ করে বলেন, আমরা ময়লা পরিষ্কার করলেও সবসময় অপরিষ্কার থাকি না। অথচ আমাদের দেখলেই সবাই তাড়িয়ে দেন। সব জায়গা থেকে যদি তাড়িয়ে দেয়া হয় তবে তারা কোথায় যাবেন বলে প্রশ্ন করেন তিনি। বাবু চন্দ্র আরও অভিযোগ করেন, এদেশে হিন্দু-মুসলিম কেউই অন্ত্যজদের কথা ভাবেন না। যদি ভাবতেন তবে অন্ত্যজদের বছরের পর বছর ঘেরাটোপের ভেতর জীবন কাটাতে হত না।

গণকটুলী হরিজন কলোনির বাসিন্দা মালা রাণী দাস। সরকারি অফিসে গেল দশ বছর ধরে ঝাড়ু দারের কাজ করছেন তিনি। অস্পৃশ্যতার বিষয়টিকে তিনি দেখেন চ্যালেঞ্জ হিসেবে। তিনি মনে করেন এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই সমাজে টিকে থাকতে হবে। পেশাগত উত্তরাধিকার ধরে রাখতে হবে। তিনি বলেন, মানুষ আমাদের যতই ঘৃণা করুক; হঠাৎ করে আমরা এ পেশা ছাড়তে পারি না। কেননা, ঝাড়ুদারি পেশা ছেড়ে আমাদের যাওয়ার কোন জায়গা নেই। এ পেশা ছাড়লে আমাদেরকে না খেয়ে থাকতে হবে। সমাজে আমরা এখনও মারাত্মকভাবে উপেক্ষিত। তাই হঠাৎ করে পেশা পরিবর্তনের প্রশ্ন আসছে না।

অন্ত্যজদের সামাজিক প্রেক্ষাপটেও এসেছে অনেক পরিবর্তন। অন্ত্যজদের সামগ্রিক দেখাশোনা ও বিচারকার্যের জন্য সর্দার ব্যবস্থা, মুখ্য, পঞ্চায়েত ইত্যাদি ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এখন আর তা তেমন

ভাবে মানা হয় না। বর্তমানে অন্ত্যজ সমাজে কেবল প্রথা আছে। প্রচলিত সর্দার, মুখ্য ইত্যাদি পদগুলো কালের বিবর্তনে যেন ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে।

লক্ষণীয় বিষয় হল, ওইসব কলোনিগুলো শুরু থেকেই যেন একেকটি বিচ্ছিন্ন এলাকা। গণকটুলীর ঘন লোকবসতির মধ্যে অন্ত্যজ কলোনিগুলোর অবস্থান। কিন্তু সেখানেও যেন সবকিছু থেকে কলোনিগুলো দ্বীপের মত বিচ্ছিন্ন। অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকজন ছাড়া অন্য শ্রেণীর লোকজনদের সেখানে তেমন যাওয়া আসা করতে দেখা যায় না। বিশেষ প্রয়োজন না হলে কেউ সেখানে যান না। কলোনির বাসিন্দাদের সঙ্গে তেমন মেলামেশা করেন না। হরিজন ঐক্য পরিষদের মহাসচিব নির্মল চন্দ্র দাসের বলেন, ব্রিটিশ সরকার অন্ত্যজদের পৃথক গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে ওই ব্যবস্থা করেন। ভদ্রসমাজ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অথচ প্রয়োজনে যেন কাছে পাওয়া যায় এমন জায়গায়। মূলত, ব্রিটিশ আমলে সরকার অন্ত্যজদের ব্যাপারে যেসব পদক্ষেপ হাতে নিয়েছিলেন তার সবগুলোই সফল হয়। ব্রিটিশ শাসকরা অন্ত্যজদের সেই যে ঘেরাটোপে (কলোনিগুলোতে) ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন আজ পর্যন্ত তারা সে ঘেরাটোপ থেকে আর বের হতে পারেননি। গাদাগাদি করে ঘিঞ্জি পরিবেশে বসবাস করছেন।

5.3 wNÄ cwi‡e‡k gvb‡eZi Rxeb-hvcb : অন্ত্যজদের বসবাসের কলোনিগুলোতে গিয়ে দেখা গেছে ঘিঞ্জি পরিবেশে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার মানুষরা। আবাসন সঙ্কট তাদের জন্য একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। দিনের পর দিন তারা কাটিয়ে দিচ্ছেন হরিজন কলোনির নোংরা পরিবেশে। কলোনির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বেড়ে উঠছে শিশুরা। দীর্ঘদিন বসবাসের ফলে অন্ত্যজরা ঘিঞ্জি পরিবেশের সঙ্গেই নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছেন।

গণকটুলী হরিজন কলোনিগুলোতে গিয়ে মাঠকর্মের সময় দেখেছি, কলোনিগুলোতে উপরে ওঠার একটি মাত্র সিঁড়ি। সিঁড়ির দু'দিকে ঘরগুলোর অবস্থান। ঘরগুলোর সামনে দিয়ে চিকন লম্বা বারান্দা চলে গেছে। বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে ঘরগুলোর ভেতরে দেখতে পাওয়া যায়। পর্দা নেই প্রায় কোন ঘরেই। জানালার সংখ্যাও কম। আলো-বাতাসের জন্য সকাল থেকে প্রতিটি ঘরের সামনের দরজা খুলে রাখতে হয়। ঘরের ভেতর পর্দাপ্রথা বলে কিছু নেই কলোনিগুলোতে। সবাই সবার খবর জানেন। প্রতিটি ঘরেই জীর্ণ বিছানা, রংহীন থালা-বাসন, ছালতোলা মেঝে, পলেস্তারা খসানো দেয়াল

চোখে পড়ে। অথচ মেরামতের কোন উদ্যোগ নেই। কলোনিগুলোরও জীর্ণ দশা। বসবাসরত অন্ত্যজরা বলেন, পুরনো বাড়িগুলো আর মেরামতের উপযোগী নেই। মেরামত করতে গেলে সব একসঙ্গে ভেঙ্গে পড়বে।

উল্লেখ্য, বেইলি রোডে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য বরাদ্দকৃত বাড়িগুলোর কাঠামোও একই রকম। কেবল গণকটুলীতে অন্ত্যজদের জন্য যেখানে একটি ঘর বরাদ্দ সেখানে বেইলি রোডের কলোনিগুলোতে কয়েকটি ঘর বরাদ্দ। সেখানেও ঘরগুলোর সামনে দিয়ে লম্বা বারান্দা চলে গেছে।

কলোনিগুলোতে বসবাসরত প্রত্যেক পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ থেকে ১০ জন। সরকার তাদের বসবাসের জন্য পরিবার প্রতি ১০ বর্গফুটের একটি করে ঘর দিয়েছে। সাথে লাগোয়া ছোট্ট একটি রান্না ঘর। ওই ১০ বর্গফুটের ঘরেই গাদাগাদি করে থাকেন একেকটি পরিবার। অনেক ক্ষেত্রে ওই এক ঘরেই বাবা-মা, ছেলে-মেয়ে, ছেলের-বউ, নাতি-নাতনি সবাই এক সঙ্গে ঘুমান। ছেলে বিয়ে করালে অনেক সময় বাবা-মাকে রান্না ঘরে ঢুকে পড়তে হয়। অথবা বারান্দায় খাটিয়া পাততে হয়। তাদের মানুষ বাড়ে, ঘর বাড়ে না।

বেশিরভাগ অন্ত্যজ পরিবারের নিজস্ব শৌচাগার নেই। কলোনিগুলোতে বসবাসরত পরিবারগুলোর জন্য কমন টয়লেট দেখতে পাওয়া যায়। এ শৌচাগারগুলোর বেশিরভাগই দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে। তাছাড়া স্থানীয় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী প্রতিটি ভবনের বেশ কিছু টয়লেটকে তাদের ব্যবসার কাজে ব্যবহার করছেন। এ ব্যবসার মধ্যে রয়েছে মদ বিক্রি, শুকর পালন ইত্যাদি। অনেক পরিবার অবশ্য নিচ খরচায় ঘরের মাঝে শৌচাগার বানিয়েছেন যেটি বর্তমান আবাসন ব্যবস্থায় ইতিবাচক।

বরাদ্দকৃত ঘরগুলোতে কোন গোসলের জায়গা না থাকায় বারান্দাকেই অনেকে স্নানঘর হিসেবে ব্যবহার করছেন। তাছাড়া পানি ব্যবহারের জন্য যে চৌবাচ্চা রয়েছে সেখানে নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ সবাই এক সঙ্গে গোসল করেন এবং প্রয়োজনীয় কাজ করতে বাধ্য হন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রায়শই কলোনিতে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত গ্যাস থাকে না। তাই রান্না-বান্নার কাজে অসুবিধায় পড়তে হয়। তাছাড়া গ্যাসের পাইপ লাইনগুলো দালানের নিচে এতটাই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে যে কয়েকবার পাইপগুলো বিকট শব্দে ভেঙ্গে গিয়ে গ্যাস বের হয়ে গেছে।

কলোনির বিল্ডিং ছাড়াও অসংখ্য টিনের ছাউনি দেয়া ঘর দেখতে পাওয়া যায়। সাক্ষাৎকারে অংশ নেয়া শান্তিবালা বলেন, এখানকার অনেক পরিবার নিজেরাই ঝুপড়ি ঘর তৈরি করেছে। সেখানে ১০ থেকে ১২ জন পর্যন্ত ঘুমায়। রাতের বেলা প্রত্যেক ঘরে গাদাগাদি করে মানুষ শুয়ে থাকে। দিনের বেলা কাজ করতে যায়। যদিও শীত বা গরমের দিনে এখানে সেখানে গিয়ে ঘুমানো যায়; কিন্তু অসুবিধা হয় বর্ষাকালে। বৃষ্টি-বাদলে অনেক সময় সবাইকে বসে রাত কাটাতে হয়। এগুলোর বেশিরভাগই আর ব্যবহারের উপযোগী নয়। বৃষ্টি হলে ঘরে থাকা আর বাইরে থাকা সমান। টিনের ফুটো দিয়ে পানি পড়ে ঘর ভিজিয়ে দেয়।

১০ বর্গফুটের ঘরগুলোর অনেকগুলোতে বয়স্করা সবাই বারান্দায় ঘুমান। আর ছেলে-মেয়ে ও বউরা ঘুমান ঘরের মধ্যে। তাও সবার একসঙ্গে ঘুমানোর সুযোগ হয় না। তারা ঘুমান পালা করে (Shifting Sleeping).

কষ্টের জীবন নিয়ে কলোনিতে বসবাসরত স্বপ্না রাণী দাস বলেন, আমাদের জীবন মানুষের জীবন নয়। আমাদের জাত যেমন তুচ্ছ তেমনি আমাদের জীবনও তুচ্ছ। সবাই আমাদের দেখে ছিঃ ছিঃ করে তাড়িয়ে দেন। দেশে সবার সমস্যা দেখার মানুষ আছে; শুধু অন্ত্যজদের সমস্যা দেখার কেউ নেই। হিন্দু সমাজে আমরা অচ্ছুত। আমাদের ছোঁয়া তো দূরের কথা, আমাদের ছায়া মাড়ালেও অনেকে অপবিত্র হয়ে যান। তাদের দেখাদেখি মুসলমানরাও আমাদের ঘৃণা করেন। মানুষ ভাবেন না, মেথর ভাবেন।

কলোনির বাসিন্দা মানিক চন্দ্র পেশায় ঝাড়ুদার। তিনি বলেন, কলোনির অনেক বাসিন্দাই দারিদ্রের কারণে স্ত্রী-সন্তানদের খেতে দিতে পারেন না। খেতে দিতে না পারায় অনেকের সংসার ভেঙে যাচ্ছে।

অনেকে বিয়ে করে বউ আনতে পারছেন না থাকার ঘর নেই বলে। স্ত্রীকে চিরদিনের মতো শ্বশুরবাড়ি রেখে দিচ্ছেন।

খুপড়ি ঘরগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে সেখানকার বসবাসরত বাসিন্দারা জানান, শুধুমাত্র সরকারি অফিসে ঝাড়ুদারের চাকরি যারা করেন, কেবল তারাই একটি করে ঘর বরাদ্দ পান। আর যারা সরকারি চাকরি করেন না তাদেরকে সরকার থেকে কোন ঘর দেয়া হয় না। তাই নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে অন্ত্যজরা নিজেদের অর্থে ছোট ছোট ঘর তৈরি করে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করেন।

আবাসন সঙ্কট প্রসঙ্গে বসবাসরত অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার শিবু মন্ডল বলেন, আমরা এদেশের নাগরিক। আমাদের ভোটাধিকার রয়েছে। অথচ আমরা এদেশে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারছি না। আমাদের ছেলে-মেয়েদের রাতে ঘুমানোর জায়গা দিতে পারি না। এত কিছুর পরও কলোনির বাইরে গিয়ে বাড়ি করা আমাদের জন্য নিষেধ। চোখ বুজে পশুর মত জীবন কাটাই আমরা। দেশের প্রচলিত আইন আমাদের বেলায় কাজ করে না।

গেল বিশ বছরে অন্ত্যজদের বসবাসের জন্য নির্মিত কলোনিগুলোতে জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলেও আয়তন বাড়েনি একটুও। উলেখ্য, কলোনিতে বিদ্যমান ড্রেনগুলোর কোন ঢাকনা নেই। ড্রেনের মধ্যে ময়লা জমে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া ড্রেন দিয়ে পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থাও এখন আর আগের মত ভাল না। অনেক পরিবারই তাদের রান্নার কাজ করে খোলা ড্রেনের পাশে। অনেকে খাওয়ার কাজটিও করেন ওই ড্রেনের পাশে বসেই। অন্ত্যজরা মনে করেন, যেখানে থাকার জায়গা হয় না, সেখানে রান্নার জন্য আলাদা ঘর আশা করা যায় না।

কলোনিতে বসবাসরত কৃষ্ণা রাণী জানান, তারা বাবা-মা, ভাই-বোন ও কাকা-কাকি মিলে একসঙ্গে থাকেন। সবমিলে তাদের এ যৌথ পরিবারে সদস্য সংখ্যা ৩৫। অথচ তাদের থাকার জন্য রয়েছে ১০ বর্গফুটের মাত্র দুটি ঘর। কৃষ্ণার ভাই শঙ্কর বলেন, তাদের এ বৃহৎ যৌথ পরিবারের জন্য আলাদা কোন শৌচাগার নেই। শৌচাগার ব্যবহারের দরকার হলে অনেকেই ছুটে যান খোলা জায়গায়। শঙ্কর আরও জানান, তার বাবা ও কাকার নামে বরাদ্দ হয়েছিল ওই দু'টি ঘর। তখন তাদের পরিবারে সদস্য

সংখ্যা ছিল আট জন। আর বর্তমানে তাদের পরিবারের লোকসংখ্যা বেড়ে ৩৫ জন হলেও বসবাসের জায়গা বাড়েনি একটুও।

কলোনির বাসিন্দা পরিমল হাড়ি জানান, ভোটাধিকার থাকলেও এদেশে তারা পূর্ণ নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। বর্তমানে কলোনির অনেক বাসিন্দার সামর্থ হয়েছে জমি কিনে আলাদা বাড়ি করে ভালভাবে বসবাস করার। কিন্তু তারপরও তারা তা করতে পারছেন না। অন্ত্যজ শ্রেণীর বলে কেউ তাদের কাছে জমি বিক্রি করেন না। ক্ষোভের সঙ্গে তিনি জানান, তিনি নিজেই একসময় কলোনির বাইরে একটি জমি কিনতে চেয়েছিলেন, দরদাম ঠিক হওয়ার পরও শেষ পর্যন্ত তিনি তা কিনতে পারেননি। জমি বিক্রেতা তার কাছে জমি বিক্রি করেননি। কারণ, অন্ত্যজ শ্রেণীর কোন সদস্যকে প্রতিবেশি না করার জন্য আশেপাশের লোকজন তার ওপর চাপ প্রয়োগ করেছিলেন। জমি কিনতে না পেরে পরিমল হাড়ির আর কলোনির বাইরে বসবাসের সুযোগ হয়নি। বাকি জীবন কলোনিতেই কাটিয়ে দিচ্ছেন। আমার গবেষণায় দেখেছি, এখানে শুচি-অশুচি বিষয়টি প্রকট ভাবে বিদ্যমান। তার সঙ্গে জড়িত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। কারণ অন্ত্যজদের কলোনিগুলোতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনেক ভোট রয়েছে। রাজনৈতিক নেতারাও অন্ত্যজদের একত্রে থাকার মনোভাব পোষণ করেন। কারণ ভোটের সময় আসলেই অন্ত্যজদের অনেককে রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহার করা যায়।

দেশের একজন নাগরিক হিসেবে কি কি অধিকার রয়েছে এবং কি ধরনের অধিকার তার ভোগ করার কথা পরিমল তা বোঝেন না। তিনি বলেন, অন্ত্যজ শ্রেণীর হলেও আমাদের ভোট দেয়ার অধিকার রয়েছে। আর ভোট দেয়ার অধিকার থাকলে সব অধিকার পাওয়ার কথা।

কলোনিগুলোর বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, পরিমলের মত তারা কেউই বসতবাড়ি সংক্রান্ত তাদের অধিকার সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না। তারা শুধু বলেন, কলোনির বাইরে বাড়ি করা তাদের জন্য নিষেধ।

বিষয়টি নিয়ে কথা হয় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী ও মানবাধিকারকর্মী আইরিন জাহানের সঙ্গে। তিনি বলেন, সংবিধানের ৩৬ নং ধারায় দেশের যেকোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপনের

অধিকার প্রত্যেক নাগরিককে দেয়া হয়েছে। (জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেলা, ইহার যেকোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।) অন্ত্যজদের বসবাসে বা বসতি স্থাপনে যদি কেউ বাঁধা দেয় সেটা অবশ্যই সংবিধানের ৩৬ নং ধারার লঙ্ঘন হবে। অন্ত্যজরা এক্ষেত্রে আইনের আশ্রয় নিতে পারবে।

অন্ত্যজ কলোনির বাসিন্দা উজ্জল রবিদাসের পরিবারে সদস্য সংখ্যা ১৬ জন। সবাই মিলে ১০ বর্গফুটের একটি ঘরে থাকেন। উজ্জ্বলের সঙ্গে থাকেন তার মা, দাদা-বৌদি এবং তাদের দু'ভাইয়ের ছেলে-মেয়েরা। পরিবারে শিশুর সংখ্যা ৬ জন। পরিবার থেকে একজন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে চাকরি করার সুবাদে ওই ঘরটি তারা পেয়েছেন। উজ্জ্বল জানান, তাদের এখন একটাই সমস্যা। সেটা হল রাতে ঘুমানোর জায়গার অভাব।

গণকটুলী হরিজন কলোনিতেই জন্ম নিয়েছিলেন বরুণ চন্দ্র দাস। তিনি জানান, তার পরিবারে বর্তমান সদস্য সংখ্যা ছয়জন। বাবা-মাসহ তারা তিন ভাইবোন এবং বরুণের স্ত্রী। মাত্র মাস দুয়েক আগে বরুণ বিয়ে করেন। ১০ বর্গফুটের কক্ষটি তারা পেয়েছেন তার বাবার ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে ঝাড়ু দারের চাকরি করার সুবাদে। কক্ষটির মাঝামাঝি পার্টিশন দিয়ে আলাদা ঘর তৈরি করে সেখানে বউ নিয়ে থাকছেন বরুণ। বাকি অর্ধেকে বাবা, মা এবং বাকি দুই ভাই-বোন থাকেন। মাঝে মাঝে কোন আত্মীয় এলে এর মধ্যেই গাদাগাদি করে থাকতে হয় তাদের। তিনি হতাশ হয়ে বলেন, পেটের চিন্তার চেয়েও বড় চিন্তা বাসস্থানের। আমরা অসহায় এ সমাজ ব্যবস্থার কাছে। এতগুলো মানুষের জন্য একটা মাত্র শোবারঘর। মাঝে মাঝে মনে হয়, অন্ত্যজদের জীবন কোন মানুষের জীবন নয়। আমরা বিনা অপরাধে কয়েদীর জীবন কাটাচ্ছি ঘেরাটোপের ভেতর।

অন্ত্যজ কলোনিগুলোর ঘেরাটোপের মধ্যে কলোনি ছাড়াও অসংখ্য ঝুপড়ি ঘরের কথা আগে লিখেছি। কলোনিতে জায়গা না পাওয়ায় অনেকে নিজ ব্যবস্থাপনায় এ ঝুপড়ি ঘরগুলো তৈরি করে নিয়েছেন। এগুলোর বেশিরভাগই আর ব্যবহারের উপযোগী নেই। বৃষ্টি হলে ঘরে থাকা আর বাইরে থাকা সমান। টিনের ফুটো দিয়ে পানি পড়ে ঘর ভিজিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য

পরিষদের মহাসচিব নির্মল চন্দ্র দাস বলেন, হরিজন সমাজের অনেকের মাথা গোঁজার ঠাইটুকু পর্যন্ত নেই। তারা কেউ রাস্তায় ঘুমায়, কেউ সরকারি ভবনের বারান্দায় শুয়ে রাত কাটায়।

5.4 gv‘K e¨emvq Rwo‡q co‡Qb AšÍ¨Riv : বেকারত্ব, হতাশা, অর্থাভাব ইত্যাদি কারণে অন্ত্যজদের অনেকেই মাদক ব্যবসা শুরু করেছেন। কলোনিগুলোকে ব্যবসার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। অবৈধ এ ব্যবসার সঙ্গে জড়ানো হচ্ছে কলোনিতে বসবাসরত মহিলা ও যুবকদের। অনেক সময় পুলিশের চোখের সামনেই চলে এ ব্যবসা। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, পুলিশ নিয়মিত চাঁদা নিচ্ছে এ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে।

উল্লেখ্য, কলোনিতে মাদক ব্যবসায় অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার অনেক মহিলা জড়িত। তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কলোনিতে বসবাসরত মাদক ব্যবসায়ীর পেছনে থাকেন বড় বড় অ-হরিজন ব্যবসায়ী। অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের সামনে রেখে ওইসব ব্যবসায়ীরা নির্বিঘ্নে চালিয়ে যান অবৈধ ব্যবসা।

কলোনিতে বসবাসরত রাজিব রবিদাস বলেন, অনেকক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু-কিশোরদের দিয়ে মদ, গাঁজা, ফেনসিডিল আনা-নেয়ার কাজ করিয়ে নেয়া হয়। অনেক জায়গায় অন্ত্যজদের নামে মাদক ব্যবসার লাইসেন্স করিয়ে নিয়ে অন্যান্যরা নির্বিঘ্নে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে অন্ত্যজ সম্প্রদায় অনেকটাই পরিস্থিতির শিকার। অন্ত্যজদের মধ্যে বিশাল একটা অংশ অশিক্ষিত ও দরিদ্র। আর সে সুযোগটাই নিচ্ছেন কলোনির বাইরের মাদক ব্যবসায়ীরা। রাজিব আরও বলেন, অন্ত্যজদের অভাব দূর করা গেলে এবং তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছালে মাদকের ছোবল থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখা যাবে। যেসব শিশু পেটের ক্ষুধায় মাদকদ্রব্য বহন করছে, সে শিশুদের খাবার দিলে তারা আর ওই কাজ করবে না।

কলোনির বাসিন্দা চন্দ্রিমা বলেন, মাদক ব্যবসার কারণে কলোনিতে সারাদিন হট্টগোল লেগে থাকে। এ শ্রেণীপেশার মানুষের মধ্যে অনেকেই মদ্যপ। সন্ধ্যায় কাজ শেষে ফিরে তারা স্বল্পদামের মদ পানে

Dhaka University Institutional Repository

অভ্যস্ত। কষ্ট পেলে বা মন খারাপ থাকলে তারা মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করে। কারণ অন্ত্যজদের জীবনের রূঢ় বাস্তবতা ও অপবিত্রতার সঙ্গে ধর্মীয় পবিত্রতা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

গবেষণায় দেখা গেছে, মন্দিরে মা কালীর কাছে অন্ত্যজদের প্রার্থনাগুলোও জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের প্রমাণ। ছেলেদের বেশিরভাগ প্রার্থনার কথাই হচ্ছে, মা আমার বউয়ের যেন ইনকাম বাড়ে, আমার বউ যেন আরেকজনের খপ্পড়ে না পড়ে, অফিসের বড় বাবু যেন আমাকে নেক-নজরে রাখেন ইত্যাদি। মেয়েদের চাহিদার বেশিরভাগই কথাই হচ্ছে, হে মা কালী, তুমি আমার মরদকে বুদ্ধি দাও, সে যেন মদ ছেড়ে দেয়। নিজের টাকা, আমার টাকা, ছেলে মেয়েদের অন্নের টাকা সে যেন মদের পেছনে না উড়ায়, আমাকে যেন প্রতিদিন না পেটায় ইত্যাদি।

মূলত, অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার মানুষের আনন্দ-বেদনার জায়গা মদের আসর। অনেক অন্ত্যজ শ্রেণীর পুরুষের ভাত না খেলেও চলে, কিন্তু মদ না খেলে চলে না। তাই অন্ত্যজদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মিশে রয়েছে এ মদের আসর।

5.5 **The Rites of Passage** ev Ae¯vš Í‡ii AvPvi Ges Aš Í¨R mgvR : মূলত The Rites of Passage বা অবস্থান্তরের আচার সম্পর্কে ধারণা দেন আরনল্ড ভ্যান গেনেপ। এখানে তিনি ব্যাখ্যা করেন যে মানুষের দৈহিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অবস্থানেরও পরিবর্তন ঘটে। এ পদটি ভ্যান গেনেপ তার Rites of Passage নামের বইয়ে ব্যবহার করেন। কোন ব্যক্তির একটি সামাজিক ধাপ থেকে আরেকটি সামাজিক ধাপে উপনীত হওয়াকে অবস্থান্তরের আচার বলে। এক্ষেত্রে ধর্মের একটি ভূমিকা আছে। কারণ ব্যক্তি ও সমাজকে সঙ্কটের মোকাবিলা করতে সহায়তা করাই ধর্মের অন্যতম প্রধান কাজ। যখন কোন ব্যক্তি এক সামাজিক মর্যাদা হতে আরেক সামাজিক মর্যাদায় উপনীত হওয়ার মধ্যবর্তী অবস্থায় পৌছায় তখন প্রায় প্রতিটি সমাজে ধর্মীয় আচার পালিত হয়। যেমন : জন্ম, সাবালক হওয়া, বিয়ে, মৃত্যু ইত্যাদি। সাধারণত এ অবস্থানগত আচারের তিনটি পর্যায় থাকে। এগুলো হল, আলাদাকরণ পর্যায়, দোরগোড়া পর্যায় এবং পুনঃঅন্তর্ভুক্তিকরণ পর্যায়। আলাদাকরণ পর্যায়ে ব্যক্তিকে তার পুরনো মর্যাদা হতে আলাদা করা হয়। এ পর্বের আচার হচ্ছে ব্যক্তিত্বের প্রতীকী রূপ। যেমন : মাথা ন্যাড়া করা কিংবা পুরনো নাম বাতিল করা ইত্যাদি।

দোরগোড়া পর্যায়ে ব্যক্তির অবস্থান হচ্ছে মধ্যবর্তী। অর্থ্যাৎ সে পুরনো পর্যায় অতিক্রম করেছে কিন্তু নতুনটাতে এখনো ঢুকেনি। এ পর্যায়ে অবশ্য অনেক সমাজে ব্যক্তিকে পবিত্র হিসেবে দেখা হয় কারণ মধ্যবর্তী অবস্থা ক্ষমতা ও বিপদের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে ভাবা হয়। তৃতীয় পর্যায়ে ব্যক্তিকে তার নতুন মর্যাদায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ পর্যায়ের আচার ও প্রতীক সাধারণত পুনর্জন্মের সঙ্গে সম্পর্কিত (ভ্যান গেনেপ, ১৯৬০)।

অন্ত্যজদের নিয়ে গবেষণা করতে যেয়ে আমাকে ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শাহীন আহমেদের রাইটস অব প্যাসেজ ও বাংলাদেশের নারী প্রবন্ধটি। এ প্রবন্ধটি ড. হেলালউদ্দিন খান আরেফিন সম্পাদিত বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান (১৯৮৯) বইয়ে প্রকাশিত হয়। নৃবিজ্ঞানের গবেষণায় অবস্থান্তরের আচারের ধারণা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন নৃতাত্তিক সামাজিক গোষ্ঠী সামাজিক সম্পর্কের আলোচনায় আচার (Ritual) এর নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। আমি অন্ত্যজদের নিয়ে গবেষণা করার সময় এ বিষয়টি সবসময় মাথায় রেখেছি।

মূলত মানুষের দৈহিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অবস্থানেরও যে পরিবর্তন ঘটে তা নির্ধারিত হয় সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি দ্বারা। সব আচার-অনুষ্ঠানের ত্রিমুখী ভূমিকা রয়েছে। যথা : বিচ্ছিন্নতা, সংযোজন এবং তৎসহ একটি অর্ন্তবর্তীকালীন অবস্থা। বিষয়টি এমন যে প্রতিটি কাজেরই শুরু, শেষ এবং একটি অর্ন্তবর্তীকালীন অবস্থা রয়েছে। অবস্থান্তরের আচারের মূল উদ্দেশ্য সমাজের ক্ষতিকর অবস্থা হ্রাসের জন্য বিভিন্ন রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের প্রচলন। এ সমস্ত আচারাদি পালনের মাধ্যমে ব্যক্তি শুধুমাত্র এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তরণ করে না বরং এ উত্তরণ বা অন্তবর্তীকালীন অবস্থা ব্যক্তি তথা সমাজের অন্যান্য সদস্যের রক্তের সম্পর্ক, বিয়ে, সম্পত্তির মালিকানা এবং বিভিন্ন প্রকার আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ও মর্যাদার উপর প্রভাব বিস্তার এবং কাঠামোগত পরিবর্তন আনয়ন করে।

আমি আমার গবেষণায় দেখেছি অন্ত্যজ সমাজে কিভাবে সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হয়। আমি দেখেছি আদি অন্ত্যজ ও মুসলমান পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা কিভাবে একই ঘেরাটোপের মধ্যে থেকেও স্বতন্ত্র

আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে জীবনের অবস্থান্তরের আচার অতিক্রম করে। এখানে বিচ্ছিন্নতা, সংযোজন এবং তৎসহ একটি অর্ন্তবর্তীকালীন অবস্থা তিনটি দিকই বিরাজমান।

এদিকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম একই ঘেরাটোপের মধ্যে থাকতে থাকতে অন্ত্যজদের মধ্যে একটি বিচ্ছিন্নবোধের জন্ম হয়। অন্ত্যজরা বুঝতে পারে যে তাদের প্রতি সমাজের অন্যান্য মানুষের মনোভাব ভিন্ন। সমাজের এ মনোভাব তাদের আরও বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

অন্ত্যজদের মধ্যে অবস্থান্তরের আচার দেখতে যেয়ে ভিক্টর টার্নারের প্রতীকবাদ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। কারণ সামাজিক সচলতায় অন্ত্যজরা রূপকনির্ভর অভিব্যক্তির বাইরে নয়। টার্নার মনে করতেন সমাজ কাঠামোর মধ্যে মূল ক্রিয়াশীল বিষয় হচ্ছে অভিজ্ঞতা যা প্রতীকরূপে অবস্থান করে। সামাজিক সচলতায় এ প্রতীকের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তিনি Metaphor বা রূপক নিয়ে আলোচনা করেন। টার্নার বলেন, মানব মনের এ রূপকের জন্ম হয় একটি আলো-আধাঁরি অবস্থান থেকে। তিনি এর নাম দেন Liminality. টার্নার বিশ্বাস করতেন সামাজিক সচলতায় বিভিন্ন ঘটনার মূলে অবস্থান করে এ Liminality (Turner, 1966).

টার্নার এ Liminality বলতে মূলতঃ একটি আলো আধাঁরি অবস্থাকে বুঝিয়েছেন। এই Liminality থেকেই রূপকের সৃষ্টি। তবে সমাজে এ রূপকের কারণ স্পষ্ট নয় কারণ সমাজের সব ঘটনা রূপকে পরিণত হয় না। কিছু ঘটনা বিশেষ কিছু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রূপকে পরিণত হয়। এ কারণে বলা হয়ে থাকে Liminality কে ব্যাখ্যা করা যায় না। এটা অস্পষ্ট। তবে টার্নার ব্যাখ্যা দেন, Liminality সামাজিক জীবনেরই প্রকাশ যা সামাজিক কাঠামো এবং সম্প্রদায়গত ভিত্তি সংহত করে।

গবেষক হিসেবে আমার কাজ ছিল, অন্ত্যজদের মধ্যে এ প্রক্রিয়া বা আচারগুলো বোঝার চেষ্টা করা। অন্ত্যজদের ক্ষেত্রেও এমন অনেক অবস্থা কলোনির ভেতর তৈরি হয়। অন্ত্যজদের মধ্যে গবেষণা করতে গিয়েও দেখা যায় কলোনির ঘেরাটোপে বিভিন্ন ঘটনা, কথা, গান ইত্যাদি ভিন্ন অর্থ তৈরি করে। সেখানে যে আবেদন তৈরি করে সে অবস্থাটি লিমিনালিটি। কিন্তু কলোনির বাইরে এগুলো তেমন কোন আবেদন তৈরি করে না।

এখানে মেরী ডগলাসের তত্ত্বও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কারণ মেরী ডগলাসের কেন্দ্রিয় বিষয় ছিল নোংরা, ময়লা বা অশুচি। মেরী ডগলাসের দূষণবোধ ও নৈতিকতা থেকে সৃষ্ট নৈতিক ভুবনবোধের ব্যাখ্যায় বেরিয়ে এসেছে আদিম ও আধুনিক সমাজের বাস্তবতা। আধুনিক সমাজের বাস্তবতায় শুচি-অশুচির আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শুচি-অশুচির বর্তমান রূপ।

মেরী ডগলাস পড়েই আমি জানতে পারি, নোংরাবোধটি একটি সার্বজনীন অর্থবহন করে। নোংরা বলে একটি বস্তুকে বা বিষয়কে নির্দেশ করা হয় তখনই যখন ঐ বিষয়ের স্থান-চ্যুতি ঘটে। আদিম সমাজে নোংরাবোধের মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে নৈতিকতা, নৈতিকতা থেকে তৈরি হচ্ছে নৈতিক ভুবন। এ নৈতিক ভুবন গড়ে উঠার মধ্য দিয়ে একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হচ্ছে। নোংরা হলে পরম বা ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না। নোংরাকে শুদ্ধির মাধ্যমে ফিরিয়ে আনতে হবে। আদিম সমাজে নোংরা বোধের বিপরীতে পরম বা ঈশ্বরের বোধ তৈরি হচ্ছে। এজন্য নোংরা হল ম্যাজিক, শামান এসবের মাধ্যমে সর্বজনীন আচারের দ্বারা শুদ্ধকরণের প্রক্রিয়া যা ঐ সমাজে বিদ্যমান থাকে। আবার দূষণবোধ আধুনিক সমাজে বসবাসরত মানুষের স্বাস্থ্যগতবোধ। দূষণ আজকের পৃথিবীতে একটি বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও তা সার্বজনীন নয়। কারণ দূষণবোধের অবস্থান মতাদর্শ। মতাদর্শগত কারণে দূষণ নোংরাবোধের ন্যায় কোন একক এবং সংহত প্রতীক নির্মাণে ব্যর্থ হচ্ছে। এর ফলাফলে মতাদর্শগত সমাজে বোধের ভিন্নতা বিদ্যমান। এ বোধগুলো সব সমাজে একই অর্থ বহন করে না। এ বোধগুলো যখন প্রতীক তৈরি করে দেয় তখন আর তা নষ্ট করা যায় না। প্রতীক অত্যন্ত শক্তিশালী। এই প্রতীকগুলো তৈরি করছে সংস্কৃতি (চৌধুরী, ২০০৩)।

উল্লেখ্য, অন্ত্যজরা সমাজে ময়লা-আবর্জনা পরিস্কার করে। অর্থাৎ তারা সমাজের সেবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। সমাজকে ধুয়ে-মুছে পরিচ্ছন্ন রাখে। কিন্তু তারা নিজেরা থাকছেন নোংরা পরিবেশে।

5.6 †Km ÷wW :

Dhaka University Institutional Repository

fvM¨j ÿx ivYx : আমার সঙ্গে ভাগ্যলক্ষী রানীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইন্সটিটিউটের ঝাড়ুদার সুবল চন্দ্র দাস। সুবল আমার মাঠকর্মের তথ্যদাতা। অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ভেতরকার খবরগুলো আমি সাধারণত সুবলের কাছে জানতে পারি।

সেদিন ছিল শুক্রবার। আমার পিএইচ.ডি. ক্ষেত্র গবেষণার এলাকা গণকটুলী হরিজন কলোনিতে অনেকটা সময় কাটিয়ে ফিরে আসছিলাম। সময়টা ছিল সন্ধ্যা। সুবল সঙ্গে আসছিলেন আমাকে বিদায় জানাতে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) ৩ নং গেটের কাছে আসতেই দেখলাম আধো আলো আধো অন্ধকারে হেঁটে আসছেন এক নারী। পরণের জীর্ণ কাপড় এবং গায়ের দুর্গন্ধ আমাকে এ নারীকে মনে রাখতে বাধ্য করেছে।

সুবলই প্রথম কথা বলে। আমার দিকে তাকিয়ে বলে ওর নাম ভাগ্যলক্ষী রাণী। (ভাগ্যলক্ষীই তার সত্যিকারের নাম। তার অনুমতি নিয়েই গবেষণায় সরাসরি তার নামটি ব্যবহার করা হয়েছে।) গণকটুলী হরিজন কলোনির পুরনো বাসিন্দা। বর্তমানে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে ঝাড়ুদার পদে কর্মরত। স্বামীর নাম দিলীপ বাঁশফোর। দুজনেই বংশ পরম্পরায় ঝাড়ুদারি পেশায় নিয়োজিত।

সেদিন ভাগ্যলক্ষীকে অসম্ভব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। আমি তার কলোনির ঠিকানা জেনে সেদিন বাড়ি ফিরে আসি। কেস স্টাডি হিসেবে ভাগ্যলক্ষী রানীর জীবনযাত্রা বা তার বলা কথাগুলো তুলে ধরার ইচ্ছা সেদিনই প্রথম জাগে।

এর তিনদিন পর আমি আবার গণকটুলীর কলোনিতে হাজির হই। মুখোমুখি হই ভাগ্যলক্ষীর। কলোনির ১০ বর্গফুটের দম বন্ধ করা পরিবেশে কিভাবে স্বামী-সংসার নিয়ে বছরের পর বছর তিনি কাটিয়ে দিচ্ছেন তা নিঃসন্দেহে এক রহস্য। তার ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, সংসারের প্রতি দায়বদ্ধতা ও মমতা চেখে পড়ার মত। মাত্র ১৫ বছর বয়সে ভাগ্যলক্ষীর বিয়ে হয়। বিয়ের পরপরই সন্তান নেয়া শুরু। একে একে ঘরে আসে সাত সন্তান। বছর দুয়েক আগে তিনি তার বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই মেয়ে সংসারই শুরু করতে পারেননি। ১৬ বছরের সেই মেয়ে এখন বাবা-মায়ের সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

থাকেন। কারণ অন্য কিছু নয়। বিয়ের সময় যে যৌতুকের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তা আজও দেয়া হয়নি বলে স্বামী তাকে বাপের বাড়ি ফেলে রেখেছেন।

ভাগ্যলক্ষ্মী রাণীর প্রতিদিনের জীবন-সংগ্রাম শুরু হয় সেই ভোরবেলা। সূর্য ওঠার আগেই তিন ছেলে-মেয়েকে নিয়ে তিনি ছোটেন কাজের সন্ধানে। সবাই মিলে ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করেন। ভাগ্যলক্ষ্মী বলেন, কাজ করি ঠিকই, কিন্তু মাস শেষে যে টাকা মাইনে পাই তা ভিক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। এক টাকা দুই টাকা আমাদের পরিশ্রমের দাম। তারপরও তিনি ছেলে-মেয়ে নিয়ে এ কাজ করে চলেছেন বছরের পর বছর ধরে। তাছাড়া এখন আর আর বাঁচবার উপায় নেই।

ভাগ্যলক্ষ্মীর স্বামী দিলীপ বাঁশফোর। বেকার। অনেক চেষ্টা করেও একটি চাকুরি যোগাড় করতে পারেননি। হাতে স্থায়ী কোন কাজ নেই। যা আয় করেন তাতে সংসার চলে না। দিলীপের বাবা ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ঝাড়ুদার ছিলেন। সেই সুবাদে গণকটুলী হরিজন কলোনিতে তারা একটি থাকার জায়গা পেয়েছেন। জায়গা বলতে ১০ বর্গফুটের একটি ঘর। ওই ঘরেই ভাগ্যলক্ষ্মী ও দিলীপ তাদের সাত সন্তান নিয়ে রাত কাটান।

অভাবের সংসারে এত সন্তান কেন? প্রশ্ন করলে ভাগ্যলক্ষ্মী বলেন, আমার কিছু করবার ছিল না ভাই। একটার পর একটা বাচ্চা পেটে এসেছে। কোনভাবে সন্তান আসা বন্ধ করতে পারিনি। তবে সন্তান না নেয়ার জন্য ভাগ্যলক্ষ্মী কোন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করেননি। আগে এ সম্পর্কে তার কোন ধারণাই ছিল না। এখন অবশ্য কিছু ধারণা পেয়েছেন। ঘন ঘন সন্তান জন্ম দিয়ে তার শরীর ভেঙে গেছে। এখন কাজ করেন খুব কষ্ট করে। ঝাড়ু দেয়ার সময় একটু পরপর হাঁপিয়ে ওঠেন।

ভাগ্যলক্ষ্মী জানান, শেষ সন্তানটি জন্ম দেয়ার সময় তিনি প্রায় মরেই যাচ্ছিলেন। সন্তান প্রসবের সময় মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল; কিন্তু অন্ত্যজ শ্রেণীর বলে সেখানে তার চিকিৎসা করা হয়নি। অবশেষে গণকটুলী সুইপার কলোনীর ১০ বর্গফুটের ঘরেই তার সন্তানের জন্ম হয়। তিনি বলেন, ওইবার একেবারে ভাগ্যের জোরে বেঁচে গিয়েছিলাম। মরে গেলে অন্য সন্তানগুলোর যে কি অবস্থা হতো সেটাই এখন ভাবি।

উল্লেখ্য, আর যেন সন্তান জন্ম না হয় সেজন্য ভাগ্যলক্ষ্মী গণকটুলী হরিজন কলোনির ভেতরে অবস্থিত মন্দিরে গিয়ে মানত করেছিলেন। কিন্তু তাতে তেমন কোন কাজ হয়নি। ভাগ্যলক্ষী বলেন, অভাবের কারণে ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পারিনি। কিছু বুঝতে না বুঝতেই সবাইকে দু'পয়সা রোজগারে নামিয়ে দিয়েছি। নাম আমার ভাগ্যলক্ষ্মী হলেও আমার ঘরে লক্ষ্মীদেবী নেই।

এদিকে বাচ্চাদের নিয়ে স্বামীর কোন মাথাব্যথা নেই। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী বাচ্চাদের অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভেবে খুব কষ্ট পান। ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, মানুষ হিসেবে আমাদের জন্ম, কিন্তু সমাজে মানুষের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার কোন সুযোগ সুবিধা আমরা পাইনি। আমরা অন্ত্যজ, আমরা অস্পৃশ্য।

c‡kvËi ce :

bvg : ভাগ্যলক্ষী রাণী

eqm : ৪০

wk¶vMZ †hvM¨Zv : প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই

†ckv : ঝাড়ুদারি

†ckvi cKwZ : আদি পেশা-তিন প্রজন্ম ধরে এ পেশায় নিয়োজিত

Ab¨ Av‡qi Drm : নেই

Kg¯j : ঢাকা সিটি কর্পোরেশন

Kv‡Ri mgqKvj : ভোর ৫ টা থেকে বিকাল ৫ টা

^eewnK Ae¯v : বিবাহিত

¯vgx/¯xi bvg (weewnZ n‡j) : দিলীপ বাঁশফোড়

¯vgx/¯xi eqm (weewnZ n‡j) : ৪৮

¯vgx/¯xi wkÿvMZ †hvM¨Zv (weewnZ n‡j) : প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই

¯vgx/¯xi †ckv (weewnZ n‡j) : ঝাড়ুদারি, আপাতত পেশা থেকে বিচ্যুত

†Q‡j‡g‡qi msL¨v : ৭

†Q‡j‡g‡qi eqm : যথাক্রমে ১৬, ১৪, ১৩, ১১, ৮, ৫, ৩

†Q‡j‡g‡qi wkÿvMZ †hvM¨Zv : ইউসেপ গণকটুলী সিটি কর্পোরেশন স্কুলে বিভিন্ন শ্রেনীতে শিক্ষারত

†Q‡j‡g‡qi cov‡jLvi cvkvcwk ‡ckv (KgRxex n‡j) : ঝাড়ুদারি

†Q‡j‡g‡qi ˆeewnK Ae¯v : একজন বিবাহিত, বাকিরা অবিবাহিত

bwZ-bvZbxi msL¨v : নেই

cwiev‡i †eKv‡ii msL¨v : ৫ জন

cwiev‡i Avq-e¨‡qi cwigvY : পরিবারের মাথাপিছু আয় গড়ে ৩৫০০-৪০০০ টাকা। ব্যয় সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। সঞ্চয় বলতে তেমন কিছুই থাকে না

Avq e¨‡qi LvZ : বিভিন্ন

Avq e¨‡qi Lv‡Z bvix-ci‡æli ˆelg¨ : ব্যাপক ভাবে বিদ্যমান। মহিলারা যা রোজগার করে তাও পুরুষদের কর্তৃত্বে চলে যায়

cwiev‡i ewlK mÂq : নেই

cwievi e¨e¯vq cwieZb : পিতৃতান্ত্রিক

cwievi cwiKíbv : গ্রহণ করেননি

Aemi hvcb : অবসর সময়ে পরিবারের সকলে মিলে টেলিভিশন দেখা হয়, হিন্দী সিনেমা অথবা সিরিয়ালগুলো বেশি দেখা হয়

†hŠZK c_v : চরম ভাবে প্রচলিত, যৌতুক দিতে পারছে না বলে বড় মেয়েকে বিয়ের পর স্বামীর বাড়ি না গিয়ে বাবামায়ের সঙ্গে থাকতে হচ্ছে

we‡q‡Z cvÎ-cvÎxi gZvgZ : পূর্বে বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রীর মতামত গ্রহণ করা না হলেও বর্তমানে পাত্রপাত্রীর মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হয়

ˆ‘bw›‘b Lvev‡ii ZwjKv : ভাত, সবজি, ছোট মাছ

iÜb-cYvjx/e›Ub : রন্ধন প্রণালী সাধারণ, পরিবারের সব সদস্যের মাঝে সমবন্টন হয়, সাধারণ বাঙালি সমাজের মতই মশলা ব্যবহৃত হয়

ivbvi mgq : সন্ধ্যা

Dhaka University Institutional Repository

evm¯v‡bi Ae¯v : ১০ বর্গফুটের একটি কক্ষ, পার্টিশন দিয়ে আরেকটি ছোট ঘর তৈরি হয়েছে, রান্নাবান্না এখানেই করা হয়

miKwi evmv/ e¨w³MZ evmv : গণকটুলী

cwievi cwZ N‡ii msL¨v : ১টি

N‡i emevmKvixi msL¨v : ৭ জন, অনেক সময় পালাক্রমে ঘুমাতে হয়

cqtwb®vlY cYvjx, m¨wb‡Ukb e¨e¯v : অনুন্নত, প্রত্যেক পরিবার প্রতি আলাদা কোন টয়লেট নেই। কলোনীগুলোতে সবার জন্য কমন টয়লেট।

cwb I we‘¨r e¨e¯v : অপ্রতুল

Avmevecî : আসবাবপত্র অধিকাংশই কাঠের

†cvkvK-cwi‡”Q‡‘i aiY : মেয়েরা শাড়ি, সেলোয়ার কামিজ এবং ছেলেরা শার্ট, প্যান্ট, লুঙ্গি ও ধুতি পড়ে

AmL n‡j wPwKrmv e¨e¯v : সরকারি-বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্র সেখানে নেই। তবে সরকারি ঝাড়ু দাররা সরকারি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণ করেন

miKwi †mev/e¨w³ D‡¨v‡M wPwKrmv : ব্যক্তিগত উদ্যোগেই বেশিরভাগ চিকিৎসা হয়, কলোনিতে চিকিৎসক তেমন আসতে চান না

ivR‰bwZK msMV‡bi cfve : চরম ভাবে বিদ্যমান। প্রধানত ভোটের সময়

†fvU c‘v‡bi AwaKvi : আছে

‘wjZ msMVb ev mwgwZ : বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ

‘wjZ msMV‡bi MVbcYvjx, Kvhµg, mdjZv, wedjZv (_vK‡j) : এখন পর্যন্ত তেমন কোন সফলতা নেই।

lô Aa¨vq

wj½ ˆelg¨ I AšÍ¨R bvix

অন্ত্যজ নারী অধ্যায়টি লিখতে যেয়ে আমি লিঙ্গীয় সম্পর্কের বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবং তাদের ক্ষমতার ব্যাপারটি দেখেছি। আমার গবেষণার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি, অন্ত্যজ সমাজ পুরুষ শাসিত। নারীরা এ সমাজে অবহেলিত। নারীদের বাসনার তেমন বাস্তবায়ন হয় না এ সমাজে। প্রয়োজনবোধ করলে পুরুষরা নারীদের পরামর্শ নেন, তবে সে পরামর্শের বাস্তবায়ন পুরুষদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে।

বহুকাল আগে থেকেই অন্ত্যজ নারীরা পুরুষদের ওপর নির্ভরশীল নয়। উপার্জন করেন তারা, তবে উপার্জনে হাত বাড়ায় পুরুষরা। পুরুষরা মানে স্বামীরা। অন্ত্যজ সমাজে পুরুষদের তুলনায় নারীরা অধিক সংসারমুখী। কায়িক পরিশ্রম বেশি করেন নারীরা। নারী শ্রমের উপর নির্ভরশীল গোটা সমাজ। সন্তানদের আনন্দ-বেদনা আর ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তায় তারা অনেকটাই চিন্তিত থাকেন। তারপরেও অনেকক্ষেত্রে বিবাহিত নারীরা নির্যাতনের শিকার হন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন ২০১৫ অনুযায়ী-একজন গর্ভবতী মহিলা শ্রমিকের প্রতি মালিক ও অন্যান্য শ্রমিকের দায়িত্ব হবে নিম্নরূপ।

(ক) এমন কোন আচরণ বা মন্তব্য না করা যেন তিনি শারীরিক বা মানসিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হন বা অপমানিতবোধ করেন; (বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত; সেপ্টেম্বর ১৫, ২০১৫; ৭৩৩৩)
(খ) সরকার কর্তৃক ঘোষিত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে অথবা স্বাস্থ্যের প্রতি ঝুঁকিপূর্ণ হয় এমন কোন কাজে নিয়োজিত না করা;
(গ) ঝুঁকিবিহীন কাজে স্থানান্তর বা পদায়ন করা;
(ঘ) কর্মকালীন লিফ্ট ব্যবহারে অগ্রাধিকার প্রদান করা;
(ঙ) সন্তান প্রসবের পর তার শিশুর দুগ্ধপানের সুযোগ ও পরিবেশ নিশ্চিত করা।

কিন্তু এর কোনটাই আসলে তেমন মানা হয় না বলে জানায় অন্ত্যজ নারীরা। অন্ত্যজ সমাজে লিঙ্গীয় অসমতা ও নারীদের অবস্থান, অন্ত্যজ নারীদের মজুরিগত বৈষম্য, অবহেলিত প্রজননস্বাস্থ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ মাতৃত্ব, মাতৃত্বকালীন ছুটির অস্বীকৃতি, অন্ত্যজ শ্রেণীর নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

6.1 bvix‡'i gRvwiMZ ˆelg¨ : গণকটুলী অন্ত্যজ কলোনিতে বসবাসরাত নারীদের অধিকাংশই শ্রমজীবী। দিনভর তারা ঝাড়ু হাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু শ্রমক্ষেত্রে অন্ত্যজ নারীরা মজুরি বৈষম্যের শিকার হন। সরকারি, বেসরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নারীরা পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় মজুরি কম পান। পুরুষ শ্রমিকদের সঙ্গে তারা সমান তালে কাজ করেন। কাজে কোন ধরনের ফাঁকি অন্ত্যজ নারীরা দেন না। অথচ তারপরও অন্ত্যজ নারীদের বেতন দেয়া হয় পুরুষ শ্রমিকদের অর্ধেক।

ঢাকার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ঝাড়ুদারের কাজ করেন বিমলা হাড়ি। পাঁচ বছর ধরে তিনি ওই প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন কাজে যেতে হয় তাকে। সকাল আটটায় অফিসে পৌঁছে বাসায় ফেরেন বিকেল পাঁচটায়। সারাদিন বিমলাকে কর্মস্থলে ধোয়া-মোছার কাজ করতে হয়। অসুস্থ না হলে বিমলার অফিসে যাওয়া বাদ নেই। কিন্তু তারপরও তিনি মজুরি বৈষম্যের শিকার। বিমলা জানান, তার দেবর অন্য অফিসে একই ধরনের কাজ করে মাসে পান পাঁচ হাজার টাকা। আর তাকে দেয়া হয় তিন হাজার টাকা। এ মজুরি বৈষম্যের কারণ তিনি জানেন না। অনেককে এ প্রসঙ্গে জিগ্যেস করেও কোন সদুত্তর পাননি। কেউ কেউ তাকে বুঝিয়েছেন, পুরুষের তুলনায় নারী শ্রমিকের মজুরি কম এবং এটাই নিয়ম। বিমলা একবার বেতন বাড়ানোর জন্য আবেদন করেছিলেন বলে জানান। কিন্তু তার প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা তাকে সোজাসুজি জানিয়ে দেন, এর বেশি বেতন তাকে দেয়া সম্ভব নয়। বেশি বেতন চাইলে তাকে কাজ থেকে বাদ দেয়া হবে। চাকরি হারানোর ভয়ে তিনি এ বিষয়ে আর একটি কথাও বলেননি। এ প্রসঙ্গে বিমলা বলেন, আমার ঘরে ছয়জন খানেওয়ালা। কামাই করি দু'জন; স্বামী-স্ত্রী।

Dhaka University Institutional Repository

বিমলার স্বামী সুনীল হাড়ি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ময়লা আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ করেন। বাড়তি আয়ের জন্যে ছুটির দিনে বাসায়-বাসায় ঘুরে বাথরুমও পরিষ্কার করেন তিনি। দিন শেষে কোনদিন দেড়শ' দু'শ টাকা আয় হয়, কোনদিন কিছুই হয় না।

বিমলা মনে করেন মজুরি বৈষম্যের শিকার অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের বহু নারী। কোন কারণ ছাড়া তারা পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় কম বেতন পাচ্ছেন। অথচ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সনদ অনুযায়ী নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান কাজের জন্য সমান মজুরি পাবার কথা।

নারী-পুরুষ মজুরি বিষয়ে উপরিউক্ত আলোচনা থেকে নিশ্চিত করেই বলা চলে, বাংলাদেশে এ সনদ খুব সামান্যই মানা হচ্ছে। নারী শ্রমিকদের প্রতি এ বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধে আরও কার্যকর আইন প্রণয়নের কথা জানান বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী এবং মানবাধিকারকর্মী মাহবুবুর রহমান (অনুমতি সাপেক্ষে তার আসল নাম ব্যবহার করা হয়েছে) । তিনি বলেন, ১৯৬৫ সালের কারখানা আইন এবং ১৯৬৯ সালের শ্রম আইনে নারী শ্রমিকদের অধিকারের কথা উলেখ নেই। যদিও এ দুটি আইন এখনও প্রচলিত। এ কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এদেশের নারী শ্রমিকরা মজুরি বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। অন্ত্যজদের অধিকার নিয়ে যেহেতু বলার কেউ নেই; তাই তাদের প্রতি বৈষম্য আরও বেশি।

বেসরকারী সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে শ্রমক্ষেত্রে নিয়োজিত মহিলার সংস্থা শতকরা ৪৩ জন। এ সংখ্যা শহরের তুলনায় ২৬ শতাংশ বেশি। তবে শহর ও গ্রাম উভয়ক্ষেত্রেই নারী শ্রমিকরা মজুরি বৈষম্যের শিকার হন। একই ধরনের কাজের জন্য একজন নারী শ্রমিক যা পান একজন পুরুষ শ্রমিক পান তার প্রায় দ্বিগুণ।

অন্যদিকে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব লেবার স্টাডিজ এর গবেষণায় জানা যায়, ১৯৮০র দশকের প্রথমার্ধের তুলনায় ১৯৯৬ সালে দেশে শ্রমশক্তি বৃদ্ধির হার আট শতাংশ বেড়েছে। ১৯৮০ এর দশকে ওই হার ছিল ২.৭ শতাংশ। কিন্তু জনসংখ্যা বা শ্রমশক্তি যেভাবে বেড়েছে শ্রমক্ষেত্র ঠিক সেভাবে বাড়েনি। এ কারণেই শ্রমের সহজলভ্যতা তৈরি হয়েছে।

সাংবাদিক ও মানবাধিকারকর্মী মাহমুদা চৌধুরী (অনুমতি সাপেক্ষে তার আসল নাম ব্যবহার করা হয়েছে) নারীর শ্রম শোষণ প্রসঙ্গে বলেন, দেশের নারী শ্রমিকরা শোষণের শিকার। আইএলও ঘোষণার ৮৭ ও ৯৮ ধারা অনুযায়ী নারী শ্রমিকরা তাদের অধিকার আদায়ে সংগঠিত হতে পারে। অন্ত্যজ নারীদেরও একই অধিকার রয়েছে বলে জানান তিনি।

এদিকে গ্রামে কাজের সুযোগ সুবিধা বাড়লেও বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মহিলা কাজের সন্ধানে শহরে আসছেন। এদের মধ্যে ঢাকার বাইরের অনেক অন্ত্যজ শ্রেণীর নারীও রয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকে বিধবা কিংবা সন্তানসহ স্বামী পরিত্যক্তা। তাদের পরিবার এতই গরীব যে খেতে পর্যন্ত পান না। শহরে বসবাস করে তাদের একটাই ভাবনা–কোথায় বাড়তি একটু কাজ পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে যখন কেউ গার্মেন্টস কারখানায় শ্রমিক হিসেবে অথবা বাসা-বাড়িতে পরিচারিকা হিসেবে কাজ পান না তখন তাদের যে কাজের প্রস্তাব দেয়া হয় অনেকক্ষেত্রে পেটের তাগিদে তারা সেটাই করেন। এক্ষেত্রে বিকল্প হিসেবে নির্মাণ-শ্রমিকের কাজ পাওয়া অনেকটা সহজ। আর ওইসব অসহায় মহিলা খুব কম মজুরিতে কাজ করতে রাজি হন।

এক্ষেত্রে হরিজন ঐক্য পরিষদের মহাসচিব নির্মল চন্দ্র দাস বলেন, শ্রমের সহজলভ্যতার সুযোগ নিয়ে অন্য নারী শ্রমিকদের যেভাবে ঠকানো হচ্ছে একইভাবে অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার নারী শ্রমিকদেরও ঠকানো হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, সারা দেশেই অন্ত্যজ নারীরা একইরকম মজুরি বৈষম্যের শিকার। তারা ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত। কোথাও পুরুষ শ্রমিকদের দু'হাজার টাকা দেয়া হলে নারী শ্রমিকদের দেয়া হয় এক থেকে দেড় হাজার টাকা।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে নিয়োগকর্তারা মনে করেন, নারী শ্রমিকরা শারীরিকভাবে দুর্বল এবং পুরুষের তুলনায় তারা কম কাজ করেন। সে কারণে শুধু অন্ত্যজ নারী নয়, বাংলাদেশে সব সম্প্রদায়ের নারীরাই শ্রমক্ষেত্রে কমবেশি মজুরি বৈষম্যের শিকার।

6.2 Ae‡nwjZ cRbb¯v¯¨ I SwKcY gvZZ : অন্ত্যজদের বসবাসের কলোনিগুলোতে গিয়ে দেখা গেছে, অন্ত্যজ সমাজে নারীর প্রজননস্বাস্থ্য সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই। এ সম্পর্কে তাদের

মধ্যে সচেতনতাও খুব কম। লক্ষণীয় ব্যাপার হল, বিগত দশকে জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য পরিলক্ষিত হলেও অন্ত্যজ শ্রেণীর অধিকাংশ নারী এখনও সে সীমার বাইরে। তাদের অনেকেই স্থায়ী বা অস্থায়ী কোন ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করেন না। তাই একেক দম্পতির পাঁচটি-সাতটি করে সন্তান। অনেকের সন্তান সংখ্যা তার চেয়েও বেশি।

এ প্রসঙ্গে কথা হয় অন্ত্যজ কলোনির গীতা রাণীর সঙ্গে। শীর্ণ চেহারা গীতার, কোলে এক বছরের একটি ছেলে। তিনি জানান, তার আরও চারটি সন্তান রয়েছে। গীতার বয়স ২৫। মাথার চুল প্রায় অর্ধেক পড়ে গেছে। হাত-পায়ে পানি জমে টস টস করছে। পুষ্টিহীনতা যেন তার ওপর জেকে বসেছে। তার কোলের সন্তানটির অবস্থাও একই রকম। চিকন হাত-পা কিন্তু পেট ফুলে রয়েছে। গীতার সব সময়ই মাথা ঘোরে। খাওয়ায় একদম রুচি নেই। হাত-পা ঝিম ঝিম করে ২৪ ঘণ্টা। ক'দিন আগে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন তিনি। ডাক্তার দেখে বলেছেন, অল্প বয়সে অধিক সন্তান নেয়ার কারণেই তার এ অবস্থা হয়েছে। গীতার যখন বিয়ে হয় তখন তার বয়স ছিল ১৬ বছর। বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তিনি প্রথম সন্তানের জন্ম দেন। পরবর্তীতে তিনি আরও চারটি সন্তানের জন্ম দেন। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির কথা বলতেই গীতা চটপট উত্তর দেন, আমরা ওসব করি না। পেটের সন্তান মারা পাপ। জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ্ধতি সম্পর্কে তার তেমন কোন ধারণা নেই। গীতা জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য শুধু কনডম ব্যবহারের কথা শুনেছেন। তবে সেটি ব্যবহার করা বা না করা একান্তই তার স্বামীর ব্যাপার বলে জানান তিনি।

দেশে জাতীয় প্রজনন স্বাস্থ্যনীতি প্রথমবারের মতো গ্রহণ করা হয় ১৯৯৭ সালে। নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যের যে চারটি বিষয় এতে প্রাধান্য পায় তা হল–নিরাপদ মাতৃত্ব; পরিবার পরিকল্পনা; মাসিক নিয়ন্ত্রণ এবং গর্ভপাত পরবর্তী জটিলতার যত্ন; যৌন সংক্রমণ রোগ/প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা। অন্ত্যজ কলোনিগুলোতে এ নীতির কোন কার্যকারিতা নেই। তাছাড়া কলোনিগুলোতে মেয়েদের বাল্যবিবাহের প্রবণতা বেশি। মেয়ে কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাদের বিয়ে দিয়ে দেয়া হয় এবং অল্প বয়সেই তারা মা হয়ে যান। অন্ত্যজরা অবশ্য বলেন, এ বাল্য বিয়ের প্রবণতা দিন-দিন বেড়েই চলেছে এবং এর কারণ হল, কিশোরী মেয়েদের সামাজিক নিরাপত্তার অভাব।

গণকটুলী অন্ত্যজ কলোনির নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে কথা বলেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক সায়রা মনির অ্যানি (চিকিৎসকের অনুমতি সাপেক্ষে তার আসল নাম ব্যবহার করা হয়েছে)। তিনি বলেন, অন্ত্যজ শ্রেণীর মেয়েরা সহজ সরল। কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা বেশিরভাগ মেয়েই শুনতে চাননা। যারা একটু পড়ালেখা জানেন কেবল তারাই জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করেন। এ হার শতকরা পাঁচ/ছয় এর বেশি নয়। কিশোরীদের মধ্যে প্রজননস্বাস্থ্য সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। তিনি আরও বলেন, বয়ঃসন্ধিকালে প্রজননস্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার কথা বাবা-মায়ের কাছ থেকে; কিন্তু অন্ত্যজ সমাজে যেহেতু বাবা-মায়েরাই কিছু জানেন না, তাই তাদের সন্তানদের এ বিষয়ে কোন ধারণা দিতে পারেন না। বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরীদের প্রজননস্বাস্থ্য বিষয়ক সম্যক ধারণা দিতে গার্হস্থ্যবিজ্ঞান বইয়ে মেয়েদের ঋতুস্রাব সম্পর্কে জ্ঞান দেয়া হয়; অন্ত্যজ কিশোরীদের অনেকে স্কুলে না যাওয়ার কারণে এ পদ্ধতিও কাজে আসছে না। কলোনিতে এনজিও তৎপরতাও চোখে পড়ার মত দৃশ্যমান নয়।

তাছাড়া, বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি (এফপিএবি) যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করতে দেশের বৃহত্তর জেলাসমূহের তিনটি করে ইউনিয়নে যুব প্রকল্প নামে একটি কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৮০ সালে শুরু হওয়া ওই প্রকল্পের অধীনে ১০ বছর থেকে ২৪ বছরের ছেলে-মেয়েদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হয়। প্রকল্পের অধীনস্থ এলাকার অভিভাবকদের কাছেও যৌন ও প্রজনন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। এফপিএবির হিসাব অনুযায়ী, সমিতির ২০টি শাখার মাধ্যমে ৭০টি ইউনিয়নে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। উলেখ্য, অন্ত্যজদের কলোনিগুলোতে এ কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায়নি।

গর্ভজনিত মৃত্যু অন্ত্যজ নারীদের জন্য একটি মারাত্মক ঝুঁকির কারণ। অন্ত্যজ মেয়েরা বাল্যবিবাহের শিকার হওয়ায় অল্প বয়সেই গর্ভধারণ করে। আর সে কারণে তাদের মধ্যে মাতৃত্ব ঝুঁকি থেকেই যায়। গর্ভাবস্থায় প্রায় প্রত্যেকেই নানারকম সমস্যায় ভোগেন। যারা বাল্যবিবাহের শিকার তাদের সমস্যা অনেক বেশি। তাদের সন্তান প্রসবকালে নানা জটিলতা দেখা দেয়। প্রসবকালে অনেকের মৃত্যুও হয়। কিন্তু অন্ত্যজরা এ ব্যাপারে তেমন ভাবেন না। তারা গর্ভধারণ ও প্রসবকালীন সমস্যাগুলোকে বিবেচনা করেন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। যেমন, প্রসবকালে কোন মায়ের জটিলতা দেখা দিলে তারা ডাক্তারের

কাছে না গিয়ে মন্দিরে গিয়ে দেবতার কাছে প্রার্থনা করেন তাদের সমস্যা দূর করার জন্যে। তাছাড়া, প্রসবকালে সাধারণত তারা প্রশিক্ষিত কোন দাই বা নার্স ডাকেন না। কলোনির মেয়েরাই তাদের দাইয়ের কাজ করেন। নার্স ডাকার রীতি অন্ত্যজ সমাজে নেই। হাতুরে দাইদের ভুলে অন্ত্যজ শ্রেণীর অনেক মা সন্তান প্রসবকালেই মারা যান। এখানে শুচি-অশুচির কারণে অনেকে যায় না। আলাদা কোন আতুর ঘরও এখানে তৈরি করা হয় না।

6.3 gvZZKvjxb QwUi A¯xKvZ : দেশে সরকারি চাকরির প্রচলিত বিধান অনুযায়ী একজন কর্মজীবী নারী মাতৃত্বকালে সর্বোচ্চ ছয় মাসের ছুটি ভোগ করতে পারেন। কিন্তু অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের নারীদের ক্ষেত্রে প্রচলিত এ বিধান উপেক্ষিত। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অন্ত্যজ নারীরা ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি পান না। গণকটুলী হরিজন কলোনির বাসিন্দা তাপসী রাণী দাস বলেন, অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের যেসব নারী বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ময়লা পরিষ্কার করার কাজ করেন মাতৃত্বকালে তাদের ভাগ্যে তেমন কোন ছুটি জোটে না। অনেকে সন্তান জন্মের কয়েকদিন আগ পর্যন্ত কাজ করেন। আবার সন্তান প্রসবের কিছুদিন যেতে না যেতেই তাদের কাজে যোগ দিতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে মায়েরা তাদের শিশুসন্তানকে কোলে নিয়ে অফিসে হাজির হন। অফিসের বারান্দায় শিশুকে শুইয়ে রেখে ময়লা পরিষ্কারের কাজ করেন। চাকরি টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই তাদের এটা করতে হয়। তার বোন সুতপা রাণী দাস বলেন, ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি বিষয়টি অনেক অন্ত্যজ নারীর কাছেই অজানা।

6.4 AšÍ¨R bvixi wbivcËvnxbZv : তিন বছর আগে বিউটি রাণীর যখন বিয়ে হয়েছিল তখন তার বয়স ছিল ১৩ বছর। বিউটির কোলে এখন দু'টি সন্তান। ছোট সন্তানের বয়স দু'মাস। গণকটুলী হরিজন কলোনির ছোট্ট একটি ঘরে বিউটি থাকেন স্বামী, সন্তান ও শাশুড়িকে নিয়ে। স্বামী রবিলাল দাস চাকরি করেন ঢাকার একটি সরকারি হাসপাতালে। বিউটি রাণীর শীর্ণ চেহারা। কোলের সন্তানটি বুকের দুধ পায় না। জ্বর, মাথা-ব্যথা, হাত-পা ঝিম-ঝিমসহ নানা অসুখ বিউটির লেগেই রয়েছে। রবিলাল দাস হাসপাতালে চাকরি করলেও অসুখ-বিসুখে স্ত্রীকে হাসপাতালে নেন খুব কমই। দ্বিতীয় বাচ্চা যখন পেটে আসে তখন হঠাৎ করে একদিন মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন বিউটি। সেদিন হাসপাতালে নিলে ডাক্তার বলেছিলেন, দ্বিতীয় সন্তানটি নেয়া তাদের ঠিক হয়নি। এমনিতেই অল্প

Dhaka University Institutional Repository

বয়সে বিয়ে, তারপর তিন বছর যেতে না যেতেই দু'টি বাচ্চার মা। স্বামী-স্ত্রী দুজনের ওপরই সেদিন রেগে গিয়েছিলেন ডাক্তার। বিউটিকে বকাবকি করেছেন কিশোরী অবস্থায় বিয়ে করার জন্য। বিউটিকে পরীক্ষা করার পর ডাক্তার বলেছেন, ১৩ বছর বয়সে বিয়ে হওয়ায় বিউটির যে ক্ষতি হয়েছে, তা কোনদিন পূরণ হবার নয়। বিউটিকে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ্য করে তোলা কঠিন। বিউটির এ অবস্থার জন্য সে নিজে দায়ী নয়–একথা ঠিক। কিন্তু কি কারণে বিউটির বাবা-মা এতো অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে দিলেন সেটি অবশ্য খুবই গুরুত্ববহ। বিউটি নিজে বিয়ের সময় ওই কারণ বুঝতে না পারলেও এখন বুঝতে পারছেন। পাড়ার বখাটে ছেলেরা একদিন মাতাল হয়ে তাদের কলোনির সামনে এসে বিউটির নাম ধরে চিৎকার করছিল। লুকিয়ে রেখে সেদিন মাতাল-লম্পটদের হাত থেকে মেয়েকে রক্ষা করেছিলেন বিউটির বাবা-মা। তার পরদিন থেকেই শুরু হয় বিউটির জন্য পাত্র খোঁজা। এক মাসের মধ্যে তার বিয়ে হয়ে যায়। বিউটি বলেন, বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নিয়ে বাবা-মায়ের চিন্তা ও উৎকণ্ঠার বিষয়টি আমি বুঝতে পারছিলাম। একসময় তারা কোথাও যেতে দিতেন না। সবসময় চোখে-চোখে রাখতেন। মা বলতেন, পাড়ায় কিছু খারাপ ছেলে আছে। ওদের সামনে যাবি না। মূলত এ আশঙ্কা ও চিন্তা থেকেই তাকে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেয়া হয় বলে জানান বিউটি। তিনি আরও বলেন, আমাকে যখন বাবা-মা বিয়ের কথা বলেন, তখন আমার করার কিছুই ছিল না। মন চাচ্ছিল না বিয়ে করি, কিন্তু বাবা-মার দুশ্চিন্তার কথা ভেবে বিয়েতে মত দিয়ে দেই।

বিউটির মত এরকম বাল্যবিবাহের শিকার অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মেয়ে। ইদানিং এ প্রবণতা আরও বেড়েছে। বাংলাদেশের অন্ত্যজ কলোনিগুলোতে উঠতি বয়সের মেয়েদের সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে বাবা-মায়ের মধ্যে আতঙ্ক দেখা যায়। কলোনিগুলোতে বাল্যবিবাহের হার বৃদ্ধি পাওয়ার এটিই মূল কারণ। সারাদেশেই অন্ত্যজ শ্রেণীর বাবা-মায়েরা বিয়ের বয়স হওয়ার আগে মেয়েকে বিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। হরিজন কলোনির বাসিন্দা রতন লাল বলেন, কলোনিতে কোন মেয়ে বড় হলে তার উপর বাইরের মাস্তানদের দৃষ্টি পড়ে। রাস্তা-ঘাটে তাকে উৎপাত করতে শুরু করে। কুপ্রস্তাব দেয়। তাই মেয়ে বড় হলে সব বাবা-মায়েরা চিন্তায় পড়েন। তিনি আরও বলেন, কিশোরী মেয়েদের কাজে পাঠানোও ঝুঁকিপূর্ণ। কলোনির বাইরে কোথাও তারা স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারেন না। মেয়ের নিরাপত্তা নিয়ে তাই দুশ্চিন্তায় থাকেন অন্ত্যজ কলোনির প্রত্যেক বাবা-মা। সে কারণেই তারা অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন। গণকটুলী হরিজন কলোনির বাসিন্দা বরুণ বলেন, অন্ত্যজ

সমাজে অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে দেয়ার প্রচলন বহু পুরনো। মেয়ের বয়স ১৩/১৪ হলেই বাবা-মায়েরা মেয়ের বিয়ে দেয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগে যান।

কলোনিতে গিয়ে দেখা যায় উঠতি বয়সের ছেলেরা ক্যারম খেলছে রাস্তা দখল করে। মেয়েরা চলাচল করার সময় নানা ভাবে তাদের উত্ত্যক্ত করছে।

তবে একথাও ঠিক যে, মেয়ের নিরাপত্তা নিয়ে বাবা-মায়েদের দুশ্চিন্তাই অন্ত্যজ সমাজে বাল্যবিবাহ বৃদ্ধির একমাত্র কারণ নয়। অন্যান্য কারণও বিদ্যমান। বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে অন্ত্যজদের মধ্যে কোন ধারণা নেই। এ ব্যাপারে তারা মোটেও সচেতন নয়। অন্ত্যজ সমাজে শিক্ষার আলো না পৌঁছার কারণে তাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ সম্পর্কে কোন সচেতনতা আসছে না। তাছাড়া অন্ত্যজ সমাজে যোগ্য পাত্র পাওয়া বেশ কঠিন। তাই যখন কোন বাবা তার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব পান সঙ্গে সঙ্গেই তিনি রাজি হয়ে যান। মেয়ের ভবিষ্যত নিয়ে তখন আর কিছু ভাবনা-চিন্তা করেন না।

গণকটুলী হরিজন কলোনিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন উপমা দাস। বর্তমানে ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ইতিহাসে অনার্স পড়ছেন তিনি। বাল্যবিবাহের মূল কারণ হিসেবে অশিক্ষাকেই দায়ী করেন উপমা। তিনি বলেন, অন্ত্যজরা শিক্ষিত হলেই তাদের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রবণতা কমে আসবে। এ ব্যাপারে তখন কাউকেই কিছু বলতে হবে না।

অন্ত্যজরা বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন সম্পর্কে কিছু জানেন না। উপমা জোর দিয়ে বলেন, বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের এমনিতে তেমন কোন প্রয়োগ নেই। আর অন্ত্যজরা ওই আইনের কথা একদম ভাবেন না। বাল্যবিবাহ যে একটি অপরাধ এবং তা নিষিদ্ধ করে কঠোর আইন দেশে প্রচলিত রয়েছে সে কথাই অন্ত্যজদের অনেকেই জানেন না।

উলেখ্য যে, বাল্যবিবাহ বিষয়ে সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণায় থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন (১৯৯৮) শীর্ষক প্রকাশনায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশে প্রায় অর্ধেক নারীরই যখন বিয়ে হয় তখন তাদের বয়স থাকে ১৮ বছরের নিচে। বাল্যবিবাহের কারণে অনেক মেয়ে পড়াশুনা

শেষ করতে পারেন না। ফলে অনেক মেয়ে অপরিণত বয়সে গর্ভধারণে বাধ্য হন এবং দেশের ২০ শতাংশ মেয়ে ১৫ বছর বয়সের আগে সন্তান জন্ম দেন। আর ২০ বছর বয়সের আগে গর্ভবতী হওয়ার ফলে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি দেখা দেয়। ওই সব ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে–নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া, খুব কম ওজন নিয়ে শিশুর জন্ম হওয়া, প্রসবের সময় মা ও শিশু দুজনেরই মৃত্যুর আশঙ্কা এবং জন্মের প্রথম বছরেই শিশুর মৃত্যুর আশঙ্কা। অথচ বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯ (সকল ধর্মাবলম্বীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) অনুযায়ী, নাবালিকা/নাবালক বিবাহ করা অথবা বাল্যবিবাহে সাহায্য করা অপরাধ। এ আইন অনুযায়ী, ১৮ বছরের কম বয়সের মেয়ে এবং ২১ বছরের কম বয়সের ছেলে শিশু হিসেবে গণ্য। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে তিন ধরনের অপরাধ চিহ্নিত করা হয়েছে। যথা : (১) প্রাপ্ত বয়স্কের সঙ্গে অপ্রাপ্ত বয়স্কের বিবাহ (২) অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ের বিবাহ (৩) অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের মা-বাবা বা অভিভাবক কর্তৃক তার বিবাহ নির্ধারণ অথবা এরকম বিবাহে সম্মতি প্রদান করা। এ আইনে বাল্য বিবাহ বাতিল হয় না; কিন্তু যারা এ ধরনের বিবাহ সম্পাদনে জড়িত থাকবেন (সংশিষ্ট শিশু ব্যতীত) তাদের সকলেরই কারাদন্ড অথবা জরিমানা কিংবা উভয় প্রকার দন্ড হতে পারে। উপমা দাস আক্ষেপ করে বলেন, আমাদের অন্ত্যজ সমাজের মেয়েদের বেশিরভাগ এসব কিছু জানেন না।

অন্ত্যজ সমাজে মেয়েদের নিয়ে আরও এক ধরনের বিড়ম্বনা রয়েছে। সাধারণত বিয়ে হলে মেয়েদের বাবারবাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়িতে চলে যাওয়ার কথা। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি হয় মেয়েদের নিজের বাড়ি। কিন্তু অন্ত্যজ সমাজে অনেক মেয়েকে বিয়ের পরও বাবার বাড়িতে থাকতে হয়। তার কারণ আবাসন সঙ্কট। বাড়ি-ঘর না থাকায় অনেক স্বামী বিয়ের পর স্ত্রীকে নিজের বাড়িতে তুলে নিতে পারেন না। ফলে বিয়ে হয়ে গেলেও মেয়ে তার বাবা-মার সঙ্গেই থেকে যান। এ সমস্যা দিন-দিন প্রকট হলেও করার কিছু নেই। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের মহাসচিব নির্মল চন্দ্র দাস বলেন, থাকার ব্যাপারে দু'চারজন ছাড়া সবার একই অবস্থা। সবাই থাকি ছোট-ছোট ঘরে। সে কারণে অনেক ছেলেই বিয়ে করে বউকে ঘরে তুলতে পারেন না।

অন্যদিকে অন্ত্যজ সমাজে বিয়েতে যৌতুক দেয়া-নেয়া চলে প্রকাশ্যে। যৌতুক ছাড়া কোন মেয়ের বিয়ে হয় না। আর ওই যৌতুক দেয়ার জন্য দরিদ্র বাবা-মায়েদের সহায়-সম্বল হারানো ছাড়া আর

কোন উপায় থাকে না। আবার যৌতুক না পেলে বা কম পেলেও বিয়ের পরে মেয়ের উপর বিভিন্ন ভাবে নির্যাতন করে শ্বশুরবাড়ির লোকজন। অনেকক্ষেত্রে যৌতুক না দিলে বিয়েবিচ্ছেদের ঘটনাও ঘটে। সংগঠিত হয় নানা ধরনের সহিংসতা।

6.5 †Km ÷wW

iZv ivYx : রত্না রাণী জন্মগ্রহণ করেছিলেন গণকটুলী হরিজন কলোনিতে। জন্মের পর দাদাকে দেখেছিলেন ঝাড়ুদারির কাজ করতে। পরে বাবাকে দেখেছেন। অন্যান্য বড় ভাইবোনদেরও দেখেছেন, এখন নিজেই করছেন। আট ভাই-বোনের মধ্যে তার অবস্থান পঞ্চম। চরম অর্থনৈতিক কষ্টের মধ্যেও রত্নার বাবা চেষ্টা করেছিলেন ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে। ভাই-বোনের সবাই প্রথম জীবনে স্কুলে যাওয়া শুরু করলেও একে একে সবাই ঝরে পড়েন। রত্না প্রাথমিক বিদ্যালয় শেষ করে আর পড়ালেখা করেনি। ভাই-বোনদের কাজে সাহায্য করতে নেমে পড়েন। সাত সন্তানসহ নয় সদস্যের পরিবারটির মুখের খাবার জোগাড় করতে রত্নার বাবার জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে। ছেলে-মেয়েরাও বুঝতে পারে অন্ত্যজ সমাজে দুবেলা মুখের ভাত যোগাড় করা কতটা কঠিন। তাই আস্তে আস্তে তারাও কাজে মনোযোগ দেন।

রত্নারাণীর বিয়ে হয় ১৬ বছর বয়সে। বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই রত্নার সন্তান জন্মদান শুরু হয়। বর্তমানে রত্নার সন্তান সংখ্যা তিনজন। দুই মেয়ে এক ছেলে। রত্নার স্বামী কানাই বাঁশফোড়। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ঝাড়ুদার পদে কর্মরত। গণকটুলী হরিজন কলোনির ১০ বর্গফুট কক্ষে শ্বাশুড়ী, ননদ, স্বামী এবং তিন সন্তানকে নিয়ে বসবাস করেন রত্না। ঘরটির আসবাব বলতে শ্বশুরের ব্যবহৃত পুরনো একটি খাটিয়া, একটি টেবিল, দুটো চেয়ার এবং বিয়ের সময় বাবারবাড়ি থেকে যৌতুক হিসেবে পাওয়া কিছু আসবাব। রত্না ও তার স্বামী কানাইয়ের মাসিক গড় আয় ৭৫০০ টাকা। এ দিয়েই অভাবেব সংসার চলে।

মাত্র দুই বছরের ব্যবধান নিয়ে বারবার সন্তান জন্মদান করার ফল খুব একটা ভাল হয়নি। রত্না বেশিক্ষণ পরিশ্রম করতে পারেন না। হাঁপিয়ে ওঠেন। তাছাড়া রত্নার সবসময়ই মাথাব্যথা করে।

প্রায়শই বমি হয়। হাতে, পায়ে পানি জমে। রত্নার তিনসন্তানও অপুষ্টির শিকার। অধিকাংশ সময়ই তারা পেটের পীড়ায় আক্রান্ত থাকে। ডায়রিয়া তাদের প্রতিদিনের রোগ। সন্তানগুলোর শরীর শুকনো হলেও পেট ফুলে ঢোল হয়ে আছে। এভাবেই তারা বেঁচে আছে।

এর মধ্যে রত্নার ননদের বিয়ে দেয়া নিয়ে পরিবারে নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। মেয়েটির জন্য উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। সুন্দরী হওয়ায় কলোনির ভেতরে ও বাইরে দু'জায়গাতেই মেয়েটিকে চলাচল করতে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। ফলে মেয়েটির বিয়ে দিতে পরিবারের সদস্যরা তৎপর হলেও ভাল পাত্রের অভাব এবং অর্থাভাব বিয়ে আটকে দিয়েছে।

রত্নার পরিবারে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় ভাত, রুটি, সবজি ইত্যাদি খাওয়া হয়। মাংস খাওয়া প্রায় হয় না বললেই চলে। রত্না চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করে তার কর্মস্থল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল থেকে। প্রতিদিন বিনা পয়সার ওষুধ রত্না এবং তার পরিবারের সদস্যদের নিত্যসঙ্গী। ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করার জাত পেশায় রত্না রাণী সন্তুষ্ট না হলেও বর্তমানে ভাগ্যকে তিনি মেনে নিয়েছেন।

রত্না রাণী বলেন, অভাবের সংসার আমার। অভাবের কারণে নিজে বেশিদূর পড়ালেখা করতে পারিনি, সন্তানগুলোকেও ঠিকমত পড়াতে পারছি না। ছেলে-মেয়েগুলো বেশিরভাগ সময় অসুস্থই থাকে। মাঝে মাঝে নিজেকে এত অসহায় মনে হয়! ভাগ্যকে মেনে নেয়া ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই।

প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে ভোর বেলা কাজে যান রত্না। শ্বাশুরী রত্নার সন্তানগুলোকে লালন-পালনের গুরু দায়িত্ব পালন করেন। হাসপাতালের মেঝে ঝাড় দিয়ে, রোগীদের নানারকম ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করে রত্নার সারাদিন কেটে যায়। সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে রত্না আবার রাতের খাবারের আয়োজন করতে বসেন।

প্রতিদিনের কাজের রুটিনে তেমন কোন ব্যতিক্রম নেই রত্নার। আক্ষেপ করে রত্না বলেন, নিচুজাতে জন্মগ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমার কোন ভূমিকা নেই। মাঝে মাঝে মনে হয়, জন্মের পর হতে আমরা

Dhaka University Institutional Repository

একটি কারাগারের ভেতরে আছি। আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার আছে, ভাল থাকার অধিকার নেই। রত্না রাণীর প্রতিটি কথায় অন্ত্যজদের জীবনযাত্রার নির্মম বেদনা ফুটে ওঠে।

c‡kvËi ce :

bvg : রত্না রাণী

eqm : ২৩

IRb : ৪৮ কেজি

D”PZv : ৫ ফুট ১ ইঞ্চি

wk¶vMZ †hvM¨Zv : ৫ম শ্রেণী পাশ

†ckv : ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করা

†ckvi cKwZ : আদি পেশা-তিন প্রজন্ম ধরে এ পেশায় নিয়োজিত

Ab¨ Av‡qi Drm : নেই

Kg¨j : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল

Kv‡Ri mgqKvj : ভোর ৫ টা থেকে বিকাল ৫ টা

^eewnK Ae¯v : বিবাহিত

¯vgx/¯xi bvg (weewnZ n‡j) : কানাই বাঁশফোড়

¯vgx/¯xi eqm (weewnZ n‡j) : ৩০

¯vgx/¯xi wkÿvMZ †hvM¨Zv (weewnZ n‡j) : অষ্টম শ্রেণী পাশ

¯vgx/¯xi †ckv (weewnZ n‡j) : ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ঝাড়ুদার পদে কর্মরত

†Q‡j‡g‡qi msL¨v : ৩

†Q‡j‡g‡qi eqm : যথাক্রমে ৬, ৪, ৩

†Q‡j‡g‡qi wkÿvMZ †hvM¨Zv : বড় সন্তান ইউসেপ গণকটুলী সিটি কর্পোরেশন স্কুলে শিক্ষারত

†Q‡j‡g‡qi cov‡jLvi cvkvcwk ‡ckv (KgRxex n‡j) : নেই

†Q‡j‡g‡qi ^eewnK Ae¯v : অপ্রাপ্ত বয়স্ক

bwZ-bvZbxi msL¨v : নেই

cwiev‡i †eKv‡ii msL¨v : ৫ জন

cwievi Avq-e¨‡qi cwigvY : পরিবারের মাথাপিছু আয় গড়ে ৭৫০০-৮০০০ টাকা। ব্যয় সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। সঞ্চয় বলতে তেমন কিছুই থাকে না।

Avq e¨‡qi LvZ : বিভিন্ন

Avq e¨‡qi Lv‡Z bvix-ci¤^‡li ^elg¨ : ব্যাপক ভাবে বিদ্যমান। মহিলারা যা রোজগার করে তাও পুরুষদের কর্তৃত্বে চলে যায়

cwievi ewlK mÂq : নেই

cwievi e¨e¯vq cwieZb : পিতৃতান্ত্রিক

cwievi cwiKíbv : গ্রহণ করেননি

Aemi hvcb : অবসর সময়ে পরিবারের সকলে মিলে টেলিভিশন দেখা

†hŠZK c_v : প্রচলিত

we‡q‡Z cvÎ-cvÎxi gZvgZ : পূর্বে বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রীর মতামত গ্রহণ করা না হলেও বর্তমানে পাত্রপাত্রীর মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হয়

^‘bw›‘b Lvev‡ii ZwjKv : ভাত, সবজি, ছোট মাছ

iÜb-cYvjx/e›Ub : রন্ধন প্রণালী সাধারণ, পরিবারের সব সদস্যের মাঝে সমবন্টন হয়, সাধারণ বাঙালী সমাজের মতই মশলা ব্যবহৃত হয়

ivbvi mgq : সন্ধ্যা

evm¯v‡bi Ae¯v : ১০ বর্গফুটের একটি কক্ষ, পার্টিশন দিয়ে আরেকটি ছোট ঘর তৈরি হয়েছে, রান্নাবান্না এখানেই করা হয়

miKwi evmv/ e¨w³MZ evmv : গণকটুলী

cwievi cwZ N‡ii msL¨v : ১টি

N‡i emevmKvixi msL¨v : ৭ জন, অনেক সময় পালাক্রমে ঘুমাতে হয়

cqtwb®vlY cYvjx, m¨wb‡Ukb e¨e¯v : অনুন্নত, প্রত্যেক পরিবার প্রতি আলাদা কোন টয়লেট নেই। কলোনিগুলোতে সবার জন্য কমন টয়লেট। আড়াইশ মানুষের জন্য গড়ে একটি করে টয়লেট রয়েছে

cwb I we‘¨r e¨e¯v : অপ্রতুল

Avmevecî : আসবাবপত্র অধিকাংশই কাঠের

†cvkvK-cwi‡"Q‡'i aiY : মেয়েরা শাড়ি, সেলোয়ার কামিজ এবং ছেলেরা শার্ট, প্যান্ট, লুঙ্গি ও ধুতি পড়ে

AmL n‡j wPwKrmv e¨e¯v : সরকারি-বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্র সেখানে নেই। তবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালে তিনি এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা চিকিৎসা গ্রহণ করেন

miKwi †mev/e¨w³ D‡'¨v‡M wPwKrmv : ব্যক্তিগত উদ্যোগেই বেশিরভাগ চিকিৎসা হয়, কলোনিতে চিকিৎসক তেমন আসতে চান না

ivR‰bwZK msMV‡bi cfve : চরম ভাবে বিদ্যমান

†fvU c'v‡bi AwaKvi : আছে

'wjZ msMVb ev mwgwZ : বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ

'wjZ msMV‡bi MVbcYvjx, Kvhµg, mdjZv, wedjZv (_vK‡j) : এখন পর্যন্ত তেমন কোন সফলতা নেই

6.6 †Km ÷wW

kvnRv'x : গণকটুলী হরিজন কলোনিতে বসবাসরত আমার দেখা সবচেয়ে বয়স্ক অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার মানুষ। বয়স আর অভিজ্ঞতা মিলিয়ে অন্ত্যজদের বহু ইতিহাসের সাক্ষী। এক সময় শাহজাদী স্বামী এবং তার ৯ ছেলে-মেয়ে নিয়ে গণকটুলী হরিজন কলোনিতে বসবাস করতেন। ছেলে-মেয়ে সবারই বিয়ে হয়ে গেছে। নাতি-নাতনীর সংখ্যা ২৭ জন। তারাও এখন বড় বড়। অনেকেই পড়াশোনা করছেন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত আছেন। কালের সাক্ষী শাহজাদী আমার গবেষণার Key Informant.

শাহজাদীর স্বামী মারা গেছেন প্রায় ২০ বছর। পরিবারে সদস্য সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় একসময় ছেলেরা তাকে আলাদা করে দেয়। কলোনির কাছে শাহজাদীর জন্য একটি টিনের চালা তৈরি করে দিয়েছেন তারা।

শাহজাদীর মুখের ভাষায় হিন্দী ও বাংলা ভাষার মিশ্রণ লক্ষণীয়। দীর্ঘদিন ধরে কলোনিতে থাকতে থাকতে মুখের ভাষায় এ পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে তার পরিবারের সদস্যরা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করার কাজে নিয়োজিত। কেবল শাহজাদীর হাতে কোন কাজ নেই। জীবনের ভার বইতে বইতে ক্লান্ত তিনি।

আক্ষেপ করে শাহজাদী বলেন, বুড়ি হয়েছি। বয়সের ভারে ঘরে কোন কাজ করতে পারি না। ছেলে-মেয়েরা আমাকে বিবেচনা করে সংসারের বাড়তি হিসেবে। ঘরে নাতি-পুতি আসল। থাকার জায়গার সঙ্কট দেখা দিল। আমাকে তারা ঘর থেকে বের করে দিল। টিনের ঝুপড়ি করে দিল কলোনির পাশে।

শাহজাদীর সাথে কথা বলে জানা যায়, বর্তমানে তার নিজের কোন আয়-রোজগার নেই। ছেলে-মেয়েরা তার কোন খবরাখবর রাখেন না। গণকটুলীতে বসবাসরত বিভিন্ন অন্ত্যজদের বাসা থেকে শাহজাদীকে প্রতিদিন খাবার দেয়া হয়। খাদ্য তালিকায় বেশির ভাগ সময় রুটি, সবজি, ছোট মাছ ইত্যাদি থাকে। বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের মহাসচিব নির্মল চন্দ্র দাস প্রতিমাসে শাহজাদীকে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করেন। সঞ্চয় বলতে শাহজাদীর কিছুই নেই।

শাহজাদীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, একসঙ্গে না থাকলেও ছেলে-মেয়েদের সব খবরই তিনি রাখেন। তার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন যেদিন তার বড় নাতিটি এস.এস.সি. পাশ করেছিলেন। তিনি বলেন, সন্তানরা বেশিদূর শিক্ষিত হতে না পারলেও নাতি-নাতনীরা পড়ছেন। অনেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরিও করছেন। এটাই আমার জীবনের পরম পাওয়া।

উলেখ্য, বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার পরেও শাহজাদী কোনদিন ভোট প্রদান করেননি। জাতপেশা ঝাড়ুদারি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাবু, জন্মের পর থেকেই বাপ-দাদাদের এ পেশায় দেখছি, স্বামীকে দেখেছি, সন্তানরাও করল, নাতি-পুতিদের অনেকেই করছে। আমরা এ পেশাকে আকড়েই বেঁচে আছি। পেশাটায় একটা মায়া পড়ে গেছে। জন্মান্তরের মায়া।

শাহজাদীর এ কথায় ঝাড়ুদারি পেশার প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও ভালবাসা ফুটে ওঠে। জাতপেশার প্রতি এমন ভালবাসা খুব একটা দেখা যায় না।

c‡kvËi ce :

bvg : শাহজাদী

eqm : ৯৫

c‘ex : নেই

wk¶vMZ †hvM¨Zv : নেই

Kg¯j : নেই

^eewnK Ae¯v : বিধবা

†Q‡j‡g‡qi msL¨v : ৯

†Q‡j‡g‡qi †ckv : ঝাড়ুদারি

†Q‡j‡g‡qi ^eewnK Ae¯v : বিবাহিত

bwZ-bvZbxi msL¨v : ২৭

cwiev‡i Avq-e¨‡qi cwigvY : একা থাকেন। নিজের রোজগার নেই

e¨‡qi LvZ : বিভিন্ন

cwiev‡i ewlK mÂq : নেই

cwievi cwiKíbv : গ্রহণ করেননি

Aemi hvcb : অবসর সময়ে শাহজাদী অন্যান্য অন্ত্যজদের সঙ্গে গল্প করেন। টেলিভিশন দেখেন

^‘bw›‘b Lvev‡ii Zwjkv : রুটি, সবজি, ছোট মাছ

iÜb-cYvjx/e›Ub : রন্ধন প্রণালী সাধারণ। মশলা ব্যবহৃত হয়

ivbvi mgq : সকাল

evm¯v‡bi Ae¯v : ১০ বর্গফুটের একটি কক্ষ

cqtwb®vlY cYvjx, m¨wb‡Ukb e¨e¯v : অনুন্নত

cwb l we‘¨r e¨e¯v : অপ্রতুল

Avmevecî : আসবাবপত্র অধিকাংশই কাঠের

Dhaka University Institutional Repository

†cvkvK-cwi‡"Q‡'i aiY : শাড়ি পড়েন

AmL n‡j wPwKrmv e¨e¯v : সরকারি-বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্র সেখানে নেই। তবে অসুস্থ হলে কলোনির বাসিন্দারা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান

miKwi †mev/e¨w³ D‡'¨v‡M wPwKrmv : ব্যক্তিগত উদ্যোগেই বেশিরভাগ চিকিৎসা হয়, কলোনিতে চিকিৎসক তেমন আসতে চান না

ivR¯^bwZK msMV‡bi cfve : চরম ভাবে বিদ্যমান

†fvU c'v‡bi AwaKvi : আছে

'wjZ msMVb ev mwgwZ : বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ

Dhaka University Institutional Repository

mßg Aa¨vq

AšÍ¨R‡‘i Rxeb I RxweKv

7.1 ˆcwÎK †ckvq AwbðqZv : আমার গবেষণায় দেখা গেছে, কলোনিগুলোতে বসবাসরত অনেক অন্ত্যজই পৈত্রিক পেশা থেকে ছিটকে পড়ছেন। চৌদ্দ পুরুষের পেশা আকড়ে ধরে জীবিকা নির্বাহ করতে তাই তারা এখন অনেকটাই মরিয়া। পাশাপাশি তারা শঙ্কিত তাদের আদি পেশা নিয়ে। অন্ত্যজদের অধিকাংশই ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করার কাজে নিয়োজিত। এ পেশাতে তারা সেই ব্রিটিশ আমল থেকে জীবিকা নির্বাহ করে আসছেন। কিন্তু তাদের পৈত্রিক পেশা বর্তমানে হুমকির সম্মুখীন। এ পেশা থেকে জোর করে তাদের সরিয়ে দেয়া হচ্ছে কিংবা বঞ্চিত করা হচ্ছে। মাত্র ২০ বছর আগে এদেশের অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার মানুষরা যে চিন্তা করেননি এখন তাদের সে চিন্তা করতে হচ্ছে। তাই তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের দাবীর পাশাপাশি আদি পেশা টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম করতে হচ্ছে। অন্ত্যজরা মনে করেন, তাদের পেশা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। আর এজন্য দায়ী সরকার। কেননা, দেশের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য কারা চাকরি পাবেন এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন নীতিমালা না থাকার কারণে অন্ত্যজদের মধ্যে বর্তমানে এ শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

প্রতিবেশি দেশ ভারতের উদাহরণ দিয়ে গণকটুলী হরিজন কলোনির বাসিন্দা বরুণ চন্দ্র দাস বলেন, ভারতে দলিত সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর কিছু চাকরি রয়েছে যেগুলো শুধু দলিত বা অন্ত্যজদের জন্যই সংরক্ষিত। ভারতে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার মত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোয় ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য অন্ত্যজ ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোকজন নিয়োগ দেয়া হয় না। এ ব্যাপারে সেখানে স্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ৪৬ বছর পরও সে ধরনের কোন নীতিমালা তৈরি হয়নি। বরুণ আরও বলেন, নীতিমালা না থাকার কারণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অন্ত্যজদের বাদ দিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের ঝাড়ুদার পদে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এর ফলে অন্ত্যজরা যে বঞ্চিত হচ্ছেন সেদিকে কারও খেয়াল নেই।

গণকটুলী হরিজন কলোনির বাসিন্দা রাজিব রবিদাস বলেন, তাদের জীবন জীবিকার অন্যতম পথ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোয় ময়লা আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ করা। এক্ষেত্রে বড় কর্মক্ষেত্র হল দেশের সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলো।

যেহেতু নগর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলো পালন করে তাই সেখানে স্থায়ীভিত্তিতে বিপুল সংখ্যক পরিচ্ছন্নতাকর্মী কাজ করেন। একসময় সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার ঝাড়ুদার বলতে শুধু অন্ত্যজদেরই বোঝানো হত। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই। বর্তমানে অনেক মুসলমান সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোতে পরিচ্ছন্নতাকর্মীর কাজ করছেন। ফলে সংকুচিত হয়ে এসেছে অন্ত্যজদের কর্মক্ষেত্র। এক্ষেত্রে রাজিব অভিযোগ করে বলেন, মুসলমানদের ঝাড়ুদারের কাজে নিয়োগ দিয়ে বংশ পরম্পরায় নিয়োজিত অন্ত্যজদের তাদের পৈত্রিক পেশা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত ঝাড়ুদার সুলেখা হাড়ি বলেন, সরকার আমাদের পেটে লাথি মারছে। আমাদের আদি পেশা কেড়ে নিচ্ছে। অন্ত্যজদের প্রতি এ ধরনের অন্যায়, অবিচারের কারণ তিনি জানেন না। শুধু প্রশ্ন রাখেন, কাজ না পেলে আমরা কোথায় যাব? আমরা হয়তো না খেয়ে মারা যাব।

রাজিব রবিদাস বলেন, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র সাদেক হোসেন খোকার সঙ্গে ঝাড়ু দার নিয়োগ প্রসঙ্গে কথা হয়েছিল। এক্ষেত্রে ঝাড়ুদার নিয়োগ প্রসঙ্গে প্রাক্তন মেয়র তাঁর মতামত তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সিটি কর্পোরেশনে ঝাড়ুদারসহ সব পদে নিয়োগ দেয়া হয় যোগ্যতার ভিত্তিতে। যোগ্যতাই এখন চাকরির মাপকাঠি। অ-হরিজন কিংবা মুসলমান পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা বর্তমানে সিটি কর্পোরেশনে ঝাড়ুদার বা মেথরের কাজ করতে আসছেন। যারা চাকরি পাচ্ছেন তারা যোগ্যতার মাপকাঠিতে পাচ্ছেন। কর্মসংস্থানের সংকট ও অভাব অনটনের কারণে মুসলমানরা এ পেশায় আসছেন। তাছাড়া সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী যে কেউ ঝাড়ুদারের পেশা গ্রহণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে কোন বিধি-নিষেধ নেই। শুধু অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার মানুষই ঝাড়ুদারের চাকরি পাবেন এমন কোন আইন দেশে নেই।

Dhaka University Institutional Repository

রাজিব আরও বলেন, তবে ঝাড়ুদারের কাজটি যেন অন্ত্যজরাই পান সেদিকে সকলের খেয়াল রাখা দরকার বলে মতামত প্রকাশ করেছিলেন মেয়র সাদেক হোসেন খোকা। কারণ, এটাই তাদের জীবিকার একমাত্র পথ।

গণকটুলী হরিজন কলোনিতে তিন পুরুষ ধরে বসবাসরত শিবু মন্ডল বলেন, বছর বিশেক আগেও দেশের সব সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও সরকারি অফিসে ঝাড়ুদার বা মেথর পদে অন্ত্যজ ছাড়া অন্য কেউ ছিলেন না। অন্য সম্প্রদায়ের কাউকে নিয়োগ দেয়া হত না। আর বর্তমানে পরিস্থিতি একেবারে উল্টো। এখন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোয় অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না। সরকারি-বেসরকারি অফিস, আদালত, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা–সব জায়গা অ-হরিজন পরিচ্ছন্নতাকর্মীতে ভরে গেছে। এর ফলে অন্ত্যজরা তাদের বাপ-দাদার কাছ থেকে পাওয়া আদি পেশা হারাচ্ছেন। জীবন বাঁচাতে অনেকে ভিক্ষাবৃত্তি বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। তিনি আরও বলেন, অন্ত্যজ বলে যারা আমাদের ঘৃণা করেন; তারাই এখন প্রকাশ্যে অন্ত্যজদের কাজ করে যাচ্ছেন। সত্যি কথা বলতে, ব্রিটিশ আমলে আমাদের চাকরির অনেকটা নিশ্চয়তা ছিল, পারিশ্রমিক ছিল জীবন রক্ষার উপযোগী। পাকিস্তান আমলে আমাদের স্বস্তির জায়গায় ভাঙন শুরু হয়। স্বাধীনতার পর আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের ভাঙন প্রায় সম্পূর্ণ হয়।

অন্ত্যজদের এ অভিযোগের সত্যতা মিলে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে। খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, সেখানে স্থায়ীভাবে কর্মরত পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বেশিরভাগই অ-হরিজন ও মুসলমান। হরিজন পরিমল দাসের মতে, মুসলমানরা এ পেশায় না এলে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোতে অন্ত্যজদের ছেলে-মেয়েরা তাদের পৈত্রিক পেশা থেকেই জীবিকা নির্বাহ করতে পারত। কিন্তু সে পথ এখন রুদ্ধ।

বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের মহাসচিব নির্মল চন্দ্র দাস বলেন, আমাদের ভবিষ্যত অন্ধকার। আমরা অবহেলিত বলেই আমাদের চাকরি, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার কোন নিশ্চয়তা নেই।

ঠিক একই ধরনের ক্ষোভ প্রকাশ করে গণকটুলী হরিজন কলোনির বাসিন্দা কার্তিক চন্দ্র দাস বলেন, যুগ যুগ ধরে আমরা মেথরের কাজ করছি। মল-মূত্র-আবর্জনা পরিষ্কার করছি। এসব কাজ করি বলে আমাদের ছেলে-মেয়েদের সবাই ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে।

তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বদলেছেও। অন্ত্যজদের অনেকেই এখন অন্যান্য পেশায় জড়িত। যেমন : অনেক অন্ত্যজ নারী বর্তমানে মালিশওয়ালীর কাজ করছেন। তারা বাড়িতে গিয়েও অনেক সময় এ কাজ করে থাকেন। হাজারীবাগের পার্লারগুলোতেও অনেক অন্ত্যজ নারী কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার হরিলাল দাস ঝাড়ুদারি প্রসঙ্গে বলেন, ব্রিটিশ আমল থেকে পাকিস্তান আমল পর্যন্ত কোন অফিস আদালতে অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার বাইরে একজনও ঝাড়ুদার ছিলেন না। আর এখন হরিজন ঝাড়ুদারের চেয়ে অ-হরিজন ঝাড়ুদারই বেশি।

অন্ত্যজদের প্রতি সরকারের অন্যায় ও অবিচারের আরেক ধরনের উদাহরণ তুলে ধরেন বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের সভাপতি কৃষ্ণ লাল। তিনি বলেন, অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠান এখন মলমূত্র পরিষ্কার ও ঝাড়ুদারের কাজটি অ-হরিজন কিছু প্রতিষ্ঠানের কাছে ঠিকা দিয়েছে। এর ফলেও অন্ত্যজরা তাদের আদি ও জাত পেশা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যেমন : বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, সেনা কল্যাণ সংস্থা, জনতা ব্যাংক ভবনসহ বড় বড় অনেক প্রতিষ্ঠানে ঠিকা দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করানো হচ্ছে। এমনকি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনও অনেক সময় ঠিকা দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করিয়ে নিচ্ছে। বিষয়টি খুবই দুঃখজনক এবং নতুন এ ব্যবস্থা দেশের বঞ্চিত অন্ত্যজদের প্রতি চরম অবিচার। সেখানে হরিজন কিংবা অ-হরিজন বিষয়টি বিবেচনা করা হয় না। এক্ষেত্রে সামাজিক সচেতনতাও খুব শক্তিশালী নয়।

কৃষ্ণ লাল আরও বলেন, শিগগিরই যদি এ ঠিকাদারি ব্যবস্থা বন্ধ না হয়, তবে এদেশে অন্ত্যজদের অবস্থা আরও খারাপ হবে। অন্ত্যজদের জীবনে আরও দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে।

7.2 AšÍ¨R‡'i weKí †ckvi mÜvb : জীবন সংগ্রামে ক্লান্ত গণকটুলী হরিজন কলোনির মঙ্গল বাঁশফোর। শত চেষ্টা করেও সংসারে সচ্ছলতা আনতে পারছেন না। অভাব যেন তাকে আষ্টে-পিষ্টে বেঁধে রেখেছে। অভাব কিছুতেই তার পিছু ছাড়ছে না। রাতদিন তিনি লড়াই করে চলেছেন অভাবের সঙ্গে, ক্ষুধার সঙ্গে। গণকটুলী হরিজন কলোনির ২ নং বিল্ডিং এ বসবাসরত মঙ্গলের বাসস্থান বলতে

Dhaka University Institutional Repository

একটি মাত্র ১০ বর্গফুটের ঘর। ১০ বর্গফুটের ওই ঘরটিতেই স্ত্রী এবং চার সন্তানকে নিয়ে রাত কাটান তিনি। একটি ঘরেই আবদ্ধ মঙ্গলের পুরো সংসার। বাবার আমল থেকে এ ঘরেই তিনি বসবাস করছেন। মঙ্গলের বাবা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ঝাড়ুদার ছিলেন। মঙ্গলের স্ত্রী বর্তমানে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে ঝাড়ুদার পদে কর্মরত। কিন্তু মঙ্গল বাঁশফোরের হাতে স্থায়ী কোন কাজ নেই। অনেক চেষ্টা করেও চাকরি জোগাড় করতে পারেননি তিনি। দুঃখ আর হতাশার নিঃশ্বাস ফেলে মঙ্গল বলেন, বহু মানুষের হাতে-পায়ে ধরে বলেছি–আমাকে একটি চাকরি দিন। ছেলে-মেয়েদেরকে ক্ষুধার হাত থেকে বাঁচাই। কেউ সে আকুতি শোনেননি। মঙ্গল বাঁশফোর এখন আর চাকরির পেছনে ছুটোছুটি করেন না। চাকরি পাবেন এমন আশাও করেন না। এখন সকাল হলেই মঙ্গল তার বড় ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন কাজের সন্ধানে। সারাদিন হাট-বাজার ঝাড়ু দিয়ে মঙ্গল বাঁশফোরের কোনদিন ২০০/৩০০ টাকা আয় হয়, কোনদিন হয় না। খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড়, বাচ্চাদের বায়না সবকিছুই ওই আয়ের মধ্যে। যেদিন মঙ্গল কাজ পান না সেদিন ছেলে-মেয়েদের মুখে তিন বেলা খাবার দেয়াই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। মঙ্গল বলেন, মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগে। বাবা হয়ে বাচ্চাগুলোর মুখে খাবার দিতে পারি না। মঙ্গল এক সময় স্বপ্ন দেখতেন তার ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবেন। শিক্ষিত করে গড়ে তুলবেন। শুধু অভাবের কারণে তার সেই স্বপ্ন ভেঙে গেছে। বছর দুয়েক আগে অনেক কষ্টে কলোনির কাছে একটি চায়ের দোকান খুলে বসেন মঙ্গল বাঁশফোর। প্রথমে ভালই চলেছিল। কিন্তু মাসখানেক পর হঠাৎ করে তার দোকানে বিক্রি কমে আসে। এলাকায় জানাজানি হয়ে যায় যে, দোকানটি অন্ত্যজের শ্রেণীপেশার মানুষের। আর সে কথা জানার পরই অনেকে তার দোকানে আসা বন্ধ করে দেন। স্বাভাবিক কারণে তার দোকানে বিক্রি কমে যায়। এরপর মঙ্গল একদিন বাধ্য হয়ে দোকানটি বন্ধ করে দেন।

শুধু মঙ্গল বাঁশফোর নন, এরকম বিকল্প পেশার সন্ধান করে ব্যর্থ হয়েছেন কৈলাশ হেলা, পূণ্য হাড়ি, রতন ভূইমালিসহ আরও অনেকে। তারা সবাই ঝাড়ুদারের চাকরি নেয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে পরে চা-পানের দোকান দিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু অন্ত্যজ বলে তাদের দোকান চলেনি। অন্ত্যজ শ্রেণীগোষ্ঠীর ছাড়া কেউ তাদের দোকানে আসেননি। ফলে দুই থেকে ছয় মাসের মাথায় তাদের দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। ব্যবসা শুরু করে ব্যর্থ হওয়ার বর্ণনা দিয়ে রতন ভূইমালি বলেন, কিছুদিন পর এদেশে অন্ত্যজদের বাঁচার কোন উপায় থাকবে না। যাদের চাকরি থাকবে তারা দু'মুঠো খেতে পারবেন। আর

যাদের চাকরি থাকবে না, তাদের হয় এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে নয়তো চুরি করে খেতে হবে। তিনি আরও বলেন, আমরা কর্তা পদে চাকরি চাই না। ঝাড়ুদারের চাকরি চাই। সেটিও যদি দেয়া না হয়, তাহলে আমাদের বাঁচার আর কোন উপায় থাকবে না। আমরা চায়ের দোকান দিলে সেখানে কেউ চা খায় না; পানের দোকান দিলে কেউ পান কেনে না; চালের দোকান দিলে সে দোকানের চাল কেউ কেনে না।

গণকটুলী হরিজন কলোনির বাসিন্দা শান্তিবালা বলেন, এদেশের অন্ত্যজরা দিন দিন আরও গরীব হচ্ছে। কারণ একদিকে তারা তাদের পৈত্রিক পেশা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন অন্যদিকে বিকল্প পেশার সন্ধান করে ব্যর্থ হচ্ছেন। এ দুই কারণে তাদের জীবিকা নির্বাহ করাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী ও মানবাধিকারকর্মী মাহবুবুর রহমান (অনুমতি সাপেক্ষে আইনজীবীর আসল নাম ব্যবহার করা হয়েছে) মনে করেন, অন্ত্যজরা যেহেতু তাদের আদি পেশা থেকে ছিটকে পড়ছেন তাই তাদের বিকল্প পেশার ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। অন্ত্যজদের ব্যাপারে আলাদা কর্মসূচী হাতে নিতে হবে। অন্ত্যজরা যেহেতু এদেশের নাগরিক তাই দেশের কাছ থেকে তাদের অনেক কিছু পাওয়ার রয়েছে। সরকারের পাশাপাশি এগিয়ে আসতে হবে বেসরকারি সংস্থাগুলোকে।

সাংবাদিক ও মানবাধিকারকর্মী মাহমুদা চৌধুরী (অনুমতি সাপেক্ষে সাংবাদিকের আসল নাম ব্যবহার করা হয়েছে) বলেন, এদেশে অন্ত্যজদের প্রতি সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের যে দৃষ্টিভঙ্গি তাতে ঝাড়ুদারি পেশার বাইরে বেরিয়ে অন্য কিছু করে জীবিকা নির্বাহ করা তাদের জন্যে সত্যিই কষ্টকর। হিন্দু বা মুসলিম কেউই তাদেরকে সম-অধিকার সম্পন্ন মানুষ বলে ভাবতে পারেন না। সবাই অস্পৃশ্য বলে প্রচন্ড ঘৃণা করেন। এজন্য অন্ত্যজদের মুদি দোকান হোক আর চায়ের দোকান হোক কোনটাই চলে না। এটি এক ধরনের সংকীর্ণতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি আরও বলেন, অন্ত্যজরা যেহেতু এ সমাজের মানুষ এবং তাদের খেয়ে-পড়ে বাঁচতে হবে, তাই ঝাড়ুদারের কাজ দেয়া না গেলে তাদের বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। মেথরের চাকরি থেকে যদি অন্ত্যজদের

বঞ্চিত করা হয় এবং বিকল্প কাজের ব্যবস্থাও করে দেয়া না হয়, তবে তাদের নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা বিপথগামী হতে বাধ্য হবে।

7.3 AšÍ¨R‡'i Avq †ivRMvi I e¨q : অন্ত্যজদের কলোনিগুলোতে গিয়ে পেশার বিভিন্ন প্রকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। কাঠামোগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উঠে এসেছে, গড়ে প্রত্যেক পরিবারের মাথা পিছু আয় প্রতি মাসে ৫০০০-৭০০০ টাকা। যে সমস্ত পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই পেশাগত কাজে নিয়োজিত তাদের মাসিক আয় কিছুটা বেশি। পরিবারের সদস্যরা চেষ্টা করে মাসিক মাথাপিছু আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখতে। অনেক ক্ষেত্রেই তা রাখা যায় না। আয়ের চেয়ে ব্যয় মাঝে মাঝে বেশি হয়। তখন পরিবারের সদস্যরা অন্যের কাছে ধার করেন। বড় ধরনের খরচ হয় মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে। কেননা বিয়ের সময় গহনা, আসবাবপত্র থেকে শুরু করে অনেক উপহার সামগ্রী প্রদান করতে হয়।

মুসলমান ঝাড়ুদারসহ অনেক হরিজনেরই ঝাড়ুদারি পেশার পাশাপাশি অন্যান্য ব্যবসা রয়েছে। পুরানো ঢাকার তাঁতীবাজারসহ অনেক জায়গায় তাদের স্বর্ণ বা রূপার দোকান রয়েছে কিন্তু এসব অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার লোকজনের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। কিছুসংখ্যক অন্ত্যজ ব্যবসা করে অনেক টাকার মালিক হয়েছেন। অন্যান্যরা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী হিসেবে রয়ে গেছেন।

যারা রাজনৈতিক ভাবে প্রভাবিত তারা রাজনৈতিক সুবিধা লাভ করেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক সমাবেশে লোক সরবরাহ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণসহ অন্যান্য কাজ করে বাড়তি আয় করেন কিছুসংখ্যক অন্ত্যজ।

7.4 †Km÷vwW :

eiæY 'vm : জাত পরিবর্তনের সুযোগ তো নেই। থাকলে আমিও অন্ত্যজ থেকে ব্রাহ্মণ হয়ে যেতাম। দুঃখ করে এ কথা বলছিলেন বরুণ দাস। তিনি গণকটুলী হরিজন কলোনির সীমানায় নির্মিত টিনের ঝুপড়ি ঘরে বসবাস করেন। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে অবিবাহিত।

দু'টি ঝুপড়ি ঘর জোড়া দিয়ে পরিবারের সব সদস্য একসঙ্গে বসবাস করেন। দাদী, বাবা-মা, ভাই-বোন, কাকা-কাকী, পিসি, কাকাতো-পিসতোতো ভাই-বোন মিলে পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১৫। জীবনের করুণ কাহিনী শোনালেন বরুণ। বড়দের কাছে শুনে বরুণ জীবনে আদর্শ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন ড. ভিমরাও আম্বেদকারকে। ভেবেছিলেন তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে তিনিও জীবনের সব বাধা পেরিয়ে এগিয়ে যাবেন। কিন্ত বরুণের জীবনের সে আশা পরবর্তীতে রূপ নেয় দুরাশায়। পরিবারের ১৫ সদস্যের মধ্যে উপার্জনক্ষম মাত্র চারজন। তার মধ্যে বরুণ ও তার ভাই সিটি কর্পোরেশনের ঝাড়ুদার, এক কাকাতো ভাই একটি বেসরকারি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচ্ছন্নতাকর্মী।

বরুণের বোন স্থানীয় একটি বিউটি পার্লারে কাজ করেন। অন্ত্যজ মেয়েরাই এ পার্লারে যান বেশি। তবে এলাকার মাস্তানদের উৎপাতে সেখানেও আয় রোজগার তেমন নেই। এ কারণে বাড়তি আয়ের আশায় কেউ চাইলে বাড়িতে এসেও কাজ করেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি এ পেশায় নিয়োজিত।

পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে বরুণের বাবা-মা, কাকা-কাকী বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তারা সারাজীবন অন্ত্যজ হিসেবে হরিজন কলোনির ঘেরাটোপের মধ্যেই জীবন পার করেছেন। কাজ করেছেন পূর্ব পাকিস্তান এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের সিটি কর্পোরেশনে ঝাড়ুদার হিসেবে। বর্তমানে বয়সের ভারে আর কাজ করতে পারেন না। বাড়িতেই বেশির ভাগ সময় কাটান তারা। তবে আশার কথা বড়রা জাতপেশা ঝাড়ুদারিতে থাকলেও বাড়ির শিশু-কিশোররা বেশিরভাগ লেখা-পড়া করছেন। তারা স্থানীয় ইউসেপ স্কুলে যান।

পরিবারের সদস্যরা মিলে যে টাকা রোজগার করেন তা দিয়ে কোনরকমে জীবনধারণ করেন সবাই। তাদের সঞ্চয় বলতে তেমন কিছুই নেই। তাই স্বাদ-আহলাদ তাদের কাছে অনেকটাই বিলাসিতা।

বরুণের পরিবারের সদস্যদের ব্যবহারের জন্য নিজস্ব কোন শৌচাগার নেই। অন্যান্য পরিবারের সঙ্গে তারা যৌথভাবে শৌচাগার ব্যবহার করেন। এভাবে চলছে বছরের পর বছর। একবার নিজ উদ্যোগে

টিনের চালায় টয়লেট নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও বসবাসের জায়গা কমে যাবে বিধায় সে পরিকল্পনা বাতিল করা হয়।

বরুণের পরিবারের সদস্যরা দৈনন্দিন খাবার হিসেবে ভাত, সবজি, ছোট মাছ, ডাল ইত্যাদি বেছে নেন। মাংস খাওয়া হয় মাসে একবার অথবা দু'বার। অধিকাংশ সময় মুরগির মাংস খাওয়া হয়, কদাচিৎ শূকর রান্না হয়। রন্ধন প্রণালী সাধারণ। পুরুষরা যেহেতু বাড়ির বাইরে কাজ করেন তাই রান্না-বান্নার কাজটি মহিলারা সারেন।

অন্ত্যজদের ঘিঞ্জি পরিবেশের মাঝে এত ভীষণ রকম কষ্ট করে বেঁচে থাকার পরও বরুণের পরিবারের শিশুরা স্বপ্ন দেখে একদিন তারা জীবনে বড় হবেন। সমস্ত প্রতিকূলতা ঠেলে এগিয়ে যাবেন। এ ঘেরাটোপ থেকে বের হয়ে অন্ত্যজ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করবেন।

বরুণ বলেন, জানি আমার একার পক্ষে কিছু করা হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু তারপরেও নতুন প্রজন্মের জন্য আমি স্বপ্ন দেখি। যে সামাজিকতার ঘেরাটোপ আমরা ভাঙতে পারিনি, তারা তা ভেঙ্গে সামনে এগিয়ে যাবে। সমাজে তুলে ধরবে অন্ত্যজদের বেঁচে মরে থাকার কষ্টগুলো। পরিবর্তন আনতে চাইবে অন্ত্যজদের জীবনব্যবস্থায়।

c‡kvËi ce :

bvg : বরুণ দাস

eqm : ৪৫

wk¶vMZ †hvM¨Zv : অষ্টম শ্রেণী পাশ

†ckv : ঝাড়ুদারি

†ckvi cKwZ : আদি পেশা-চার প্রজন্ম ধরে এ পেশায় নিয়োজিত

cwiev‡ii m‘m¨ msL¨v : ১৫ জন

cwiev‡ii Ab¨ Av‡qi Drm : বোনের বিউটি পার্লারে কাজ

cwiev‡ii m‘m¨‡‘i Kg¯j : ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, বেসরকারি স্কুল, বিউটি পার্লার

Kv‡Ri mgqKvj : ভোর ৫ টা থেকে বিকাল ৫ টা

ˆeewnK Ae¯v : অবিবাহিত

¯vgx/¯¿xi bvg (weewnZ n‡j) : নেই

fvB‡evb‡'i wkÿvMZ †hvM¨Zv : ইউসেপ গণকটুলী সিটি কর্পোরেশন স্কুলে বিভিন্ন শ্রেণীতে শিক্ষারত

fvB‡evb‡'i cov‡jLvi cvkvcvwk ‡ckv (KgRxex n‡j) : ঝাড়ুদারি

cwiev‡i †eKv‡ii msL¨v : ৬ জন

cwiev‡i Avq-e¨‡qi cwigvY : পরিবারের মাথাপিছু আয় গড়ে ৮-১০ হাজার টাকা। ব্যয় সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। সঞ্চয় বলতে তেমন কিছুই থাকে না

Avq e¨‡qi LvZ : বিভিন্ন

Avq e¨‡qi Lv‡Z bvix-cyiæ‡li ˆelg¨ : ব্যাপক ভাবে বিদ্যমান। বোনের বিউটি পার্লারের রোজগার পরিবারের পুরুষ সদস্যদের কর্তৃত্বে চলে যায়

cwiev‡i ewlK mÂq : নেই

cwievi e¨e¯vq cwieZb : পিতৃতান্ত্রিক

Aemi hvcb : অবসর সময়ে পরিবারের সকলে মিলে টেলিভিশন দেখা হয়, হিন্দী সিনেমা অথবা সিরিয়ালগুলো বেশি দেখা হয়

†hŠZK c_v : চরম ভাবে প্রচলিত, বড় বোনের বিয়ের সময় দিতে হয়েছে

we‡q‡Z cvÎ-cvÎxi gZvgZ : পূর্বে বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রীর মতামত গ্রহণ করা না হলেও বর্তমানে পাত্রপাত্রীর মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হয়

ˆ'bw›'b Lve‡ii ZwjKv : ভাত, সবজি, ছোট মাছ, মাসে ১/২ বার মাংস

iÜb-cYvjx/e›Ub : রন্ধন প্রণালী সাধারণ, পরিবারের সব সদস্যের মাঝে সমবন্টন হয়, সাধারণ বাঙালী সমাজের মতই মশলা ব্যবহৃত হয়

ivbvi mgq : সন্ধ্যা

evm¯v‡bi Ae¯v : ১২ বর্গফুটের দুটি টিনের ঝুপড়ি কক্ষ। হরিজন কলোনিতে জায়গা না পাওয়ায় আলাদা করে ঘরগুলো তৈরি করা হয়েছে

miKwi evmv/ e¨w³MZ evmv : সরকারি কলোনিতে খালি ঘর পাওয়া যায়নি

N‡i emevmKvixi msL¨v : ১৫ জন। অনেক সময় পালাক্রমে ঘুমাতে হয়

cqtwb®vlY cYvjx, m¨wb‡Ukb e¨e¯v : অনুন্নত, পরিবার প্রতি আলাদা কোন টয়লেট নেই। কলোনিতে বিদ্যমান কমন টয়লেট

cwb I we‘¨r e¨e¯v : অপ্রতুল

Avmevecî : আসবাবপত্র অধিকাংশই কাঠের। পুরোনো হওয়ায় ভেঙ্গে যাচ্ছে

†cvkvK-cwi‡”Q‡‘i aiY : মেয়েরা শাড়ি, সেলোয়ার কামিজ এবং ছেলেরা শার্ট, প্যান্ট, লুঙ্গি ও ধুতি পড়েন

AmL n‡j wPwKrmv e¨e¯v : সরকারি-বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্র সেখানে নেই। তবে সরকারি ঝাড়ু দাররা সরকারি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা সুবিধা লাভ করেন

miKwi †mev/e¨w³ D‡‘¨v‡M wPwKrmv : ব্যক্তিগত উদ্যোগেই বেশিরভাগ চিকিৎসা হয়, কলোনিতে চিকিৎসক তেমন আসতে চান না

ivR‰bwZK msMV‡bi cfve : চরম ভাবে বিদ্যমান। প্রধানত ভোটের সময়

†fvU c‘v‡bi AwaKvi : আছে

‘wjZ msMVb ev mwgwZ : বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ

‘wjZ msMV‡bi MVbcYvjx, Kvhµg, mdjZv, wedjZv (_vK‡j) : এখন পর্যন্ত তেমন কোন সফলতা নেই

Aóg Aa¨vq

AšÍ¨R‡‘i †ÿ‡Î †gŠwjK gvbewaKv‡ii cKwZ

8.1 AšÍ¨R †kYx‡ckvi gvbl‡‘i wk¶vnxbZv : অন্ত্যজ কলোনিতে বসবাসরত গৃহবধূ রূপা একসময় স্বপ্ন দেখতেন, পড়াশোনা করে বড় চাকরি করবেন। কিন্তু পারিবারিক ও সামাজিক দু'দিকের প্রতিবন্ধকতা তার সে স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে। রূপার পড়ালেখা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। ২০০৭ সালে আজিমপুর গার্লস হাই স্কুলে তিনি অষ্টম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তারপরই তার বিয়ে হয়ে যায় কলোনির অজিত রবিদাসের সঙ্গে। বিয়ের পর আর রূপার পড়ালেখা এগোয়নি। রূপা জানান, বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িতে এসে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার আগ্রহ দেখালে রূপাকে আবার আজিমপুর গার্লস হাই স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়। কলোনির অনেকেই তখন আপত্তি তোলেন। তাদের বক্তব্য ছিল, অন্ত্যজ শ্রেণীর মেয়েদের লেখাপড়া করার কোন প্রয়োজন নেই। ওই শিক্ষা কোন কাজে আসবে না। এক পর্যায়ে রূপার শ্বশুরবাড়ির লোকজনও সে কথায় সায় দিয়ে রূপাকে স্কুলে যেতে নিষেধ করেন। সেই থেকে রূপার আর লেখাপড়া করা হয়নি। তার কোলে এখন আড়াই বছরের একটি ছেলে। অতীত স্মৃতি হাতড়িয়ে রূপা বলেন, স্কুল জীবনের কথা মনে পড়লে কষ্ট লাগে। স্বপ্ন ছিল লেখাপড়া করে উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার। ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করার কথা কখনও ভাবিনি। রূপা তার এ অবস্থার জন্য অন্ত্যজ সমাজের লোকজনের গোড়া ভাবনা-চিন্তাকে দায়ী করেন।

অন্ত্যজ সমাজে রূপার মত শিক্ষাবঞ্চিত বহু ছেলেমেয়ে শুধু অভিভাবকদের অবহেলার কারণে নিজেদের শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারছেন না। অন্ত্যজদের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা সচেতনতার মারাত্মক অভাব। শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টিকে তারা এখনও তেমন গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন না। তবে আশার কথা, ইদানিং অন্ত্যজদের কলোনিগুলোর অনেক ছেলে-মেয়েই স্কুলে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে গণকটুলী হরিজন কলোনিগুলোর কাছে অবস্থিত গণকটুলী হরিজন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গণকটুলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইউসেপ গণকটুলী সিটি কর্পোরেশন স্কুলগুলোর ভূমিকা অপরিসীম।

অন্ত্যজ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও তারা বাইরের সমাজের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারছেন না। তারা লেখাপড়া করতে গেলেই দেখা দেয় নানা সমস্যা। যেমন : নিচুজাতের মানুষ বলে অনেক স্কুলে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের শিশুদের ভর্তি করানো হয় না, স্কুলে ভর্তি হলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং অ-হরিজন শিক্ষার্থী-শিক্ষকরা তাদের সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণ করেন না ইত্যাদি।

অন্ত্যজ কলোনির বাসিন্দা মালা রাণী দাস বলেন, আমাদের ইচ্ছা হয় ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাই, কিন্তু সে সুযোগ তো পাই না। ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ করি বলে মানুষ আমাদের ঘৃণা করেন। ভদ্র সমাজের মানুষ আমাদের মানুষ মনে করে না।

অন্ত্যজ শ্রেণী-পেশার বিপুল হাড়ি বলেন, প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত গণকটুলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু পঞ্চম শ্রেণীর বেশি তো আর সেখানে পড়ানো সম্ভব হয় না। তাই একটা সময়ের পর বাইরের স্কুলে ভর্তির জন্য যেতে হয়। সমস্যা হয় তখনই। অন্ত্যজ শ্রেণীর বলে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই আর ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করতে চায় না। বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ জানায়, অন্ত্যজদের ছেলে-মেয়ে শ্রেণীকক্ষে থাকলে অন্যদের অসুবিধা হয়। অন্যান্য শিক্ষার্থীরা তাদের সঙ্গে মিশতে পারেন না। ফলে লেখাপড়ার স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। তিনি আরও বলেন, শিক্ষিত লোকজন যখন এ ধরনের কথা বলেন তখন আমাদের আর কিছুই বলার থাকে না।

এ প্রসঙ্গে সাংবাদিক ও মানবাধিকারকর্মী মাহমুদা চৌধুরী বলেন, পরিবেশ নষ্টের দোহাই দিয়ে কোন স্কুল কর্তৃপক্ষ যদি অন্ত্যজ শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের স্কুলে ভর্তি না করান তবে সেটা অন্ত্যজদের সাংবিধানিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করা হয়। কেননা সংবিধানের ২৮(৩) নং ধারায় স্পষ্টতই বলা হয়েছে, কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না।

এদিকে অন্ত্যজদের বসবাসের কলোনিগুলোতে গিয়ে দেখা গেছে, তাদের মধ্যে লেখাপড়ার ব্যাপারে রয়েছে চরম অনাগ্রহ। তাদের ধারণা হল, এ সম্প্রদায়ের শিশুদের লেখাপড়া করে কোন লাভ নেই। কারণ যতই লেখাপড়া করুক শেষ পর্যন্ত তাদেরকে চৌদ্দপুরুষের সেই ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করার পেশাটিই গ্রহণ করতে হবে। তাই টাকা-পয়সা খরচ করে লেখাপড়া করানো বৃথা। আবার অনেক বাবা-মা মনে করেন ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া করে শিক্ষিত হলে পৈত্রিক পেশাকে ঘৃণা করতে শুরু করবে এবং একসময় অন্ত্যজ সমাজ ত্যাগ করে চলে যাবেন। তাই ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো যাবে না। আরেক শ্রেণীর অভিভাবক মনে করেন, ঘুষ ছাড়া ভদ্র ঘরের ছেলে-মেয়েরাই যেখানে চাকরি পান না সেখানে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া করে উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন না। যোগ্যতা অনুযায়ী কখনোই তারা চাকরি পাবেন না। মূলত এসব ভাবনা-চিন্তা থেকেই অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার বাবা-মায়েরা তাদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে উৎসাহবোধ করেন না।

কিন্তু শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতার অভাবের কারণে দিন দিন পিছিয়ে পড়ছেন এ শ্রেণীপেশার মানুষ। লেখাপড়া না থাকার কারণে সরকারি, বেসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রাপ্য চাকরি থেকেও তারা বঞ্চিত হচ্ছেন। উল্লেখ্য, এখন কোন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ঝাড়ুদারের চাকরি নিতে গেলেও অষ্টম শ্রেণী পাস সার্টিফিকেট দরকার হয়। কিন্তু অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ছেলে-মেয়ের সে যোগ্যতা নেই। তাই বর্তমানে ঝাড়ুদারের চাকরিও তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে দারিদ্রতা তাদের শিক্ষা গ্রহণের পথে প্রধান অন্তরায়। অভাবের কারণে অন্ত্যজ ছেলে-মেয়েরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে না গিয়ে কাজের সন্ধানে বের হন। বাবা-মায়েরা তাদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর পরিবর্তে দু'পয়সা রোজগারে পাঠিয়ে দেন।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের উপদেষ্টা সদস্য সুবল চন্দ্র দাস বলেন, বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাবার ক্ষেত্রে অন্ত্যজদের অধিকার সমান। শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা সমান সুযোগের দাবীদার। সমস্যা হল, শিক্ষা অর্জনের ব্যাপারে তারা নিজেরাই তেমন সচেতন না। ফলে তাদের মধ্যে শিক্ষার হার কম। তাদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা রয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারের আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, অন্ত্যজদের শিক্ষিত

করে তোলার ব্যাপারে তাদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের দরকার রয়েছে। এ পরিবর্তন করা গেলে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এমনিতেই দূর হবে।

বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের মহাসচিব নির্মল চন্দ্র দাস অন্ত্যজ শিশুদের প্রসঙ্গে বলেন, দেশের অন্যান্য শিশুদের মতো অন্ত্যজ শিশুদেরও লেখাপড়া শেখার সমান অধিকার রয়েছে। শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে পারলে পরিবর্তন আসবে অন্ত্যজদের জীবন ধারায়।

8.2 AšÍ¨R †kYx‡ckvi gvbl‡'i wPwKrmv mgm¨v : স্বাস্থসেবার সঙ্কট অন্ত্যজ কলোনিগুলোতে একটি বড় সমস্যা। পুষ্টিহীনতার শিকার কলোনিগুলোর শতকরা ৯৫ ভাগ শিশু। এখানে শিশু মৃত্যুর হারও অন্যান্য এলাকার চেয়ে বেশি। পেটের পীড়া, ডায়রিয়া, আমাশয় যেন এখানকার প্রতিটি মানুষের নিত্যসঙ্গী। প্রত্যেক পরিবারে একজন-দুজন লোক সবসময়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকেন। অন্ত্যজ কলোনির বাসিন্দাদের অভিযোগ, তারা সরকারের দেয়া স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত। নিচুজাতের মানুষ বলে স্বাস্থ্যকর্মীরা তাদের কলোনিতে আসেন না। ময়লা আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ করায় অনেকে চিকিৎসা করতে রাজি হন না। অস্পৃশ্যতা ও নিচু জাতের অজুহাত দিয়ে অনেক ডাক্তার তাদের অবহেলা করেন।

অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার নবীন চন্দ্র দাস বলেন, তৃতীয় সন্তান জন্ম দেয়ার সময় আমার স্ত্রী মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে হাসপাতালে নেয়ার সময় ছিল না। বাইরে থেকে একজন ডাক্তার আনতে গেলে হরিজন কলোনির কথা শুনে তিনি আসতে রাজি হননি। নিচু জাতের বলে বিপদের দিনেও আমরা কাউকে কাছে পাই না।

অন্ত্যজদের বসবাসের কলোনিগুলোর নোংরা পরিবেশই তাদের ডায়রিয়ার প্রধান কারণ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করে অনেকে নিজেকে ঠিকমত পরিষ্কার রাখেন না। আর এ কারণে তারা ঘন ঘন রোগাক্রান্ত হন। কলোনির বাসিন্দা বিজয় দাস বলেন, পোলিও বা অন্যান্য টিকা খাওয়াতে যারা আসেন তারা অনেক সময় কলোনির ভেতরে না ঢুকে দূরে কোথাও বসে খবর পাঠান সেখানে যাওয়ার

জন্য। খবর পেয়ে কেউ সেখানে যান, কেউ যান না। ফলে সরকারের টিকা খাওয়ানো কর্মসূচি থেকেও অন্ত্যজদের অনেক শিশু বাদ পড়ে যায়।

8.3 AšÍ¨R‡'i fvlvi Aejwß : নিজস্ব ভাষায় কথা বলা মানুষের মৌলিক অধিকার। বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর নিজস্ব ভাষা রয়েছে। বাংলায় কথা বলার পাশাপাশি এসব নৃগোষ্ঠীর লোকজন নিজস্ব ভাষায় কথা বলেন। এমনকি কোন কোন নৃগোষ্ঠীর লোকজন তাদের নিজস্ব ভাষায় লেখাপড়া করছেন (যেমন : সাঁওতাল)। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হল, অন্ত্যজদের নিজস্ব ভাষা থাকলেও তারা তা ভুলে যাচ্ছেন। চর্চা না থাকাই এর মূল কারণ বলে জানান তারা।

বাংলাদেশে বসবাসরত অন্ত্যজরা সাধারণত তেলেগু ও হিন্দি ভাষী। তবে তাতে আঞ্চলিকতার প্রভাব রয়েছে। এক সময় অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার লোকদের মধ্যে এ ভাষার ব্যাপক প্রচলন ছিল। নিজেদের সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে তারা সবসময় এ ভাষাতেই কথা বলতেন। শুধু অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার সময় ব্যবহার করতেন বাংলা ভাষা। এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। অন্ত্যজদের মধ্যে এখন বাংলা ভাষার প্রচলনই বেশি। অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে তো বটেই, নিজেদের মধ্যেও তারা এখন বাংলাতেই বেশি কথা বলেন।

এ প্রসঙ্গে ঢাকার গণকটুলী হরিজন কলোনির বাসিন্দা মিঠাই লাল বলেন, এমনিতেই সমাজের মানুষের কাছে আমরা অচ্ছুত। তার ওপর যদি নিজস্ব ভাষায় কথা বলি তবে মানুষ আমাদের আরও নোংরা ভাববে। একটি উদাহরণ দিয়ে মিঠাই লাল বলেন, নিজেদের ভাষায় কথা বললে ভদ্রসমাজ আমাদের এড়িয়ে চলে, কোন কোন ক্ষেত্রে নিগৃহীত হতে হয়। একবার আমি আর আমার ভাই একটি হোটেলে বসে কথা বলছিলাম আর খাচ্ছিলাম। হঠাৎ করে হোটেলের ম্যানেজার এসে মেথরের বাচ্চা বলে গালি দিয়ে আমাদের সেখান থেকে বের করে দেন। আমরা তখন একটি কথাও বলতে পারিনি। আমাদের কি অপরাধ তা জিগ্যেস করার সুযোগ পাইনি। পরে বুঝতে পেরেছিলাম আমাদের কথা শুনে হোটেলের লোকজন বুঝে গিয়েছিলেন, আমরা মেথরের কাজ করি। তাই এখন আর আমরা নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করতে চাই না।

অন্ত্যজ শ্রেণীর রাজিব রবিদাস এ প্রসঙ্গে বলেন, এটা দুঃখজনক। যে দেশে মাতৃভাষার জন্য সংগ্রাম করতে যেয়ে মানুষ জীবন দিয়েছেন, সে দেশে আমরা আমাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলতে ভয় পাই। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অর্ন্তভুক্ত মানুষরা যদি তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলতে পারেন তবে আমাদেরও নিজস্ব ভাষায় কথা বলার সুযোগ দিতে হবে।

8.4 K‡jvwb‡Z gnvRb‡`i †`ŠivZ¥ : অন্ত্যজদের বসবাসের কলোনিগুলো সবসময় রাজনৈতিকভাবে সরগরম থাকে। তার একটি রেশ দেখতে পাওয়া যায় অন্ত্যজদের বসবাসের কলোনিগুলোর ভেতর। বিভিন্ন রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় কলোনিগুলোতে এক শ্রেণীর মহাজন তৈরি হয়েছে। ওইসব মহাজন দরিদ্র অন্ত্যজদের মধ্যে ঋণ দিয়ে মাসে মাসে মোটা অংকের সুদ নিচ্ছেন। মহাজনরা অন্ত্যজ সমাজের আসল চিত্র কাউকে বুঝতে দেন না। নিজেদের স্বার্থে তারা গোটা সমাজকে বঞ্চিত করেন। অন্ত্যজদের বেকারত্বকে পুঁজি করে তারা নিজেরা সুবিধা আদায় করেন। কলোনিগুলোয় যাদের অবস্থা একটু ভাল তারা বেশিরভাগই মহাজনী ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। তারা চান না দরিদ্র অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষরা স্বাবলম্বী হোক।

†Km ÷vwW :

mej P›` `vm : সুবল চন্দ্র দাস বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের উপদেষ্টা সম্পাদক। আমার Key Informant. বংশ পরম্পরায় অন্ত্যজ পেশায় নিয়োজিত। সুবলের কর্মস্থল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট। জীবনের প্রথম কর্মজীবনই শুরু হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝাড়ুদার হিসেবে।

সুবলের স্ত্রী ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ঝাড়ুদার। ঘুম থেকে উঠেই ঝাড়ু হাতে বেরিয়ে পড়তে হয় তাকে। সারাদিন কাজ করে বাসায় ফিরতে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা হয়।

বিয়ের পর তাদের ঘরে একে একে তিনটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। গণকটুলী হরিজন কলোনির দ্বিতীয় তলায় ১০ বর্গফুটের একটি কক্ষে সুবল তার পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন। কলোনির অন্যান্য

হরিজনদের চেয়ে সুবলের অবস্থা অনেকটা ভাল। সুবলের বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে। সারাজীবন অভাবের সঙ্গে লড়াই করে যে টাকা সুবল সঞ্চয় করেছিলেন তাই দিয়ে বড় মেয়ের বিয়ে দেন তিনি। বড় মেয়ের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কলোনির ভেতর ভাল ছেলে দেখে বিয়ের আয়োজন করেন সুবল। সুবলের মেজো মেয়ে ইডেন কলেজে ইতিহাস নিয়ে অনার্স পড়ছেন। তিনি বর্তমানে সম্মান শেষবর্ষে অধ্যায়নরত। ছোট মেয়েটি ইউনির্ভাসিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী। নিজে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করলেও মেয়েদের উচ্চশিক্ষার খরচ বহন করছেন সুবল।

কিছুদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য বরাদ্দকৃত একটি কোয়ার্টার পেয়েছেন তিনি। আরও আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দকৃত কোয়ার্টার পেতে পারতেন সুবল। কিন্তু গণকটুলীর মায়া তিনি ছাড়তে পারেননি। মেয়ের বিয়ের পর স্থান সংকুলান না হওয়ায় পরিবার-পরিজন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টারে উঠেছেন সুবল। কলোনি ছাড়ার আগে ১০ বর্গফুটের ঘরটি বড় মেয়েকে দিয়ে এসেছেন তিনি। বিয়ের পর সুবলের বড় মেয়ে ঐ ঘরেই প্রথম সংসার শুরু করেন। বহু বছর আগে একই ঘরে সুবলও সংসার শুরু করেছিলেন।

সুবল এবং তার পরিবার চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টার থেকে। বর্তমানে বাকি দুই মেয়ের লেখাপড়ার খরচ এবং ভবিষ্যতে মেয়েদের বিয়ের খবচের কথা চিন্তা করে গভীর চিন্তায় পড়েন তিনি।

আক্ষেপ করে সুবল বলেন, কি বলব বাবু! এ জীবন মানুষের জীবন নয়। সারাজীবন শুধু মাথায় করে ময়লাই বয়ে বেড়ালাম। তবে আমি খুশি যে, মেয়ে তিনজনকে কিছুটা হলেও পড়ালেখা করাতে পেরেছি। বড় মেয়েটি ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত লেখাপড়া করলেও স্বনির্ভর। কম্পিউটারের কোর্স করেছেন। এখন একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজও করছেন। মেজো মেয়েটি ইডেনে পড়ছেন। ছোটটিও ছাত্রী ভাল। অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার মানুষের জীবন কষ্টে ভরা। জীবনে আমরা তেমন কিছুই পাই না। এর মধ্যেও পরম পাওয়া যে, আমি গর্ব করে বলতে পারি, আমার একটি মেয়ে অনার্স পড়ে।

খাওয়া-দাওয়ার দৈনন্দিন তালিকায় ছোট মাছ থাকে অধিকাংশ সময়। সবজি খাওয়া হয় প্রতিদিন। অর্থনৈতিক ভাবে অস্বচ্ছল থাকার কারণে মাংস খুব একটা খাওয়া হয় না।

সুবল আরও বলেন, পড়ালেখা করার পাশাপাশি মেয়েদের নানা বায়না। সবসময় সবকিছু দিতে পারি না। বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করে যে টাকা রোজগার করি তার বেশিরভাগই বাড়ি ভাড়া বাবদ কেটে নেয়া হয়। বউ যে টাকা রোজগার করেন তা দিয়ে কোনরকমে দিন কেটে যায়। আরও দুটো মেয়ের বিয়ে বাকি রয়েছে। জানিনা কিভাবে যৌতুকের টাকা যোগাড় করব!

কলোনির বাইরে একবার জায়গা কেনার কথা ভাবছিলেন সুবল। কিন্তু তা আর হয়ে উঠেনি তার। অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার বলে কেউ তার কাছে জায়গা বিক্রি করেননি। দু:খের সঙ্গে সুবল বলেন, একসময় কলোনির বাইরে একটি জমি কিনতে চেয়েছিলাম, বায়নার টাকাও দিয়েছিলাম। জমি বিক্রেতা শেষ পর্যন্ত আমার কাছে জমি বিক্রি করতে রাজি হননি। কারণ, অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষকে প্রতিবেশি না করার জন্য আশেপাশের লোকজন তার ওপর চাপ প্রয়োগ করেছিলেন। বিক্রেতা বায়নার টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। জমি কিনতে না পেরে আমার আর কলোনি ছেড়ে বাইরে বাস করার সুযোগ হয়নি। তবুও আমি অনেকের তুলনায় ভাল আছি। তাছাড়া অন্ত্যজদের সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসছে। অনেক মানুষই আমাদের কাজকে সম্মান দিচ্ছেন।

ভাবতে ভাল লাগে, সুবল চন্দ্র দাস শুধু নিজের পরিবার নিয়ে নয়, আশার আলো দেখেন সমগ্র অন্ত্যজ সমাজকে নিয়েই।

c‡kvËi ce :

bvg : সুবল চন্দ্র দাস

eqm : ৫৮ বছর

wk¶vMZ †hvM¨Zv : অষ্টম শ্রেণী পাশ

†ckv : ঝাড়ুদারি

†ckvi cKwZ : আদি পেশা-তিন প্রজন্ম ধরে এ পেশায় নিয়োজিত

Dhaka University Institutional Repository

IRb: ৭৮ কেজি

D"PZv: ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি

Ab¨ Av‡qi Drm : নেই

Kg¯j : পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Kv‡Ri mgqKvj : সকাল ৭ টা থেকে বিকাল ৫ টা

^eewnK Ae¯v : বিবাহিত

¯vgx/¯xi bvg (weewnZ n‡j) : বৃষ্টি রাণী দাস

¯vgx/¯xi eqm (weewnZ n‡j) : ৪৮

¯vgx/¯xi wkÿvMZ †hvM¨Zv (weewnZ n‡j) : প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই

¯vgx/¯xi †ckv (weewnZ n‡j) : ঝাড়ুদারি

†Q‡j‡g‡qi msL¨v : ৩ মেয়ে

†Q‡j‡g‡qi eqm : যথাক্রমে ২৫, ২৩, ১৭

‡Q‡j‡g‡qi wkÿvMZ †hvM¨Zv : বড় মেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ, মেঝো মেয়ে ইডেন কলেজে ইতিহাসে সম্মান চতুর্থবর্ষের ছাত্রী, ছোট মেয়ে ইউনির্ভাসিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী

†Q‡j‡g‡qi cov‡jLvi cvkvcwk ‡ckv (KgRxex n‡j) : বড় মেয়ে একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন

†Q‡j‡g‡qi ^eewnK Ae¯v : একজন বিবাহিত, বাকি দু'জন অবিবাহিত

bwZ-bvZbxi msL¨v : নেই

cwiev‡i †eKv‡ii msL¨v : ২ জন

cwiev‡i Avq-e¨‡qi cwigvY : পরিবারের মাথাপিছু আয় গড়ে ১৩০০০-১১০০০ টাকা। ব্যয় সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। সঞ্চয় বলতে তেমন কিছুই থাকে না।

Avq e¨‡qi LvZ : বিভিন্ন

Avq e¨‡qi Lv‡Z bvix-ci¤‡li ^elg¨ : সুবলের সংসারে তেমন বৈষম্য নেই

cwiev‡i ewlK mÂq : নেই

cwievi e¨e¯vq cwieZb : পিতৃতান্ত্রিক

cwievi cwiKíbv : গ্রহণ করেছেন

Aemi hvcb : অবসর সময়ে পরিবারের সকলে মিলে ঘুরতে যান

†hŠZK c_v : চরম ভাবে প্রচলিত

we‡q‡Z cvÎ-cvÎxi gZvgZ : পূর্বে বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রীর মতামত গ্রহণ করা না হলেও বর্তমানে পাত্রপাত্রীর মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হয়

^'bw›'b Lvev‡ii ZwjKv : ভাত, সবজি, ছোট মাছ

iÜb-cYvjx/e›Ub : রন্ধন প্রণালী সাধারণ, পরিবারের সব সদস্যের মাঝে সমবন্টন হয়, সাধারণ বাঙালি সমাজের মতই মশলা ব্যবহৃত হয়

ivbvi mgq : সন্ধ্যা

evm¯v‡bi Ae¯v : সুবল বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য বরাদ্দকৃত কোয়ার্টারে থাকেন। বড় মেয়ে গণকটুলী হরিজন কলোনিতে থাকেন। সেখানে ১০ বর্গফুটের একটি কক্ষ, পার্টিশন দিয়ে আরেকটি ছোট ঘর তৈরি হয়েছে, রান্নাবান্না এখানেই করা হয়

N‡i emevmKvixi msL¨v : ৪ জন

cqtwb®vlY cYvjx, m¨wb‡Ukb e¨e¯v : মোটামুটি
কলোনিগুলোতে অবশ্য সবার জন্য কমন শৌচাগার

cwb l we'¨r e¨e¯v : অপ্রতুল

Avmevecî : আসবাবপত্র অধিকাংশই কাঠের

†cvkvK-cwi‡"Q‡'i aiY : মেয়েরা শাড়ি, সেলোয়ার কামিজ এবং ছেলেরা শার্ট, প্যান্ট, লুঙ্গি ও ধুতি পড়েন

AmL n‡j wPwKrmv e¨e¯v : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেন্টার

ivR‰bwZK msMV‡bi cfve : কলোনিতে চরম ভাবে বিদ্যমান

†fvU c'v‡bi AwaKvi : আছে

'wjZ msMVb ev mwgwZ : বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ

'wjZ msMV‡bi MVbcYvjx, Kvhµg, mdjZv, wedjZv (_vK‡j) : এখন পর্যন্ত তেমন কোন সফলতা নেই

Dhaka University Institutional Repository

beg Aa¨vq

evsjv‡‘k nwiRb HK¨ cwil‘ MVb

অন্ত্যজরা বাংলাদেশের একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। হাজার হাজার অন্ত্যজ পরিবার বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত অন্ত্যজদের কলোনিগুলোতে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এ মানবেতর অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে অন্ত্যজরা বাংলাদেশে হরিজন ঐক্য পরিষদ গঠন করেছে। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ গঠনের ইতিহাস, গঠনতন্ত্র, হরিজন ঐক্য পরিষদের দাবীনামা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

9.1 evsjv‡‘k nwiRb HK¨ cwil‘ MV‡bi BwZnvm : অন্ত্যজদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বাংলাদেশে অন্ত্যজ শ্রেণীগোষ্ঠীর মানুষরা আঞ্চলিক পর্যায়ে গোত্রভিত্তিক কিছু ছোট ছোট সংগঠন তৈরি করে অধিকার আদায় এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালাতেন। এতে কেউ সফল হতেন, কেউ হতেন না। এভাবেই চলে আসে আশির দশক পর্যন্ত। এক সময় অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের নেতারা উপলব্ধি করেন যে, তাদেরকে একটি প্লাটফর্মে দাঁড়ানো দরকার। তা না হলে তাদের ওপর যে আঘাত আসছে তা মোকাবিলা করা যাবে না। বিশেষ করে যখন তারা পৈতৃক পেশা থেকে মারাত্মকভাবে বঞ্চিত হতে থাকেন তখন সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ হতে একটি প্লাটফর্ম গঠনে উদ্যোগী হন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯২ সালের ১ মে বগুড়ায় দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা অন্ত্যজদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে ১৬ সদস্যের একটি টুর কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির আহ্বায়ক হন বগুড়ার অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের নেতা ঘুটু রাম হাড়ি। ওই কমিটি দীর্ঘ সাতবছর সারা দেশের অন্ত্যজদের সঙ্গে বৈঠক করে ঝাড়ুদারি পেশায় অ-হরিজন প্রবেশের প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ঝাড়ুদারি পেশায় অ-হরিজনদের প্রবেশের কারণে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের লোকেরা যে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং তাদের মধ্যে দিন দিন বেকার সংখ্যা বেড়েই চলেছে–এ বিষয়টি টুর কমিটি গোটা দেশের অন্ত্যজদের সামনে তুলে ধরেন। পাশপাশি তারা জাতীয় পর্যায়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলার কথা বলেন। অন্ত্যজরা বিষয়টি উপলব্ধি করেন এবং সবাই মিলে জাতীয় পর্যায়ে একটি সংগঠন করতে সম্মত হন। অবশেষে ১৯৯৮ সালের ১০ জুলাই বগুড়া জেলা অ্যাডওয়ার্ড পার্ক টিটো

মিলনায়তনে সারা দেশের অন্ত্যজদের প্রতিনিধিদের একটি মহাসম্মেলন আহ্বান করা হয়। ওই সম্মেলনে গঠন করা হয় বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হন ঘুটুরাম হাড়ি। পরে তিনি সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। পরিষদের বর্তমান সভাপতি কৃষ্ণলাল ও মহাসচিব নির্মল চন্দ্র দাস।

9.2 evsjv‡‘k nwiRb HK¨ cwil‡‘i MVbZš : সারা দেশের অন্ত্যজদের প্রধান চারটি গোত্রীয় সংগঠন এক হওয়ার মাধ্যমে তৈরি হয় বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ। সংগঠন চারটি হল–

১. বাংলাদেশ সংযুক্ত হরিজন সংঘ

২. উত্তরবঙ্গ হরিজন ফেডারেশন

৩. বাংলাদেশ বাঁশফোর হরিজন ঐক্য পরিষদ

৪. বাংলাদেশ হেলা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

এ প্রসঙ্গে মহাসচিব নির্মল চন্দ্র দাস বলেন, এখন আর আমাদের মধ্যে কোন বিভক্তি নেই। আমরা সবাই এখন একই কাতারে সামিল হয়েছি। জাতীয় পর্যায় থেকে এদেশের অন্ত্যজদের অধিকার আদায়ে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে।

পরিষদের সভাপতি কৃষ্ণ লাল বলেন, সাংগঠনিকভাবে এখন আমরা বেশ শক্তিশালী। আমরা দীর্ঘদিনের অবহেলিত নিগৃহীত অন্ত্যজরা মৌলিক চাহিদা এবং মানবাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ঐক্য গঠনে সক্ষম হয়েছি। সাংগঠনিক তৎপরতা বাড়াতে পারলে আমরা জাতীয় পর্যায়ে আমাদের চাওয়া পাওয়া আদায় করতে সক্ষম হব। কারণ সবার আন্তরিক প্রচেষ্টা কখনও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় না। তিনি আরও বলেন, জেলায় জেলায় ঐক্য পরিষদের কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে সারাদেশের অন্ত্যজরা একটি নেটওয়ার্কের মধ্যে চলে এসেছেন। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, দাবী দাওয়া এবং করণীয় সম্পর্কে এখন সবাইকে জানানো ও একত্র করা সম্ভব।

নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে অন্ত্যজদের দাবীনামাগুলো জানার চেষ্টা করি। নিচে তাদের দাবীনামাগুলো নিয়ে আলোচনা করা হল।

9.3 evsjv‡‘k nwiRb HK¨ cwil‡‘i ‘vexbvgv :

K) PvKwi :

১. আদি পেশাজীবী জাত হরিজনদের সরকারি-বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরি প্রদানের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা দিতে হবে।

২. প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় পেশাজীবী হরিজনদের চাকরি নিশ্চিত করতে হবে।

৩. ঘুষ ও দুর্নীতি বন্ধে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অন্ত্যজদের ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করার কাজে নিয়োগ দিতে হবে।

৪. প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় অন্ত্যজদের স্থায়ী নিয়োগ দান করে সরকারি স্কেলের ভিত্তিতে বেতন প্রদান করতে হবে।

৫. বাংলাদেশের সব সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় বেতন বৈষম্য দূর করে বর্তমান বাজারের প্রতি লক্ষ্য রেখে বেতন কাঠামো গঠন করতে হবে।

৬. সব সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে অন্ত্যজদের মধ্যে অবসর গ্রহণকারী এবং মৃত ব্যক্তির পদে তাদের পরিবারবর্গকে চাকরির সুযোগ দিতে হবে।

৭. ঝাড়ুদার পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রকৃত ও আদি পেশাজীবী এ মর্মে সনদ বা প্রমাণপত্র বিহীন অ-হরিজনদের ঝাড়ুদার পদে নিয়োগ বন্ধ করতে হবে।

৮. যে সব সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ঝাড়ুদার নিয়োগ বন্ধ রয়েছে সেখানে অবিলম্বে ওই নিয়ম প্রত্যাহার করে পুনঃ নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. ঝাড়ুদার পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করতে হবে।

১০. অন্ত্যজ শ্রেণীর শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের জন্য সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ১০% চাকরির কোটা দিতে হবে।

১১. অন্ত্যজরা যে জিনিসপত্র তৈরি করেন তার মূল্য বৃদ্ধি করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১২. অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার মহিলারা যেন হাতের কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে পারেন সেজন্য কুটিরশিল্প স্থাপন করতে হবে।

L) evm¯vb :

১. যুগ যুগ ধরে অন্ত্যজরা যেসব কলোনিতে বসবাস করছেন সেগুলো তাদেরকে স্থায়ীভিত্তিতে বরাদ্দ দিতে হবে।

২. দেশের প্রতিটি সিটি কলোনি ও পৌর কলোনির জরাজীর্ণ ভবনগুলো সংস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. প্রয়োজনে নতুন বাসস্থান নির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে। পানীয় জল, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পয়ঃপ্রণালী তৈরিসহ স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

4. প্রতিটি অন্ত্যজ কলোনির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

M) wk¶v :

১. বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত অন্ত্যজ শ্রেণীর সন্তান-সন্ততিদের অবৈতনিকভাবে শিক্ষার সুযোগ ও বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

২. উচ্চ শিক্ষার জন্য উচ্চ বিদ্যাপীঠ–যেমন : দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে কোটার ভিত্তিতে ভর্তি করিয়ে নিতে হবে।

৩. উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পর যোগ্যতা অনুযায়ী অন্ত্যজ শ্রেণীর সন্তানদের চাকরির সুযোগ দিতে হবে।

৪. দেশের প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার পরিচালনা পরিষদে মোট সদস্যের মধ্যে অন্তত দুই শতাংশ অন্ত্যজ শ্রেণীর ঝাড়ুদারদের ভেতর থেকে সরকারি ভাবে মনোনয়ন করতে হবে।

N) wPwKrmv :

প্রতিটি চিকিৎসা কেন্দ্রে অগ্রাধিকারভাবে অন্ত্যজদের চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। জটিল কোন রোগ হলে সরকারি চিকিৎসা দিতে হবে।

0) Kj¨vY :

১. অন্ত্যজদের কল্যাণার্থে কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করতে হবে। ট্রাস্ট পরিচালনায় অন্ত্যজদের প্রতিনিধি মনোনয়ন করতে হবে।

২. বাংলাদেশ স্বাধীন করতে যেসব অন্ত্যজ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়েছেন এবং যারা এখনও বেঁচে আছেন সরকারিভাবে তাদের মূল্যায়ন করে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় তাদের নাম প্রকাশ করতে হবে।

৩. অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পরিবার পরিজনকে সরকারিভাবে সহযোগিতা করতে হবে।

৪. বয়স্ক ভাতা প্রদানের বিষয়টি অন্ত্যজদের মধ্যে চালু করতে হবে।

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, চাকরিসহ ইত্যাদি বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন করতে পারলে অন্ত্যজদের জীবনমানের আরও উন্নয়ন ঘটবে। তারা চাইলে বংশ পরম্পরায় তাদের পেশা টিকিয়ে রাখতে পারবে আবার সমাজের অন্যান্য পেশায়ও ভূমিকা রাখতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

‘kg Aa¨vq

Dcmsnvi I mvigg

যুগ যুগ ধরে অন্ত্যজরা অবহেলিত ও অবজ্ঞার পাত্র। বর্তমানে তারা একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার পরেও তারা নাগরিকত্বের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। হাজার হাজার অন্ত্যজ পরিবার বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত অন্ত্যজদের কলোনিগুলোতে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। অন্ত্যজরা সমাজকে পরিষ্কার করে রাখলেও নিজেরা থাকছেন অপরিষ্কার, অস্বাস্থ্যকর, ঘিঞ্জি পরিবেশের মধ্যে। যুবসমাজ লেখাপড়ার বদলে মাদক ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করে আছেন। পৈত্রিক পেশা হারানোর ভয়, বিকল্প পেশার সন্ধানে গিয়ে না পেয়ে ফিরে আসা ইত্যাদি সব কিছুই তাদের হতাশাগ্রস্থ করে তুলেছে। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে প্রাপ্য মৌলিক অধিকারগুলো থেকে বঞ্চিত হয়ে ভাল ভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করাও তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাড়িয়েছে।

আমার গবেষণাপত্রের প্রথমেই উঠে এসেছে মূলত গবেষণার বিষয় নির্বাচনের যৌক্তিকতা, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষিত এলাকা, মাঠকর্মের অভিজ্ঞতা, গবেষণার সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি বিষয়। উল্লেখ্য, অন্ত্যজরা সমাজের সেবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। তাদের জীবনের এক পাশে যেমন রয়েছে বেদনা ও বঞ্চনার ইতিহাস তেমনি অন্যপাশে রয়েছে আধুনিক জীবনের হাতছানি। প্রান্তিক এ জনগোষ্ঠীর ওপর কাজ করতে গিয়ে আমি খুঁজে বের করতে চেয়েছি দলিত ও হরিজন শব্দ দুটোর বিতর্ক। অন্ত্যজদের উপর গবেষণা করার সময় আমার উদ্দেশ্য হিসেবে কাজ করেছে তারা কিভাবে দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে তা দেখা, সত্যিই অন্ত্যজরা অস্পৃশ্য কিনা নাকি এটা একটা মিথ তা অন্ত্যজদের সাংস্কৃতিক অনুধাবনে দেখার চেষ্টা করা, অন্ত্যজদের নিজেদের জীবনে শুচি-অশুচির ধারণা কিভাবে কাজ করছে তা দেখা, যাদের সঙ্গে অন্ত্যজরা মিশছেন তাদের মধ্যে শুচি-অশুচির ধারণা কিভাবে কাজ করছে তা দেখার চেষ্টা করা, শুচি-অশুচির বিষয়টি কিভাবে তাদের জীবনকে প্রভাবিত করছে বা সামাজিক সচলতায় কি ভূমিকা রাখছে তা দেখা, দলিত শ্রেণী হিসেবে অন্ত্যজরা কিভাবে মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত কিংবা আদৌ বঞ্চিত কিনা তা

দেখার চেষ্টা করা, অন্ত্যজদের মধ্যে লিঙ্গীয় সম্পর্কের ধরণ, আদি হরিজন এবং মুসলমান পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের মধ্যে ক্ষমতায়নের দ্বন্দ্ব এবং একই ঘেরাটোপে তাদের যৌথ বসবাসের বিষয়টি নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করা ইত্যাদি। আমার গবেষণায় সামাজিক সচলতা প্রত্যয়টি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্ত্যজদের সামাজিক বিচ্ছিন্নতা থেকে সরে এসে বর্তমান প্রেক্ষাপটে তারা কতটুকু সচল তা দেখার তাগিদ অনুভব করেছি। এ তাগিদ থেকেই এ গবেষণা করার প্রয়াস নিয়েছি।

তারপর মূলত তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট ও সাহিত্য পর্যালোচনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অন্ত্যজদের উপর কাজ করার সময় বেশকিছু তাত্ত্বিকের তত্ত্ব আমি গ্রহণ করেছি। এ তত্ত্বগুলো নানা ভাবে আমাকে অন্ত্যজদের সামাজিক সচলতা এবং তাদের মধ্যে বিদ্যমান শুচি-অশুচিতা দেখতে সহায়তা করেছে। সে সঙ্গে তত্ত্বগুলো গবেষণায় মূল কাঠামো হিসেবে কাজ করেছে।

আমার গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণের মূল ভিত্তি তৈরিতে সহায়ক হয়েছেন কার্ল মার্ক্স, এমিল ডুর্খেইম ও ম্যাক্স ওয়েবার। তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই ষাট-সত্তর দশকের ধারাগুলো আমার গবেষণায় তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণে ব্যবহার করেছি।

আমার গবেষণায় আন্তোনিও গ্রামসির তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। আমি আমার গবেষণায় দেখেছি অন্ত্যজরা কিভাবে বৃহৎ গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ধরে রাখে। আদি হরিজন ও মুসলমানদের মধ্যে দার্শনিক নেতৃত্ব কিভাবে বিরাজ করে তা বুঝতে আমাকে সহায়তা করেছে আন্তোনিও গ্রামসি। তাঁর দর্শনে যে সাবলটার্ন ইতিহাসের সূত্রপাত সেটি নিঃসন্দেহে আমার গবেষণাধীন জনগোষ্ঠী অন্ত্যজদের বিবর্তনশীল সামাজিক বিন্যাস এবং সামাজিক সম্পর্কের জটিল ও বহুস্তর বিশিষ্ট বাস্তবতাটিকে সত্যের অনেক কাছাকাছি এনে ব্যাখ্যা করে। তাছাড়া গ্রামসির উক্তি, 'বুর্জোয়ারা হেজেমনিক ভাবেও শাসন করে'-একথাটি অন্ত্যজদের জীবনযাত্রা দেখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অন্ত্যজদের উপর গবেষণা করার সময় নৃতাত্ত্বিক বারনার্ড কোহনের পৃথকীকরণ তত্ত্বও আমাকে প্রভাবিত করেছে। বর্তমানে ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটের তুলনায় বাংয়লাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট আলাদা। এদেশের সমাজব্যবস্থা এখন অনেকটাই বর্ণভিত্তিকের তুলনায় শ্রেণীভিত্তিক। শ্রেণীভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আমরা কেমন করে অন্ত্যজদের কলোনির ঘেরাটোপে আলাদা করে রেখেছি, সামাজিক ভাবে একরকম বয়কট করে যুগের পর যুগ মূল ধারা থেকে পৃথক করে অশুচির তকমা লাগিয়ে রেখেছি, তাদের নিচু হিসেবে বিবেচিত করে শ্রেণীর বাইরে রেখেছি (যেমন করে আগে তাদের চর্তুবর্ণের বাইরে রাখা হত) তা বুঝতে আমাকে পৃথকীকরণ তত্ত্ব সহায়তা করেছে।

গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে লুই দুমোঁ। তিনি বলেন, অচ্ছুতের ধারণার উৎপত্তি অস্থায়ী অশুচিতায় গ্রথিত। অশুচ কাজে নিয়োজিত হওয়ার কারণে কিছু বর্গের মানুষজন চরম অশুচি কিংবা স্থায়ী ভাবে অশুচি বিবেচিত হন। যেমন : আমার গবেষিত জনগোষ্ঠী অন্ত্যজরা। তাছাড়া দুঁমোই বলেন, ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথায় প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। কাউকে বাদ দিয়ে অন্যেরা চলতে পারেন না। মূলত দুঁমোর এ বক্তব্য অন্ত্যজ সমাজ গবেষণায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

যদিও সাম্প্রতিককালে দুমোঁর কাজের তীব্র সমালোচনা করেন দীপঙ্কর গুপ্ত, নিকোলাস ডার্কস্, রনাল্ডইন্ডেন ও অর্জুন আপ্পাদুরাই।

আমার গবেষণায় অন্ত্যজ শ্রেণী সম্পর্কিত গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণে সবচেয়ে শক্তিশালী তত্ত্বটি প্রদান করেন মিশেল ফুকো। ফুকো যখন প্রতাপের ছায়ায় বন্দীশালা, চিকিৎসালয়, যৌনতা, নৈতিকতা ও সাহিত্যিক পাঠকৃতিকে লালিত হতে দেখেন–আমরাও নতুন চোখে যেন আমাদের পৃথিবীটাকে দেখতে শিখি। আমি আমার গবেষণার প্রেক্ষাপটে বলতে পারি, অন্ত্যজদের মধ্যে আমি দেখেছি, ক্ষমতাহীনদের মধ্যেও ক্ষমতা আছে। যদিও বর্তমান সময়কালে বাংলাদেশে অন্ত্যজরা একটি অধিকার বঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। দেশে বসবাসকারী অন্যান্য বাংলাদেশীদের তুলনায় অন্ত্যজরা সমাজে মারাত্মকভাবে বঞ্চিত ও অবহেলিত। ফলে তারা ধরেই নিয়েছেন যে, তারা

ক্ষমতাহীন, অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় তারা দুর্বল। তাই নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের এই মানসিকতা একদিনে তৈরি হয়নি বরং বছরের পর বছর প্রতাপের ছায়ায় থাকতে থাকতে অন্ত্যজদের এ বিশ্বাস তৈরি হয়েছে। আধুনিক সমাজের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধাকে তারা সন্দেহের চোখে দেখেন। সবকিছুই Fake বা ভুয়া মনে করেন। ফুকো যখন বারবার বলেন 'Everything is Fake' তখন গবেষক হিসেবে অন্ত্যজদের পরিবর্তনশীল সত্যকে তুলে ধরা আমার জন্য সহজ হয়। চ্যালেঞ্জ করতে ইচ্ছা করে গবেষিত জনগোষ্ঠীর বিরাজমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সমস্যা, মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়, বঞ্চনা, প্রেম, যৌনতা ইত্যাদি সব কিছুকে।

শুচি-অশুচির বিষয়টি নিয়ে কাজ করার সময় মেরী ডগলাসের তত্ত্বটি ভাবনা চিন্তার ইচ্ছা রয়েছে। কারণ মেরী ডগলাসের কেন্দ্রিয় বিষয় ছিল নোংরা, ময়লা বা অশূচি। আধুনিক সমাজের বাস্তবতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শুচি-অশুচির বর্তমান রূপ। উল্লেখ্য, অন্ত্যজরা সমাজে ময়লা-আবর্জনা পরিস্কার করে। অর্থাৎ তারা সমাজের সেবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। সমাজকে ধুয়ে-মুছে পরিচ্ছন্ন রাখে। কিন্তু তারা নিজেরা থাকছেন নোংরা পরিবেশে।

তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণে প্রতীকবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণে তাই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে ভিক্টর টার্নার। তিনি মনে করতেন সমাজ কাঠামোর মধ্যে কেন্দ্রীয় ক্রিয়াশীল বিষয় হচ্ছে অভিজ্ঞতা যা প্রতীকরূপে অবস্থান করে। ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনাবলীই কিছু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রূপকে পরিণত হয়। গবেষক হিসেবে আমার কাজ ছিল অন্ত্যজদের মধ্যে এ প্রক্রিয়াগুলো কিভাবে কাজ করে তা দেখা।

তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট আলোচনার পরে গবেষণার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। সাহিত্য পর্যালোচনায় অর্ন্তভুক্ত বইগুলো কিভাবে গবেষণার সঙ্গে সংযুক্ত তাও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

গবেষণার পদ্ধতিসমূহ নিয়ে আলোচনায় প্রথমে আমার গবেষণার সময়সীমা নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরে গণকটুলীকে গবেষণাক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেয়ার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়। অতঃপর গবেষক হিসেবে আমার গবেষণাক্ষেত্রে প্রবেশ এবং নৃবৈজ্ঞানিক বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন নিয়ে আলোচনা করা

হয়। তারপর গবেষণার বিভিন্ন ধাপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। মূলত আমার গবেষণায় কিছু মিশ্র গবেষণা পদ্ধতি লক্ষ্যণীয়। এখানে যেমন অনানুষ্ঠানিক কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে ঠিক তেমনি ভাবে ধ্রুপদি অংশগ্রহণমূলক গবেষণা পদ্ধতির ধারা থেকে সরে এসে ক্রিয়াবাদ এবং তার পরবর্তী ধারাবাহিকতায় সমালোচনামূলক বিতর্কটি মাথায় রেখে বর্তমান নৃবৈজ্ঞানিক ধারাগুলো আমার সুবিধা অনুযায়ী ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়েছে। মাঠ গবেষণায় গিয়ে আমি দেখেছি গুণগত পদ্ধতিতে কাজ করলে গবেষণাটি আরও গভীরতর হয়। তাই আমি আমার গবেষণাকর্মে গুণগত পদ্ধতি ব্যবহারের চেষ্টা করেছি। এ অধ্যায়েই গবেষণার প্রত্যয় সমূহকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরে তথ্য সংগ্রহের উপকরণ এবং গবেষণার নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

গবেষণাপত্রে সামাজিক সচলতায় অন্ত্যজ শ্রেণী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর দক্ষিণ এশীয় প্রেক্ষাপট, অন্ত্যজদের পেশার ইতিহাস এবং সামাজিক সচলতায় অন্ত্যজদের অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অন্ত্যজদের মধ্যে সামাজিক সচলতা দেখাতে যেয়ে সাম্যবাদী দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামসির সাবলটার্ন ইতিহাসের সূত্রপাতের দর্শন আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে উঠে এসেছে। আরও দেখানো হয়েছে পরিবর্তশীল সমাজব্যবস্থা জাতিপ্রথাকে কিভাবে প্রভাবিত করে। এ অধ্যায়ে শ্রীনিবাসের সংস্কৃতায়ন প্রত্যয়টি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে যেখানে দেখানো হয়েছে, ভারতবর্ষের প্রায় সব অঞ্চলেই বিভিন্ন জাতির এ ধরণের সংস্কৃতায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। তার মধ্যে অন্ত্যজরাও অর্ন্তভুক্ত। আমার গবেষণায় উঠে এসেছে, অন্ত্যজরা তাদের অনেকক্ষেত্রে আলাদাই রাখতে চাইছে। এখানে তাদের প্রাপ্তির ব্যাপারটিও কাজ করেছে। পরবর্তীতে এ অধ্যায়ে সামাজিক সচলতা দেখাতে যেয়ে লুই দুমো ও মিশেল ফুকোর তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণাপত্রে অন্ত্যজদের মধ্যে শুচি-অশুচির বর্তমান রূপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে উঠে এসেছে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় শুচি-অশুচির গভীরতা, সমাজে অস্পৃশ্য অন্ত্যজরা, ঘিঞ্জি পরিবেশে মানবেতর জীবন-যাপন, কলোনির অন্ত্যজদের মাদক ব্যবসায় জড়িয়ে পড়া, Rites of Passage বা অবস্থান্তরের আচার ও অন্ত্যজ সমাজ ইত্যাদি বিষয়। গবেষণার অর্ন্তভুক্ত একটি কেসস্টাডিও এ অধ্যায়ে সংযুক্ত করা হয়েছে।

অন্ত্যজদের মধ্যে নারী ও পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার রূপ, সম্পর্ক, লিঙ্গ বৈষম্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অন্ত্যজ নারী অধ্যায়টি লিখতে যেয়ে আমি লিঙ্গীয় সম্পর্কের বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবং তাদের ক্ষমতার ব্যাপারটি কাছ থেকে দেখেছি। এ অধ্যায়ে অন্ত্যজ নারীদের মজুরিগত বৈষম্য, অবহেলিত প্রজননস্বাস্থ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ মাতৃত্ব, মাতৃত্বকালীন ছুটির অস্বীকৃতি, অন্ত্যজ শ্রেণীর নিরাপত্তাহীনতা এবং কেসস্টাডি সংযুক্ত করা হয়েছে।

গবেষণায় অন্ত্যজদের জীবন ও জীবিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে অন্ত্যজদের পৈত্রিক পেশায় অনিশ্চয়তা, অন্ত্যজদের বিকল্প পেশার সন্ধান, অন্ত্যজদের আয়, রোজগার ও ব্যয় এবং প্রাসঙ্গিক কেসস্টাডি সংযুক্ত হয়েছে।

পরে অন্ত্যজদের ক্ষেত্রে মৌলিক মানবাধিকারের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে উঠে এসেছে অন্ত্যজ শ্রেণীপেশার মানুষের শিক্ষাহীনতা, চিকিৎসা সমস্যা, অন্ত্যজদের ভাষার অবলুপ্তি, কলোনিতে মহাজনদের দৌরাত্ম ও কেসস্টাডি।

গবেষণার শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ গঠন নিয়ে আলোচনা রয়েছে। এ অধ্যায়ে উঠে এসেছে বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ গঠনের ইতিহাস, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের গঠনতন্ত্র এবং বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের দাবীনামা। অন্ত্যজদের দাবীনামার মধ্যে চাকরি, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয় উঠে এসেছে।

তাছাড়া গবেষণাপত্রের শেষে প্রশ্নমালা, সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি, গবেষিত এলাকার বিভিন্ন ছবি সংযুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিয়ে গবেষণা হয়েছে খুব সীমিত। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থাকলেও তাদের কাজের প্রকৃত মূল্যায়ন কোনদিন হয়নি। কোন সরকারই তাদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেনি। স্বাধীনতার ৪৭ বছর পর তারা আগের তুলনায় অনেক বেশি অধিকার বঞ্চিত। আমার গবেষণার মাধ্যমে যদি তাদের জীবনের প্রকৃত চিত্র ফুটে ওঠে তাহলে আমার গবেষণা সার্থক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

Dhaka University Institutional Repository

ms‡hvRbx-1

ckgvjv

KvVv‡gvMZ ckgvjv **(Structured Questionnaire):**

নাম :

বয়স :

শিক্ষাগত যোগ্যতা :

পেশা :

পেশার প্রকৃতি :

অন্য আয়ের উৎস :

কর্মস্থল :

কাজের সময়কাল :

বৈবাহিক অবস্থা :

স্বামী/স্ত্রীর নাম (বিবাহিত হলে) :

স্বামী/স্ত্রীর বয়স (বিবাহিত হলে) :

স্বামী/স্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা (বিবাহিত হলে) :

স্বামী/স্ত্রীর পেশা (বিবাহিত হলে) :

ছেলেমেয়ের সংখ্যা :

ছেলেমেয়ের বয়স :

ছেলেমেয়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা :

ছেলেমেয়ের পড়ালেখার পাশাপাশি পেশা (কর্মজীবী হলে) :

ছেলেমেয়ের বৈবাহিক অবস্থা :

নাতি-নাতনীর সংখ্যা :

পরিবারে বেকারের সংখ্যা :

পরিবারে আয়-ব্যয়ের পরিমাণ :

আয় ব্যয়ের খাত :

Dhaka University Institutional Repository

আয় ব্যয়ের খাতে নারী-পুরুষের বৈষম্য :

পরিবারে বার্ষিক সঞ্চয় :

বর্তমানে পরিবার ব্যবস্থার ধরণ :

পূর্বে পরিবারের ধরণ :

পরিবার ব্যবস্থায় পরিবর্তন :

পরিবার পরিকল্পনা :

অবসর যাপন :

যৌতুক প্রথা :

বিয়েতে পাত্র-পাত্রীর মতামত :

দৈনন্দিন খাবারের তালিকা :

রন্ধন-প্রণালী/বন্টন :

রান্নার সময় :

বাসস্থানের অবস্থা :

সরকারি বাসা/ ব্যক্তিগত বাসা :

পরিবার প্রতি ঘরের সংখ্যা :

প্রতি ঘরে বসবাসকারীর সংখ্যা :

পয়ঃনিষ্কাষণ প্রণালী, স্যানিটেশন ব্যবস্থা :

পানি ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা :

আসবাবপত্র :

পোশাক-পরিচ্ছেদের ধরণ :

অসুখ হলে চিকিৎসা ব্যবস্থা :

সরকারি সেবা/ব্যক্তি উদ্যোগে চিকিৎসা :

সেবার মান সম্পর্কে অভিমত :

রাজনৈতিক সংগঠনের প্রভাব :

ভোট প্রদানের অধিকার :

দলিত সংগঠন বা সমিতি :

দলিত সংগঠনের গঠনপ্রণালী, কার্যক্রম, সফলতা, বিফলতা (থাকলে) :

Dhaka University Institutional Repository

Oral History/ Life History:

ঝাড়ুদারি পেশার ইতিহাস কি?

কয় প্রজন্ম ধরে এ পেশায় নিয়োজিত?

এ পেশায় কিভাবে এলেন?

পেশা পরিবর্তনের ইচ্ছা রয়েছে কি না?

পেশা পরিবর্তনের সুযোগ কতটুকু?

এ পেশার সুযোগ-সুবিধা/অসুবিধাগুলো কি কি?

অন্ত্যজ পেশায় কতটুকু সন্তুষ্ট?

অন্য কোন উৎস থেকে অর্থ রোজগার হয় কি না?

পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি হলে স্বল্প জায়গায় কিভাবে থাকেন?

কলোনিগুলোর সামাজিক অবস্থা কেমন?

কলোনিগুলো বসবাসের জন্য কতটুকু স্বাস্থ্য সম্মত?

রোগ-ব্যাধি কি পরিমাণ হয়?

স্থান সংকুলানের অভাবে রাতে কিভাবে ঘুমান?

বছরে কয়বার কাপড় কেনেন?

কি ধরনের অসুখ বেশি হয়?

কোথায় চিকিৎসা গ্রহণ করেন?

বেসরকানি সংগঠনগুলো থেকে কতটুকু সহায়তা পান?

কাজের ফাঁকে অবসরে কি করেন?

বিয়েতে পাত্র-পাত্রীর মতামত গৃহীত হয় কিনা?

রাজনৈতিক ভাবে প্রভাবিত হন না?

নিজের পছন্দ অনুযায়ী ভোট দিতে পারেন কিনা?

বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের সদস্য কি না?

পেশাজীবী হরিজনদের দাবী দাওয়াগুলো কি কি?

Dhaka University Institutional Repository

ms‡hvRbxÑ2

mnvqK MšcwÄ

Asaduzzaman, A

2001 The Pariah People, An Ethnography of the Urban Sweepers in Bangladesh, Dhaka: University Press Limited.

Asad, Talal, ed.

1973 Anthropology and the Colonial Encounter, New York: Humanities Press.

Asad, Talal

1993 Genealogies of Religion; Maryland: Johns Hopkins University Press.

Arens, Jenneke; Beurden, Jos Van

1977 Jhagrapur: Poor Peasants and Women in a Village in Bangladesh, Amsterdam: Arens and Van Beurden.

Anderson, Perry

2017 The Antinomies of Antonio Gramsci, London: Verso.

Appadurai, Arjun

2013 The Future as Cultural Fact: Essays on the Global Condition, London: Verso.

Bernard, H. Russell
2011 Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches, Lanham: AltaMira.

Bernard, H. Russell
1988 Research Methods in Cultural Anthropology, Newbury Park: Sage Publications.

Beteille, Andre
1965 Caste, Class and Power: Changing Social Stratification in a Tanjore Village, Berkeley: University of California Press.

Beteille, Andre
1972 Inequality and Social Change, Delhi: Oxford University Press.

Barnard, Alan
2000 History and Theory in Anthropology, Cambridge: Cambridge University Press.

Bailey, F.G.
1957 Caste and the Economic Frontier: A Village in Highland Orissa, Manchester: Manchester University Press.

Begum, Farhana
2015 Women's Reproductive Illness: Capital and Health Seeking, Dhaka: Dhaka University Prakashana Sangstha.

Clifford, James and George Marcus, ed.
1986 Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, Berkeley: University of California Press.

Cohn, Bernards
1971 India: the social anthropology of a civilization, Oxford: Oxford University Press.

Cohn, Bernards
1955 The Changing Status of a Depressed Caste, In Mckim Marriot, ed. Village India: Studies in Little Community, Chicago: University of Chicago Press.

Dumont, Louis
1970 Homo Hierarchicus: The Caste System and It's Implications, 2nd edn (revised), Chicago: University of Chicago Press.

Dirks, Nicholas
2001 Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India, Princeton: Princeton University Press.

Danaher, Geoff; Schirato, Tony; Webb, Jen
2000 (2001) Understanding Foucault, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited.

Denzin, Norman K.
2000 Handbook of Qualitative Research, California: Sage Publications.

Douglas, Mary
1966 Purity and Danger, New York: Routledge.

Douglas, Mary
1970 Natural Symbols: Explorations in Cosmology, London: Barrie and Rockliff.

Durkheim, Emile
1912 (1995) The Elementary Forms of the Religious Life, New York: The Free Press.

Durkheim, Emile
1982 (1895) Rules of Sociological Method, ed. Steven Lukes. New York: Free Press.

Fetterman, David M.
2010 Ethnography: Step by Step, London: Sage.

Fardon, Richard
1999 Mary Douglas: An Inteliectual Biography; London: Routledge.

Foucault, Michel
1980 Power/Knowledge: Selected Interviews and other Writings. Colin Gordon ed. New York: Pantheon.

Foucault, Michel
1976 The History of Sexuality: An Introduction, London: Allen Lane.

Foucault, Michel
1972 The Archaeology of Knowledge, London: Tavistock.

Foucault, Michel
1977 Descipline and Punish-The Birth of the Prison, London: Allen Lane.

Gutting, Gary
2005 Foucault: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press.

Gennep, Arnold van
1960 The Rites of Passage, Hove: Psychology Press.

Giddens, Anthony
1983 (1973) The Class Structure of the Advanced Societies, London: Hutchinson.

Geertz, Clifford
1973 The Interpretation of Cultures, New York: Basic Books.

Giddens, Anthony
1971 Capitalism and Modern Social Theory. An Analysis of the Writings of Marx, Durkheim and Max Weber, Cambridge: Cambridge University Press.

Gramsci, Antonio
1971 Selection from the Prison Notebooks, New York: International Publishers.

Gupta, Dipankar
1991 Social Stratification, Oxford: Oxford University Press.

Inglis, Fred
2000 Clifford Geertz: Culture, Custom and Ethics, Cambridge: Polity Press.

Karim, A. K. Nazmul
1956 Changing Society in India and Pakistan, Dhaka: Dhaka Ideal Publication.

Knauft, Bruce M.
1996 Genealogies for the Present in Cultural Anthropology, New York: Routledge.

Kolenda, Pauline
1983 Caste, Cult and Hierarchy: Essays on the Culture of India, Bloomington: Folklore Institute.

Marriott, Mckim
1951 Social Structure and changing in a U.P. Village, Mumbai: Economic Weekly, 4.

McGee, R. Jon, Warms, Richard L.
2000 Anthropological Theory: An Introductory History, New York: McGraw-Hill.

Marx, Karl
1906 (1867-1894) Capital: A Critique of Political Economy, vols 1-3. New York: Modern Library.

Marx, Karl
1844 (1970) Critique of Hegel's Philosophy of Right, Cambridge: Cambridge University Press.

Marx, Karl and Friedrich Engels
1965 1846 The German Ideology, London: Lawrence and Wishart.

Mills, Sara
2003 Michel Foucault, London: Routledge.

Moore, Henrietta L.
1988 Feminism and Anthropology, Cambridge: Polity Press.

Morrison, Ken
1995 Marx, Durkheim, Weber: Formations of Modern Social Thought, London: Sage Publications.

Morris, Brian
1987 Anthropological Studies of Religion, Cambridge: Cambridge University Press.

Shafie, A. Hasan
2017 Caste in Comparative Context: Muslim Rank and Hierarchy in Bangladesh. A Journal published by center for South Asian Studies, Gifu Women's University (ISSN 1349-8851) South Asian Affairs (volume-12)

Spradley, P. James
1979 The Ethnographic Interview, Long Grove: Waveland Press.

Spradley, James P.
1980 Participant Observation, Long Grove: Waveland Press.

Said, Edward W.
1978 Orientalism, New York: Pantheon.

Turner, Victor
1966 The Ritual Process: Structure and Anti-Structure, New Brunswick: Aldine Transaction Publishers.

Turner, Victor
1967 The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual, Ithaca: Cornell University Press.

Turner, Victor
1974 Dramas, Fields and Metaphors: Symbolic Action in Human Society, Ithaca, NY: Cornell University Press.

Wise, James, M.D.
2017 Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal, New York: Routledge.

Weber, Max
1922 (1968) Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, New York: Bedminster Press.

আরেফিন, হেলালউদ্দিন খান
১৯৮৯ বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান, ঢাকা : সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র।

আহমেদ, রেহনুমা; চৌধুরী, মানস
২০০৩ নৃবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ, ঢাকা : একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড।

জলদাস হরিশংকর
২০১২ রামগোলাম, ঢাকা : প্রথমা।

বসু, নির্মল কুমার
১৯৪৯ হিন্দু সমাজের গড়ন, কলকাতা : বিশ্বভারতী।

বন্দোপাধ্যায়, শেখর; দাশ গুপ্ত, অভিজিৎ
১৯৯৮ জাতি, বর্ণ ও বাঙালী সমাজ, দিল্লি : আই সি বি এম।

বন্দোপাধ্যায়, মানবেন্দু
২০১২ মনুসংহিতা, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার।

ভট্টাচার্য, তপোধীর

১৯৯৭ মিশেল ফুকো তাঁর তত্ত্ববিশ্ব, কলকাতা : অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ।

রায়, নীহাররঞ্জন

১৯৪৯ বাঙালীর ইতিহাস; আদিপর্ব, কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং।

সেন, সুকোমল

২০১০ ভারতের সভ্যতা ও সমাজ বিকাশে ধর্ম শ্রেণী ও জাতিভেদ, কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড।

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ

২০১২ ইতিহাসের উত্তরাধিকার, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স।

ভদ্র, গৌতম; চট্টোপাধ্যায়, পার্থ

২০১২ নিম্নবর্গের ইতিহাস, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স।

বিবেকানন্দ, স্বামী

১৯০৫ বর্ত্তমান ভারত, কলকাতা : উদ্বোধন।

করিম, নাজমুল

১৯৪৬ ভূগোল ও ভগবান (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিকী), ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সেন, সত্যেন

২০০৬ শহরের ইতিকথা, ঢাকা : মীরা প্রকাশন।

চৌধুরী, আহমেদ ফজলে হাসান

২০০৩ নৃবৈজ্ঞানিক প্যারাডাইম : রূপান্তরের ধারা, ঢাকা : ইনষ্টিটিউট অফ অ্যাপ্লাইড এ্যানথ্রোপলজী।

ms‡hvRbxÑ3 cvß Qwe

গণকটুলী হরিজন কলোনির প্রবেশদ্বার

ইউসেপ গণকটুলী সিটি কর্পোরেশন স্কুল

গণকটুলী হরিজন কলোনি, মানুষের মুখের ভাষায় ‘মেথরপট্টি’

গণকটুলী হরিজন কলোনি, মানুষের মুখের ভাষায় ‘মেথরপট্টি’

কলোনিগুলোর সীমানার ভেতরে অবস্থিত রাস্তা

কোন প্রাইভেট টয়লেট নেই, তাই পাবলিক টয়লেটেই চলে প্রতিদিনের গোসলের কাজ

এভাবেই বেড়ে উঠে হরিজন শিশুরা

এভাবেই বেড়ে উঠে হরিজন শিশুরা

ঘিঞ্জি পরিবেশে মানবেতর জীবন-যাপন

বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ এর কার্যালয়

বসতি এলাকা ও পরিবেশ

বসবাসের জন্য নির্মিত নতুন ভবনসমূহ